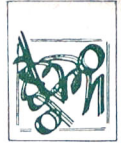


KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

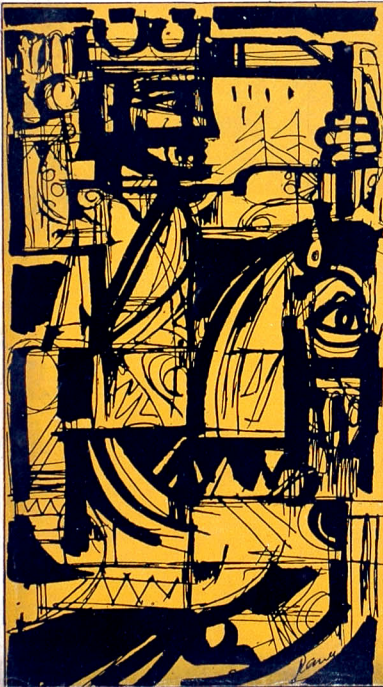
Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ২৪ মাদান্য স্মারক, কলকাতা
Collection : KLMLGK	Publisher : শ্রী ১২৩৪
Title : ৬৭০৫	Size : 7" x 9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number : ১৫/১ ১৫/২ ১৫/৬ ১৫/৮	Year of Publication : ১৯৫১ ১৯৫২ ১৯৫৩ ১৯৫৪
	Condition : Brittle Good ✓
Editor : ১২৩৪ ০৩২	Remarks :

D. Roll No. KLMLGK

চুবুস



বর্ষ ৫৫ সংখ্যা ২ কাতিক ১৪০১



১২৫তম জন্মবর্ষ উপলক্ষে সতাসন্ধী
গান্ধীজিকে স্মরণ করেছেন থামি
লোকেশ্বরানন্দ।

মহাত্মা গান্ধী স্মরণে তথ্যবহুল এবং
বিবেকী মূল্যায়ন উপস্থাপনা করেছেন
সুপরিচিত কমিউনিস্ট নেতা অধ্যাপক
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

এই সঙ্গে থাকছে প্রায় অনুরূপ একটি
শৃঙ্খলায়তন আলোচনা, যেটি প্রয়াত
অধ্যাপক সুনীল সেনের অপ্রকাশিত রচনা।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শতবর্ষ
উপলক্ষে তাঁর রচনাসম্ভার নিয়ে সরোজ
বন্দ্যোপাধ্যায়ের রসগ্রাহী আলোচনা—
‘সরাটির চরের ঝিঙে ফুল’।

ড. বিজিতকুমার দত্ত লিখেছেন—
‘প্রসঙ্গ : বিভূতিভূষণের আরণ্যক’।

সনাতন মিত্রের নিবন্ধ— ‘ছোটগল্পের
বিভূতিভূষণ’।

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের কবিতা নিয়ে
দীর্ঘ সন্দর্ভ।

স্মরণ পর্যায়ে জাহানারা ইমাম এবং তাঁর
দুখানি আত্মজৈবনিক গ্রন্থ নিয়ে আলোচনা।

... মনে রেখে তোমার অন্তরে
আগি রবেছি,
বিস্ময় হয়ে না।
তোমার প্রতিটি ক্রোড়, পণ্ডিত ব্রহ্ম,
পণ্ডিত উল্লেখ্য আর পণ্ডিত যেননা,
তোমার হৃদয়ের অন্তর আশ্রয়,
তোমার মনের পণ্ডিত আত্মজ্ঞা...
এক জিনিষ, তোমার কিছু বাদ না দিয়ে...
তোমাকে নিজে চলেছে আমারই দিকে...



বর্ষ ৫৫ সংখ্যা ২
কার্তিক ১৪০১

সত্যসঙ্গী গান্ধীজি	স্বামী লোকেশ্বরানন্দ	৭৩
মহাত্মা গান্ধী স্মরণে	হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৭৫
মহাত্মা	সুনীল সেন	৮২
'সরাসি'র চরের বিড়ে ফুল	সরোজ মুখোপাধ্যায়	৯৩
প্রসঙ্গ : বিভূতিভূষণের আরম্ভ্যাক	বিজিতকুমার দত্ত	৯৯
ছোটগল্পের বিভূতিভূষণ	সনাতন মিত্র	১০৬
কবিতা		
তিনটি কবিতা	অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত	৮৫
ফায়ার এলার্ম	কৃষ্ণ ধর	৮৬
খোলাস-ভাঙা মানুষ	প্রবন্ধকুমার মুখোপাধ্যায়	৮৭
জুশিটার জানে না	তাপস সেন	৮৮
সার্চলাইট	দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৮৯
দুটি কবিতা	কবিরুল ইসলাম	৯০
লোহার গারদ	সঞ্জল বন্দ্যোপাধ্যায়	৯১
তুমি কেন দিকে মুখ করে	পঙ্কজ সাহা	৯২

গল্প	অশোকেন্দ্র সেনগুপ্ত	১১১
দেওয়াল	পঞ্চবাণের শিকার পর	১১৯
পঞ্চবাণের শিকার পর	নীহারকল ইসলাম	১১৯

গ্রন্থ সমালোচনা			
বেণু গুহাচৌধুরী	১২২	শ্যামল রায়	১২২
বেধ মুখোপাধ্যায়	১২৮	হাসির মল্লিক	১৩১
বারিদবরণ ঘোষ	১৩৬	নির্বণ বসু	১৩৮
শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায়	১২৫	সুভাষ বাগচী	১৩৪

সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতি		
শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের কবিকৃতি	নীলারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	১৪২
শিক্ষা		
অশোক মিত্র কমিশন রিপোর্ট এবং সরকারী ঘোষণা	মানস জ্যোয়ারদার	১৪৯

স্মরণে		
জাহানারা ইমাম এবং দুয়ানি আত্মজৈবনিক গ্রন্থ	আবদুর রউফ	১৫৩

রিপোর্ট		
শতাব্দিকী আলোচনায় বিভূতিভূষণ — আকাসেমির সেমিনার	জবানী-প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	১৫৭

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক গুপ্ত প্রেস, কলি-৯ থেকে মুদ্রিত
এবং ৫৪ গণেশচন্দ্র আর্ভিনিউ, কলি-১৩ থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত
অফিস ৫৪ গণেশচন্দ্র আর্ভিনিউ, কলিকাতা- ১৩
শিল্প পরিকল্পনা রঞ্জনআনন দত্ত

দূরত্ব ২৭ ৬৩২৭
নির্বাহী সম্পাদক আবদুর রউফ

NEW BOOKS FROM ORIENT LONGMAN

HISTORY OF THE BENGALI PEOPLE

★ By Niharranjan Ray

★ Translated By John W. Hood

John W. Hood currently teaches at the University of Melbourne from where he received his Ph.D for his thesis on Niharranjan Ray.

Rs. 600.00

TRANSLATION AS DISCOVERY

★ By Sujit Mukherjee

Dealing more with the practical aspects of translation, the book focuses on the role of the translator, the method s/he could adopt, and the tools to be used for evaluation.

Rs. 95.00

POLITICS OF MODERN MAHARASHTRA

★ By V.M. Sirsikar

The book provides insight into modern Maharashtra from 1960 to 1993, emphasising on the role of the Dalit Panthers, the Shiv Sena, the RSS and the Shetkari Sangathana.

Rs. 260.00



Orient Longman Limited

17, Chittaranjan Avenue
Calcutta - 700 072

সত্যসন্ধী গান্ধীজি

হুমায়ী লোকেশ্বরানন্দ

রাজকোটের এক ভুলে ইনস্পেক্টর এসেছেন ভুলে পড়াশোনা কেমন হচ্ছে দেখবার জন্য। ইনস্পেক্টরের আগমন ভয়ানক এক ব্যাপার, ছাত্র ও শিক্ষক উভয়েই ভয়ে কম্পমান। তার উপর যদি ইংরেজ ইনস্পেক্টর হন, তাহলে ভোঁ কথাই নেই। কার ভাণ্ডো কী আছে কে জানে? রাজকোটের ভুলটিতে সেদিন এক ইংরেজ ইনস্পেক্টরই এসেছেন।

ইনস্পেক্টর সাহেব এক ক্লাসে ঢুকে ছাত্রেরা ইংরেজি বানান কেমন শিখছে, তা পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে কয়েকটি শব্দ লিখতে বললেন। ছাত্রেরা তাদের বাতায় শব্দগুলি লিখে তাকে দেখাবে। মোট পাঁচটি শব্দ লিখতে বললেন, তাদের মধ্যে একটি ছিল— Kettle. সবাই শব্দগুলি নির্ভুল লিখল—একটি ছাত্র ছাত্র। ক্লাসে যে শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন, তিনি নানা প্রকারের আকার-ইশিতে ছেলেটিকে তার ভুল ধরিয়ে দিতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু ছেলেটি হয় বুঝতে পারল না তিনি কী বোঝাচ্ছেন অথবা বুঝেও তার ভুল সংশোধন করল না। ফলে ক্লাসের সব ছাত্র নির্ভুল বানান লিখলেও এ একটি ছাত্র ব্যতিক্রম রয়ে গেল। ইনস্পেক্টর চলে গেলে শিক্ষক ছাত্রটিকে জিজ্ঞাস করলেন, তিনি তার ভুল দেখিয়ে দিলেন তবু সে ভুল শুধরে নিল না কেন, সে কি তাঁর আকার-ইশিত বুঝতে পারেনি? আশ্চর্যের বিষয়, ছাত্রটি উত্তর দিল সে সব বুঝতে পেরেছিল কিন্তু যেহেতু বানানটা তার নিজের জানা নেই, সে শিক্ষকের লুকিয়ে দেখিয়ে বেওয়া বানান-লেখাটা মিথ্যাচার বল মনে করে এবং তাই সে যে বানানটা জানে সেইটাই না বদলিয়ে রেখে দিয়েছিল। স্বভাবতই শিক্ষক অধিশর্মা হয়ে তাকে অনেক বাক্যেরা বিদ্ধ করলেন, কিন্তু ছেলেটি তাতে এতটুকুও বিচলিত হল না। এই ছেলেটিই ভবিষ্যতের দেশপূজা যোহনদাস কামদাদ গান্ধী।

এই সত্যনিষ্ঠা গান্ধীজি তাঁর মায়ের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। তাঁর মা এক নিরক্ষর মহিলা, কিন্তু গান্ধীজি লক্ষ করেছিলেন, তাঁর মা কখনও মিথ্যাচারণ করেন না। সত্যই ছিল তাঁর বিশ্বাস। গান্ধীজি তাঁর মায়ের হাতে নিজেদের গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। তাই তাঁর আত্মজীবনী নাম দিয়েছেন— 'My Experiments with Truth' অর্থাৎ 'সত্যকে আশ্রয় করে জীবনযাপনের চেষ্টা।' তাই যেখানে যে ভুল করেছেন, তা অকপটে তাঁর আত্মজীবনীতে তুলে ধরেছেন। ছোটবেলায় কোথায় কী নিষিদ্ধ আচরণ করেছেন,

আবার বড় হয়ে রাজনীতি করতে গিয়ে কী ভুল করেছেন, তাও অকপটে নথিভুক্ত করে গেছেন। তাঁর এক ভুলকে 'Himalayan blunder' বলে অভিহিত করেছেন। কোন-কোন ভুলের জন্য প্রায়োপবেশন করে প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। অনেকে তাঁর এই প্রায়শ্চিত্তকে 'ন্যাকামি' বা 'ভগ্নমি' বলেছেন। কত গালি-মন্দ, অপমান তিনি সহ্য করেছেন। তবু তাঁর সংকল্প থেকে তিনি টলেননি। যা উচিত বা সমষ্টির শপেক কল্যাণজনক মনে করতেন, তা করতে কখনও বিচা করেননি। তাঁর জীবন একটা 'খোলা বই', গোপনীয় বলে কিছু ছিল না। সত্যনিষ্ঠা ব্যক্তির জীবন তো এইরকমেরই হওয়া উচিত। তার সব কিছু খোলামেলা, দিনের আলোর মত স্পষ্ট, উজ্জ্বল। গান্ধীজি আইন পড়তে বিলতে যান। তাঁর মায়ের দূর ইচ্ছে নয় তিনি যান। শেষ পর্যন্ত কয়েকটি শর্তে যেতে অনুমতি দেন। গান্ধীজি অত্যন্ত মাতৃভক্ত, কিন্তু সাহেবদের দেশে গিয়ে সাহেব হওয়ার ঠোঁকের চাপে পুরোপুরি শর্তগুলি মানতে পারেননি। যতটুকু অন্যায় করেছেন তা একেবারে উপেক্ষা করে, কিন্তু গান্ধীজি সত্যের খাতিরে আত্মজীবনীতে তাঁর উল্লেখ না করে পারেননি। অনেকে বলছেন এটা বাড়াবাড়ি, কিন্তু যা সত্য তা সত্য। গান্ধীজি যেন তাঁর দোষ স্বীকার করে থাকিনাটা প্রায়শ্চিত্ত করতে চেয়েছেন। এই যে দোষ স্বীকার করার নৈতিক সাহস, এইটাই গান্ধীজির মহত্ব।

বিলতে থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করে গান্ধীজি দেশে ফিরলেন। প্রথমে তিনি বুধে হাইকোর্টে প্রাক্টিস শুরু করেন, কিন্তু প্রাক্টিস জমদ না। দাঁড়িয়ে কিছু বলতে গেলেই ঘাবড়িয়ে যেতেন। কিন্তু ভাল লিখতে পারতেন। তাই দেখে দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী কয়েকজন গুরুজাতি ব্যবসায়ী তাঁকে দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়ে আইনজ্ঞ হিসাবে তাঁদের কাজকর্মে সাহায্য করতে বলেন। গান্ধীজি তাই করেন। প্রথমে ডেবেলিলেন কয়েকদিন থেকে চলে আসলেন, পরে ভারতীয়, বস্ত্র সমগ্র কৃষকায় মানুষের উপর শ্রেতকায় মানুষের নির্যাতন ও পীড়ন তাকে বিচলিত করেছিল। নিজেরও এই ব্যবহারের শিকার হয়েছিলেন কয়েকবার। এ থেকেই তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়।

গান্ধীজি আফ্রিকাতেও তাঁর আইন-ব্যবসায় জমাতে পারলেন না। তাঁর আত্মসত্তা, মুখেরো স্বভাব ইত্যাদি যেমন ছিল, তেমনই নতুন এক অন্তরায় দেখা দিল, তাঁর সত্যানুসার। যেসব মাদলয়

লেশমাড় মিথ্যা আছে, তা তিনি নেনেন না। কেউ মিথ্যা মামলা তাঁর কাছে নিয়ে এলে তিনি তাঁর মজলেককে বুঝিয়ে সত্যের আশ্রয় নিতে বলতেন। এটা নিয়ে এত বাড়ানি দিয়েছেন যে মজলেক তাঁর কাছে মামলা নিয়ে আসতে ভয় পেতেন। মাঝে মাঝে মজলেক তাঁকে মিথ্যাকে সত্য বলে চালাতে চেষ্টা করতেন। যে মুহুর্তে গান্ধীজি বুঝতে পারতেন মজলেক তাঁকে সত্য বলেননি সেই মুহুর্তে তিনি সেই মামলা থেকে সরে দাঁড়াতে। আরও সমস্যা হল এই যে তিনি মামলা-মোকদ্দমা শুন্য করতেন না। কেউ মামলার কাগজপত্র নিয়ে এলে প্রথমে তিনি ভাল করে পড়ে দেখতেন মামলা অশরীফ কি না অথবা মামলার তাঁর মজলেক যে জিতবে, তা নিশ্চিত কিনা। যদি দেখতেন যে মামলা না করলেও চলে বা তাঁর মজলেকের জয় নিশ্চিত নয়, তখন মজলেককে বুঝিয়ে মামলা থেকে বিরত থাকতে বলতেন। তিনি মনে করতেন এই সব মামলায় কোন আইনজীবী যদি অর্থগ্রহণ করেন, তাহলে তা প্রতারণা হবে। স্বভাবতই এই অবস্থায় গান্ধীজির অর্থোপার্জন প্রায় কিছুই হত না। গান্ধীজির কোন ফোক এতে ছিল না, তিনি যে সত্যের মর্যাদা রক্ষা করে চলতে পেরেছেন, মিথ্যার কাছে মাথা নত করেননি, এইটাই তাঁর সবচেয়ে বড় পুরস্কার।

অবস্থার চাপে পড়ে গান্ধীজি ধীরে ধীরে রাজনীতিতে চলে আসেন। ব্রিটিশের কবল থেকে ভারতকে মুক্ত করতে হবে— এই ছিল সমস্ত ভারতবাসীর কামনা। কিন্তু উপায়? অনেকে মনে করতেন, আবেদন-নিবেদন করে ব্রিটিশের হাত থেকে সমস্ত ক্ষমতা ভারতকে হাতে আনা যাবে। প্রথম প্রথম ব্রিটিশের উদারতা ও ন্যায়-বিচারের উপর গান্ধীজিরও অগাধ বিশ্বাস ছিল। তাঁর

ভুল ভাঙতে দেরি হল না। তখন তিনি অসহযোগ-আন্দোলন শুরু করলেন। অর্থাৎ ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে কোন রকমের সহযোগিতা না করে তাদের শাসনব্যবস্থাকে অচল করে দেওয়া। এর পরিস্থিতি হিসাবে 'বিলেডি বর্জন' আন্দোলনও শুরু হল। ইংল্যান্ড থেকে বহু প্রকারের শিল্পদ্রব্য, এমনকি নিত্য ব্যবহার্য জিনিসও, এদেশে সরকার আমদানি করে বাজারে ছেড়ে দিচ্ছে। কাজেই বিলেডি বর্জন আন্দোলনে ইংল্যান্ডের অর্থনীতি খুব ক্ষতিগ্রস্ত হতে লাগল। সরকার যথাসাধ্য শক্তি প্রয়োগ করে এই আন্দোলনকে দাবিয়ে রাখতে লাগলেন। গান্ধীজি ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে লড়াইতে লাগলেন একটি মাত্র অস্ত্র দিয়ে, সে অস্ত্রের নাম 'সত্য'। সেই অস্ত্র প্রয়োগের কৌশলের নাম— 'অহিংসা'। তিনি বলতেন— 'Truth is my God. Non-violence is the means of realizing Him.'

সত্য ও অহিংসা দিয়ে সেই সময়কার সর্বশক্তিমান ব্রিটিশকে ভারতভূমি থেকে গান্ধীজি বিতাড়িত করবেন, এ স্বপ্ন গান্ধীজির পক্ষেই সম্ভব। বিদেশিরা এ নিয়ে কত সন্দেহ করতেন, আমাদের দেশের মানুষেরাও করতেন। সবচেয়ে হাস্যকর এই যে, গান্ধীজি কোন নতুন আন্দোলন আরম্ভ করার আগে ব্রিটিশ সরকারকে কবে, কোথায় এবং কীভাবে তিনি আন্দোলন শুরু করবেন, তা জানিয়ে দিতেন। অতীতকে আন্দোলন শুরু করে প্রতিপক্ষকে বিব্রত করা অতীতক ও অর্থম মনে করতেন। তাঁর এই দুইভঙ্গি আমাদের কাছে হাস্যোদ্বিগ্নক মনে হতে পারে, কিন্তু এই আমাদের সত্যসাক্ষী গান্ধীজি।

অনুনা সোভিয়েত দেশে পরবাস্ত-ইয়েলেনসিন-এর মনে রাখতে হবে এরা একটা নোংরা স্বতন্ত্র 'এ-নিউ ও-নিউ' উদ্যোগে সংঘটিত প্রতিবিপ্লব (counter revolution) এবং তাঁর জগদ্বাসী প্রতিবিপ্লবের কল্যাণ একেবারে মূলত গান্ধীজির পরিপন্থীদের মুখ থেকে বিভ্রান্ত-তদ্পন্থী ধরনে 'শান্তির বলিভ বাণী'-র এক ক্র-কুল অশস্ত্র উদারিত হচ্ছে। ইরাক-বসনিয়া-সোমালিয়া-আফগানিস্তান ইত্যাকার বিষয়ে চোখ-কান বুজে রেখে শোনানো হচ্ছে যে, সমাজ ও রাষ্ট্রের

মহাত্মা গান্ধীর জন্ম (২ অক্টোবর ১৮৬৯) থেকে একশো পঁচিশ বছর পূর্ণ হতে চলেছে। আমাদের দেশের শুভ্র পুণ্য, গোটা দুনিয়ার হালচালই এখন এমন যে বুকি 'There's none so poor as to do him reverence'! যখন কাসিরাম-মায়াবতীরা কট্টকাটা করেন তখন তখন গায়ে লাগে না, কারণ 'জাতপাতি'-এর রাজনীতি নিয়ে ফন্দি তোলার নিন্দা করলেও মনোতে হয়, হাজার হাজার বছর ধরে এদেশের কোটি কোটি দলিতদের 'সনাতনী হিন্দু' বলে স্বধোষিত গান্ধীজিকে 'ছেড়ে কথা না-বলার' হুকু আছে আর 'বিচার স্বতন্ত্র আর আচার হল সময়-সমাজ-তত্ত্ব' বলে যে বিরাট বুদ্ধকির জোরে মানবধর্মশাস্ত্র অমানবিকতার চূড়ান্ত যুগ যুগ ধরে এদেশে ঘটিয়েছে তার ঐতিহাসিক প্রতিক্রিয়া একটা অপ্রত্যাশিত রকম মন হওয়া আশ্চর্য নয়। তবে যন্ত্রণা পাই দেশ এবং দেশের বাইরে থাকিয়ে। যখন অতি অল্প ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে চিন্তাক্ষেত্রে আর অনিবার্যভাবে কর্মক্ষেত্রেও যেন মনে এসেছে (অন্তর, অনুরণ ও বিকৃতি-কণ্ঠকিত আবেদন আর নানা প্রবলপ্রত্যাপ প্রচার মাধ্যমে সহায়তা মানুষের মনকে যথাসাধ্য সুস্থ সমাজগতগত থেকে সরিয়ে লোভজর্জর স্বার্থপর চুল্লি গভীরজারহিত জীবনচ্যুরি উদ্ভট অথচ আপাতমোহময় মায়াজালে বেঁধে রাখার আয়োজন অবলীকৃতম সর্বত্র চলেছে।) এখন পরিস্থিতিতে গান্ধীজিকে নিয়ে লিখতে একটু কুঠা যে নেই তা নয়। কিন্তু প্রায়-আজীবন সাম্যবাদে আঙ্গ ও অশরাজিত প্রত্যয় সর্বসমক্ষে ব্যক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের মতো যুগন্ধর শূন্যোত্তম সম্পর্কে অপরিস্রব সম্মানার ব্যাখ্যান ব্যবহার দিতে চেষ্টাও বোধ করিনি। তাই বোধ হয়, সম্পাদক মহাশয় লেখা চেয়েছেন বলে বহু প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও একটা কিছু 'শান্তে দেবার মতো' রচনা যাড়া করার চেষ্টা করছি।

অনুনা সোভিয়েত দেশে পরবাস্ত-ইয়েলেনসিন-এর মনে রাখতে হবে এরা একটা নোংরা স্বতন্ত্র 'এ-নিউ ও-নিউ' উদ্যোগে সংঘটিত প্রতিবিপ্লব (counter revolution) এবং তাঁর জগদ্বাসী প্রতিবিপ্লবের কল্যাণ একেবারে মূলত গান্ধীজির পরিপন্থীদের মুখ থেকে বিভ্রান্ত-তদ্পন্থী ধরনে 'শান্তির বলিভ বাণী'-র এক ক্র-কুল অশস্ত্র উদারিত হচ্ছে। ইরাক-বসনিয়া-সোমালিয়া-আফগানিস্তান ইত্যাকার বিষয়ে চোখ-কান বুজে রেখে শোনানো হচ্ছে যে, সমাজ ও রাষ্ট্রের

মহাত্মা গান্ধী স্মরণে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সর্ববিধ সংকটের সাময়িক এই 'সমাজবাদ-সাম্যবাদ' বর্জিত দুনিয়ার ঘরদে 'সমঝোতা'-র ('Consensus') জোরে এবং 'সংঘর্ষ' ('confrontation') এখন ব্যক্তি। জ্ঞানবিশেষের দিক থেকে এধরনের বালখিলা ব্যাকি এই অর্থনীতি চিন্তাদেশের পরিচয় দিচ্ছে। সবাইকে ভুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, সমাজ রূপান্তরে ধীর ক্রমোন্নতি ও দ্রুত এবং বিধ্বংসক বিপ্লব উভয়েরই গুরুত্ব রয়েছে, প্রায় যেন একটা ষিচক্রানের সামনের এবং পিছনের চাকার মতো। সন্দেহ নেই যে অহিংসা মন্ত্রের শৃঙ্খলা গান্ধী বিপ্লবের পরিপন্থী ছিলেন। ১৯০৩-০৯ নাগাদ সময়ে বিপ্লব-সম্পন্ন উজ্জল বলে নিজেরই সহযোগীদের কাছে সবচেয়ে তিক্তবর্ণের জবাব দেন যে 'বিপ্লব আর লাল বিপ্লব'কে ('revolution and red ruin') জেনে শুনে আমল দেওয়া তাঁর কর্ম নয়। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে বেশ কয়েকবার এভাবে ভারতবর্ষের মুক্তি সংগ্রামের লগাম ধরে তিনি চাকা ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু এই 'হিন্দু টলস্টম' (লেনিন-এর কথা) স্বকীয় এবং বহু বাস্তব পরীকার ভিত্তিতে 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ'-এর ('passive resistance') প্রবল ও ন্যায়ক হয়েও কুটিল হুমকি ১৯২২ সালের মার্চ মাসে আহমদাবাদ আদালতে বিচারকদের দাবি করতে যে তিনি 'অস্ত্রন নিয়ে থেলা করেছেন আর ছাড়া পেলে আবার সেই থেলায় নামতেন'। ১৯২০-২১ সালে অহিংস অসহযোগ ('non-violent non-cooperation') সংগ্রামকালে প্রকাশ্য বিবৃতিতে জানান যে, তাঁর অধিকাংশ মুসলমান সঙ্গী অহিংসায় বিশ্বাসী নন বলে তিনি মানতে রাজি যে, এক বৎসরেই স্বরাজ না পেলে সেখানে হিংসাত্মক লড়াইয়ে নামার অধিকার তাদের রয়েছে। ১৯৪১ সালের অক্টোবর আলোড়নে তিনিই 'ইংরেজ, ভারত ছাড়া' আর 'করেছে ইয়ে মরেছে' আওয়াজ সারা দেশে ছড়িয়েছিলেন, আর এবিষয়ে বিদেশি সাংবাদিক লুই ফিল্লের জ্ঞানান যে, লড়াই স্বল্পস্থায়ী হবে আর দেশের শোষণশক্তি তাত্ত্বিক 'পালিয়ে' ('fleeing') যেতে বাধ্য হবে আনাজ করে এই ঝুঁকি ('risk') নিয়ে শেয়েছিলেন। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের মূল্য দিয়ে 'ক্ষমতার হস্তান্তর' (লক্ষ করার মতো হল এই যে, প্রকৃত স্বাধীনতা হোক বা না হোক), 'ক্ষমতার হস্তান্তর' তখন ঘটেছিল। নিয়ে কাণ্ডকারখানা চলছিল, তখন বেনারস মহাত্মা লিখলেন যদি কেউ 'বিপ্লব' এ-অবস্থায় করতে পারে তো ককক। শুভ নিম্নে নিজ 'রাস্তা', অবসানকালী বলে

কেউ নেই! এই অসহিষ্ণু পড়ে তুমি না বসলে যে, শতাব্দীকালের
কোনও কোনও নেতৃত্বহীন্যী কমিউনিষ্ট যেমন বলে চলেছে, যে,
মার্কস-লেনিন-এর কাজ থেকে হোক বা না হোক, তাঁর
কমিউনিজ্ঞম-এর "পাদি" নিয়েছেন রহস্যবান-বুদ্ধ-বিশ্বদেব-স-
কলায়ে, তেমনই অসহিষ্ণু, ওই দুই মহাশয় (মোহন ও ভাস্কর)
আমরা শ্রদ্ধা পূর্বসিদ্ধি। আমি গান্ধী মহারাজের কৃপায় কমিউনিষ্ট
হুয়েছি। একেমন ভাবনা কি! আমরা বেলায় একেবারে পেরে
দীর্ঘনিশ্বাস-বিশ্বদেবনাম তেও নাটাই, গান্ধী, জুবলুপল
সুভাষচন্দ্র-কে নিয়ে গোটা বই লিখেছি, কিরূপে যাঁকে জার্মান ভাষায়
বলে হয়েছে "weltschmerz" (বিশ্বক্লিা), জগৎভেদভাষা
সেকি কেউ হুজ্জা মার্কস-ভেদে আস্তে আস্তে কাটা যায় না, প্রয়োগে
কল্পনাও সম্ভব না। দীর্ঘনিশ্বাস কিংবা গান্ধীজীর ভাবনার অধিকাংশ
আরও সমৃদ্ধ। থাকলেও মূল্যভাবত যে পার্শ্বিক একটা অস্বাভাবিক
করা যায় না। তুমি ওআর সান্দ্রীসী জন্মভূমি নিয়ে একটা জায়গা
সমগ্রস্বা-বুদ্ধে চেঁচে পেরে, নিজেও গান্ধীজীর না বলে মার্কস-ভেদে
বলাইই খুঁটত নেওয়ার কথা মনে! বরফাতি জালি-বাসে মার্কস-
আমরা কখনও কোনও একটা গুলিয়ে যাচ্ছে আর কিঞ্চিৎ হাস্যকর
প্রকরণগুলি এখনো মেল্দি। তাই তুলে ধরি দীর্ঘনিশ্বাসকে
বুদ্ধোক্তি হানো! অথচ দানী লাইন: "আমরা গান্ধী মহারাজকে
পরি/কেউ বা দানী কেউ বা নিঃ/এক জায়গায় আছে মোহন
মো/ গান্ধী মেরে ভেঙে নিবে সে/ দানীর কাছে ইহ না যে
হৈ/ অতঃমুখে দানী বা কত লাইন!

[illegible]

মহাত্মা গান্ধী স্মরণে

বোধ হয় ১৮ই মার্চ ১৯২২ তারিখে আহমদাবাদে বিচারফলে গান্ধীজীর ছ'বছর কারাদণ্ড হয়। সেই সবাদ শেষে 'বসুমতী' সম্পাদকীয় কারফের স্তব্ধতা দেখেছি, 'রাজকোষে গুরু গান্ধী' শিরোনামে লিখিত সম্পাদকীয়টি যখন কারফজেনের সামনে পড়ে হয় তখন দাদুস সঙ্গীকৃত জা শুনতে পেয়েছি। কিন্তু পরে মাসিম বসুমতী-তে 'বীরল' (প্রাথ্য জৈদুর্নী) এ প্রান্তে গান্ধী সম্পর্কে পূর্বতন বিরাগ ও অনীহা বর্জন করে জানালেন যে, গীতায় বর্ণিত 'হিতপ্রজ্ঞ' পদটি অসঙ্গত প্রযোজ্য ও-আসমানা ব্যক্তিটির ফেরে আর— কেউ যদি অবিশ্বাস করেন যে আশ্রণ বই না—

এরা এতটা বিশেষ ছিলেন না মনে হচ্ছে জিনিসটো লিখতে। আত্মকাণ্ডে বোঝাচ্ছে যেওঁই বিশেষ করে না যে, ১৯১১ সালে নবীন্দ্রবাবু ও গান্ধীর মধ্যে এক বিতর্ক ঘটেছিল অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে থেকে মুক্তে যেতে পারেন না। অসহযোগ রম্যা রানীর ‘অসহ্য গান্ধী’ ছাড়াও তেঁদের ডিগ্রিওঁই আলোচনা রয়েছে। আমাদের কাছে বিশ্বাসিত মত নবীন্দ্রবাবু যেন রম্যা রানী-র মর্যাদা লিখি বিশুব। দিল্লের কাজ করতে পারেন।—কলকাতা বাতায় অসহযোগ বক্তৃতার ‘লো’ না নিয়ে জিইবিজি লেখার মধ্যে তখন দেখা দিত কিছু উদ্ধৃতি, যার এটোটা উদাহরণ হল— গান্ধী সম্পর্কে মার্কিন পার্লার হোয়েস-এর উক্তি: ‘আমি যখন রানী-র কথা ভাবি তখন মনে পড়ে, উল্লেখ-এর এনা।’ (লেনিনকে নিয়ে যখন ভাবি তখন তেঁদের সঙ্গে নোশোমিগা-এর নাম।) অসহযোগ ভাবি গান্ধী স্বপক্ষে, তখন মনে পড়ে যিওঁ ঝিল্লের নাম। তিনি যখন কলকাতাে গিয়াইছিলেন, তাঁর মনে হচ্ছে তখনই যিওঁরই বাক্য, যিওঁর অত্যাধীন তিনি যিওঁর কাছে পাঠছেন। সেত হোয়াসে লেগেওঁরহয়েনে, এরা কতজন। যিওঁরই মনে পড়ে নবীন্দ্রবাবু ঝিল্লের বাবা। প্রতিবার কাজে মনোনিবেশ করলে সেরেইমতটোভাবে।

‘সত্যের আহ্বান’ শিরোনামায় রবীন্দ্রনাথ যে অবিস্মরণীয় প্রবন্ধ

লিখেছিলেন 'মর্ডান রিভিউ' পত্রিকায় তাত্ত্বিক অনীহা প্রকাশ করেছিলেন অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্বভাঙ্গা বিষয়ে। পশ্চিমী সভ্যতার প্রতি গান্ধীজীকে ঐকান্তিক বিরাগ, বিশেষতঃ কান্ড শোভাযাত্রার মধ্যে মানবদুগ্ধার আভাস, শিল্পসভ্যতা সম্পর্কে বিরাগতা, গান্ধীকে নিয়ে যে গ্রন্থপাণ, যে দুর্ভিক্ষনিবৃত্তি বিলাস (যেমন সমগ্র চিঠি কালেক্ট কয়েক মাসের পরেই প্রকাশ আসবে) ইত্যাদি উল্লেখ করে মনে খেদ প্রকাশ করেন কবি, অন্য পক্ষে চিত্রা করতে বলেন মহাত্মাকে। এই দৌরব্যবাহী রসনাতী আঙ্কও পড়ে মুগ্ধ হতে হয়। এর উত্তর দেন গান্ধী। উক্ত মহানন্দনের এই প্রত্যাপন এক পদম শ্রবণীয় ঘটনা।

গান্ধীর পক্ষে যেন অনন্তজ চিত্রাণের দেখা গিয়েছিল এই উত্তরে: 'যুদ্ধ যখন চলে, তখন কবি বেয়ে দেন তার বিয়া... যুদ্ধ শেষ হবার পরই তিনি গাইতে পারেন নিজের সুরে। বাড়িতে যখন আশ্রয় লাগে তখন সকল বাসিন্দাকে বেরিয়ে বালিক করে জল এনে আশ্রয় নিভাতে হবে... ভারতবর্ষ আজ একটা বাড়ি যাকে আশ্রয় দেবেছে, কারণ দিনের পর দিন মনুষ্যই এখানে বসবাস করে। যুদ্ধে মনুষ্য মরছে যেহেতু বাবার কোয়ার টাকা রোগাক্রান্তের মতো আয় নেই।... বিশেষী কান্ড পড়িয়ে আমাদের লজ্জারই মুখাধি করছি... কবির অবশ্য সহজাত কতকগুলি অনুভূতি আছে, তাই তিনি বলেন আমাদের দিনের জ্ঞান, আর স্বভাবও তাই আমরাও তাই করি। আমরা মুগ্ধ হয়ে দেখি তার অঁকা ছবি—এই সুন্দর পাখিরো তারোবো যেন জীবন-বন্দ্যার কণি নিয়ে আশাকে আলো করে রাখছে। তবে এই পাখিগুলি যেতে পেয়েছে, তার উড়েছে কারণ তাদের ডান্ডাগুলি বিলাস পেয়েছে, তাদের শিরায় পূর্ণরোয়ে নতুন রক্তের সঞ্চার পেয়েছে। কিন্তু আমার মন্তব্য হল এই যে, আমি দেখছি এমন পাখি যারা এত পূর্ণরো যেন অনেক সামান্যতা করে তাদের ডান্ডা ন্যাসনে যায় না। ভারতবর্ষের আকাশের নিচে যে মনুষ্য-পাখি বাস করে, সে যখন জাগে তখন পূর্ণরোয়ে বিলাসের ডান যখন করেছিল, সে-ভুলানোও পূর্ণ। লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর বেঁচে-থাকা হল যেন একটা নিরবধি স্বপ্নাবশেষেরই শালিল। ...মুখাধিষ্ট এনে রোগীকে দেখেছি যাকে কবির-এর দেখা শুনিবেও সাম্রাজ্য দেওয়া যায় না। কোটি কোটি ক্ষুধিত চায় এতজামাত কবিতা—বলকণি খাদ্য। এ-ব-ব তাদের দান করা যায় না, তাদেরই এককি করতে হবে...'।

রম্মা রঙ্গ-র মন্তব্য, এই অন্তরঙ্গ প্রত্যাপন সম্পর্কে অপর সূত্র: 'এ দেশ শিল্পের স্বপ্নসীমার সামনে বিশেষ দুর্ভিত দাঁড়িয়ে উঠে লড়েছে। "সাহস করে আমার অন্তির অধীকার করতে পারো?" এই ছবি গান্ধীকে কখনও বিব্রান নিচে যেমন, তখনই তিনি যেন কবির পরে গান্ধীজীর সঙ্গে সৌহার্দ্য দিয়েছেন—অপরের মতো কবিও চরকা কাটান, নিজের বিদেশী কাপড়চোপড় ছাড়িয়ে ফেলুন! এটাই আজকের কতখ্য।

আগামীকালের ভার গুরুত্ব ভগবানের হাতে। রীতিয়া বলা হয়েছে, মর্দ আচরণ করে!"

বর্তমান প্রজন্মের কাছে হয়েছে এ হল প্রকাশ্যতাক, কিন্তু সেদিন আমাদের অল্প বয়সে অন্তর মাতিয়েছিল এমন চিত্রা। মন যদি ধীরপ্রস্রাণের অভিমতের প্রতি আশ্রিত হয়েতো তে হন্য যেন এনে বাধা দিয়েছে। চিত্রা ও কবিতা বহু অসম্পূর্ণ ও অপূর্ণতা ছাপিয়েই গান্ধী জয় করেছিলেন দেশের জন্য। ১৯২১ সালে সাহাবদি-শ্রেষ্ঠ সন্তোজনাথ মজুমদার-এর মতো প্রজ্ঞাবান বাস্তববোধসম্পন্ন মানুষ অবশেষের প্রত্যাপন গান্ধী সম্পর্কে তৎকালীনা বাঙালির কতকটা তাক্সিলের ভাবকে (যা আজও বর্তমান রূপেই বিনামান) বিচার দিয়ে খেদ করেন—'বাংলার তত ছিল সাধনা ছিল না, আদর্শ ছিল নিষ্ঠা ছিল না, মেধা ছিল দূরত ছিল না', আর যোগ দেন 'এক বিপন্নী শিক্ষাব্যবস্থায় বিমর্ষত ইংরাজীনিবিশ ভারতবাসী মহাশয় গান্ধীকে যোগোদান দেখিতে ও বুঝিতে পারিতেছে না, আমরা তাই পারিতেছি না। তথাপি পূর্বতের নিকট মাথা নত হইয়া আসে। সুতরাং অধ্যাপ বিস্তারে চকু বিফারিত হইয়া থাকে, আকাশের অসীম নীলিমায় চিত্ত উদাস হইয়া পায়, এক বিরাট ভূমিকম্পের মধ্যে দাঁড়াইয়া মানুষ স্থির থাকিতে পারে না, প্রলয়মুখার বিচার বিশ্লেষণ প্রতিকার শুদ্ধ ভূপের মতো উড়িয়া যায়।' ('জীবনীগ্রন্থ', পৃঃ ৫১-৫৩)

ঐচ্ছ্যিক ঘটনিক পাঠক, কিন্তু বহু বড় ব্যক্তিকে একদা গান্ধীজী বিচারা উদ্ভাটন করেছিল তা মনে পড়ছে নিজেরই অভিজ্ঞতার সঙ্গে। একনাই বুঝি আইনস্টাইন-এর মতো মহাভাগ লিখেছিলেন যে, আগামী দিনে প্রজন্মের পর প্রজন্মে যারা আসবে এই জগতে, তারা কখনও করতে পারবে না যে গান্ধীর মতো একজন ছিলেন আমাদের মধ্যে। একনাই বুঝি ১৯৩০ সালের ভারতীয় যখন এসেছিলেন অল্পবয়সে বিদেশীরাগের কারণে রীতিয়া ছাত্রের মজলিসে, তখন প্রঃ ওঠে যে, দেশে যখন তখন উঠেছে তখন গান্ধীর পাশে না থেকে বিদেশে কবে, যখন প্রবাসী আশ্রয় চকল হয়ে উঠেছি। মুগ্ধ হয়েছিলেন কবি এবং তার কোনও বই হাতের কাছে আছে কি না আমাকে জিজ্ঞাসা করায় ছুটে ধর থেকে আমার 'চলিকা' এনে দিয়েছিলেন এবং সেটা স্বহস্তে নিয়ে কবি পড়লেন 'হুসমার' থেকে: 'যদিও সম্রাট অসিধে মন মধুরে/ সব সঙ্গীত পেছে হৃদিতঃ গায়িমা/ যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অধরে/ যদিও প্রাণি আসিছে অসহ নায়িমা/ মধ্য আশঙ্কা জগিছে মৌন মন্তরে/ নিম্নদগ্ধ অবগঠনে ঢাকা/ তবু বিহর, ওরে বিহর মোর/ এখনি অথ, বন্ধ করো না পাখা।' সেই কষ্টের আজও সে শ্রুতের পাই আর মনে পড়ে তাঁর কথা যে, গান্ধী হয়ে জানেন কোথায় কবির অস্থান, ভারতবর্ষের চারণ হয়ে দেশ থেকে দেশান্তরে তিনি ধুরেছেন, উভয়েরই অধিষ্ট হল এক, যে যাই ভাবুক না কেন!

এখানেই বলে রাখি যে, গান্ধী-চরিত্রের স্ববিবরণ (যা ব্যবহার

দেখা গেছে) ছুটে উঠল যখন ১৯২২ সালে চৌরীচৌরার মতো ১৯৩০-এর আইআইআর আন্দোলন গায়িয়ে রেখে লন্ডনে দ্বিতীয়া গোয়েল্টবিশ সম্মেলনে (১৯৩১) যোগ দিলেন। একাই কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব তিনি করলেন, হিন্দু-মুসলিম সমঝোতার ব্যাপারে রায়ম্বে মাকানজাদ-এর 'সেবর' সরকারের কূটপন্থার লেখার হার মনোতে বাধা হলেন, আর সময় নষ্ট করলেন তাঁর 'পুত্রাধার'-এর 'কর্ষণ' বৃদ্ধক-বা-না-বৃদ্ধক এমন নানা দেশের বুদ্ধক-বাহিনীর সঙ্গে দেখা করে। তবু মানুষটির মহাত্মা ঢাকা পড়ল না। যখন ফেব্রুয়ারি-এ এলেন, শীতের দেশে যাটো মুতি-আলোয়ান-চকল পরে। সভাকক্ষে জোয়ার সময় হন-ভর্তি বিশেষী আপনা থেকেই সবাই দাঁড়িয়ে (যা সচরাচর ঘটবার নয়) সম্মান জানাল।

চার্লি চ্যাপলিন (যাঁর ছবি মহাত্মা দেখেনই নি!) লন্ডনে সম্মেলনের পর মুগ্ধ হবার কথা সবাইকে জানালেন। আর জর্জ বার্নার্ড শ'-এর মতো টোটকাটা মন্থনীর মন্তব্য হল—'গান্ধী হলেন Mahatma Major আর আমি Mahatma Minor'! সত্যে কি এই মানুষটিকে নিয়ে সেরাজিনী নাইজু কত ঠাট্টা-ভাস্যাস করিতে পারলেন, তাঁকে 'Mickey Mouse' বলতে পারলেন, সবাইতে জানালেন কী মজা যে 'আমরাব অনমন' আরও করার আগে নকল দাঁতের নতুন 'সেট' চেয়ে বসতেন মহাত্মা! নিজেই শুদ্ধ, অপাপবিশ্ব ভাবার মুখি গান্ধীর ছিল না। তাঁর জীবন নিয়ে কত পরীক্ষা করেছেন আর সম্মান করেছেন 'সত্য'-র। সঙ্গে সঙ্গে জানানো যে আটম অচল সান্ধ্য 'সত্য' হবে কিন্তু নেই। 'সত্য থেকে সত্য'-র যোগ (from truth to truth) কতজনে সত্য। আশঙ্কী কি যে, হাত একনাই সব কিছু ভুলেজাতি, দেহ-চরিত্র ছাপিয়ে তার অনন্যতার অকুণ্ট ষ্টিপটি একেছে অপ্রত্যাহত হবার ভেবে। ১৯২২ সালে দেশেস্ত্রুত মনুষ্য দল জেল থেকে বেরিয়ে গান্ধীর বিদ্রোহিত প্রকাশে বিচার দিলেন, ('you bungled and mismanaged') তবু বর্ষশেষে যার কংগ্রেসে সভাপতির মরকে যোগো ভাঙলেন—'Though [Gandhi] has been mocked and jeered at by 'people of importance', 'people with a stake in the country'—Scribes and Pharisees of the days of Christ—he will ever be remembered, now and always, by the nation he led from victory to victory'.

এরই সঙ্গে মনে পড়ছে যে, বেশ কিছুকাল পরপর সম্পর্ক মনে কটু হবার পরও স্বভাবচক্ৰ বহু যখন '৪০'-৪৪-এ আজান দিয়ে সৌজ-এর সঙ্গে স্বদেশবাসী সগায়োমের সফুটিয়ে গান্ধীর কাছে আদ্যেন করলেন তখন কুণ্ঠিত হলেন না 'জাতিত্ব জ্ঞান' বলে সোধোন করতে। '৪৪ সালেই 'দেশপ্রেমী' বলে কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে চার্লিগেট চুয়ে-দেওয়া কুংবাব হুগার জবাব দিলেন পাটি নেতা পূর্ণচন্দ্র যোশী। লিখলেন যে, অমূলক

নোরা অপবাদ অতি তুচ্ছ আর অবজ্ঞেয় কিন্তু গান্ধী যে হলেন 'Father of the Nation' এবং অভিমানহস্ত সন্তানের মতোই আমার অভিযোগের জবাব পাঠানো হচ্ছে। অনেকেই মনে পড়বে, ভারতবর্ষজ ব্রিটিশ কমিউনিষ্ট মন্থনী রজনী শাম দত্ত 'India Today' (London 1939) গ্রন্থে গান্ধীকে বর্ণনা করেন: 'This Jonah of revolution, this mascot of the bourgeoisie'। অতি কুর কটোর ও মূল্যগতভাবে বিদ্রোহ এই অভিজাত তিদিহি পরে প্রভাভার করেন। ১৯৪৫ সালে গান্ধীর সঙ্গে স্বে সন্ত্রস্ত অভিযোগোদানো 'দু'জনের মধ্যে হয়। (কতকটা তুলনীয় ১৯২৭ নগাদ সময়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের প্রথম কমিউনিষ্ট সদস্য সাকলাতওয়ালার যোগাকাত মহাত্মার সঙ্গে)।

কারও ভুলে যাবার অধিকার নেই যে, গান্ধীর একটা নিজস্ব এবং আনন্দ কর্মসানার মাধ্যমে আশ্রয় জীবনধর্ম ছিল, যার সঙ্গে সমাজবাদী সাম্যবাদী বিশ্ববীকার সামঞ্জস্য নেই। একনাই তাঁর খুব থেকে শোনা গেছে 'the beauty of compromise', 'One step is enough for me!' ইত্যাকার কথা। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য বলতেন যে, যারা কমিউনিষ্ট বলে বড়াই করে তাদের চেয়ে তিনি অনেক ভাল 'কমিউনিষ্ট'। কথ্যটা হাস্যকর বলে উড়িয়ে দেওয়াট নাক-তোলামির উদাহরণ হতে পারে কিন্তু উড়িয়ে দেবার নয়—অনেকটা যেমন সর্বস্বাধী রায়াক্ষরনের মতো ব্যক্তি বারবার বলতেন যে, তামাদের 'class war' নিয়ে ব্যভাচিত্র যদি হতো তাহাি ত্রোমাদের সঙ্গে। এসব নিয়ে উচ্চহাস্যে আত্মোৎসর্গ যোগ্য এককপ্রকার ব্যক্তিত্ব নাই ই কিছু নয়। ১৯২৮ সালের ১৯ এপ্রিল গান্ধী লেখেন, জগদ্বিশ্বাস নবহকত: 'চোয়ার সঙ্গে আমি একমত যে, আমাদের লড়াই চলাতে হবে নী আশ শহুরের শিক্তি সম্প্রদায়কে দান দিচ্ছি। কিন্তু তার সময় এখনও আসেনি।' ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, টো 'April Fool' বানাবার চিঠি নয়, হাস্যকৌতুক জরুপ থেকেও গান্ধী অতী বাচাল কখনও ছিলেন না। সঙ্গে সঙ্গে ছিল ব্রহ্মবিশ্বাস ও ভারতবর্ষের ইতিহাস থেকেই সম্রাট হাজার তার স্টা। তাই বিপল বলতে এই অবধিই যখন যা আমরা বুঝি, ভারতবর্ষ মহাত্মার মনের ও মর্মের ছিল কখনও মেলেনি। মনু আর মাক্সতার দেশে এলেন বিশেষ পরকে যোহোদাস গান্ধী, প্রচার করলেন যেন পাঁচশো বহিরের পুরো মহাত্মা কবীর-এর 'ভারতবর্ষ' এর নতুন সংস্করণ, আনন্দেন সান্ধ্যা অন্তর আলোড়নের টো বা বাবায় (১৯১৯-২২, ১৯৩০-৩২, ১৯৪৩ ইত্যাদি) দেশকে মাতিয়ে ফেলল। কিন্তু ১৯৪৫-৪৬-এর ছবিটি তখন বুললেন, 'আমি ভ্রান্ত, বিশ্বাস এই কেউ পারে তা ককক', আর 'এস হাম' উচ্চারণ করে প্রাণ দিলেন নির্দোষ নির্মম যাতকর হাতে।

১৯৩১ সালে লন্ডনে গান্ধীজীকে যেতে হয়েছিল রাজসমন্বনে,

পক্ষম জর-এর সঙ্গে কথা বলতে। অতীত কতিপয় পরেই গেলেন আর বিশেষ সাংবাদিকতা সঙ্কেতকে যখন জিজ্ঞাসা করলেন—
‘আপনার গায়ে জামাকাপড়, একটু কম ছিল না কি?’ তখন হাস্যমুখে জবাব এল— ‘তা আপনার রাজ্যমশায়ের পোশাক এক বেশি ছিল যে, আমার দৈন্যকে গুমিয়ে দিয়েছেন!’ লজ্জা যাবার আগে আইন-কমানা মুনতুবি বেখে বড়লটি আউটলিন-এর সঙ্গে সমঝোতা নিয়ে আলাপ— বিলাতে চড়িল সাহেবের হুজুর— ‘Naked Fakir’-এর সঙ্গে কথা বলছে রাজপ্রতিনিধি। প্রসিদ্ধ মনস্তত্ত্ববিদ Erik E. Erikson-এর রচনায় দেখছি যে, বড়লটি গাছিকে একটু ছা-এর প্রস্তাব করলে মহাশা পুটিল থেকে বের করলেন আইন ভেঙে বানানো নুন যা দিয়ে নাকি চা-কে বেশ মজাদার মনে হয়! আমেরিকান বিপ্লবকালে (১৭৭৬) ‘Boston Tea-party’ (যখন জাহাজ থেকে চাঘের ‘চেস্টা’ উড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল) ঘটনাকে যেন বড়লটিকে ‘মরণ করিয়ে দেওয়া হল। মানসিকতার দিক থেকে একটা বিশেষ অর্থে বিপ্লবীই ছিলেন গাছী, কিন্তু প্রকৃত সমাজবিপ্লব যা শোমঘের অবসান চায়, যা (ববীন্দ্রনাথের সোভিয়েত দেশে উক্ত বাগী অনুসারে) হল ‘লোভ বলে যে রিপু মৃত্যুশেলের মতো সমাজকেই লুকিয়ে রয়েছে তাকে উৎপাটিত’ করার ‘মহাযজ্ঞ’, তা গাছীজির জ্ঞান ছিল না, গ্রাহ্যও ছিল না। তাঁর মনে চেপে বসেছিল অখণ্ড অহিংসা-ভিত্তিক জীবনের স্বপ্ন। নিছক বাস্তব ঐতিহাসিক কারণে সমাজে রাষ্ট্র মূলগত পরিবর্তনের যে মূল্য একেবারে অকাটা তা দিতে গেলে ‘অহিংসা’-র ব্যতীত ঘটে বলে তাঁর ব্যাকুল আশঙ্কা। তাই বারবার নিজেই আত্মন-করা সংগ্রামকে সংবরণ করে দেশের (ও ঐতিহাসিকের) অনিষ্ট ঘটাতে সংকুচিত হন। ভুলে যেতেন যে বিপ্লবের মূল্য যুদ্ধাদায়ক হলেও যথাকালে বিপ্লব থেকে বিকৃত হবার মূল্য দাঁড়িয়ে যায় তার চেয়ে অনেক বেশি। এ-চিন্তা অল্পকালের জন্য ‘৪২-এর ‘অগস্ট’ অভ্যুত্থানের সময় হয় মনে এসেছিল (যদিও জেল থেকে ‘৪৪ সালে বেরিয়ে বলেছিলেন যে, ‘এ অভ্যুত্থানের দায়িত্ব তাঁর বা কংগ্রেসের নয়, শুধুমাত্র কংসদেরই!)। এ-চিন্তা আবার যেন আসে ‘৪৭ সালে দেশভাগ পাকা হয়ে যাবার সময়, আর তাই বলেন, পারে যদি কেউ তো বিপ্লব করুক আমি বড় বেশি দারুণ। ১২০ বছর বাঁচতে চাইতেন তিনি কিন্তু তখন চাইছিলেন মৃত্যু, যা এসে সাম্প্রদায়িক বিশেষ জরুরি বাস্তবের হাত থেকে।

এই মহামৃত্যু ত্বরান্বিত হবার প্রচলন করল হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীকে ভাগ্যসঙ্গার প্রাণপ্রলয় বলে মনেপ্রাণে জানাবার ফলে গাছী চেয়েছিলেন যে, ক্রাশী ও অন্যান্য গ্রন্থ নিয়ে ভারত-পাকিস্তানের দেনোমালিন্য তুঙ্গে ওঠে মুক্ত বাণিয়ে দেবার মতো ঘটনা ঘটেও দেনোমালিন্যের পাকিস্তানের প্রাণ পক্ষায় কোটি টাকা দিয়ে দেওয়া হোক। অনেক কর্তব্যাবলি এটা মনঃশূন্য হানি আর হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা অগ্রসীর্ষা হয়ে ওঠে ইল গাছী-হত্যার প্রত্যক্ষ হেতু।

আকাশপ্রদীপ নিতে যাবার মতো এ ঘটনা, যা বুঝি আবার দেখা দিল ‘৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর তারিখে অযোধ্যায় বাবার মসজিদ ধ্বংসের পৈশাচিকতায়।

১৯১৬ সালে গাছী লিখেছিলেন: ‘India is a country of nonsense’ কারণ তখন নিয়ম ছিল রেলস্টেশনে যাত্রীদের জন্য ‘হিন্দু পানি’ আর ‘মুসলিম পানি’ আলাদাভাবে সরবরাহ করা। গাছীর সংকল্প হল, ধর্মবিশ্বাসকেই এমন করণ্য বিকৃতি থেকে সরিয়ে নবজীবনের সূচনা করতে হবে। নিজেকে হিন্দু এবং বর্ণাশ্রম-প্রণয় বিশ্বাসী সোধমা করেই তিনি অস্পৃশ্যতার মতো কলমঝোড়নের কাজে নেমেছিলেন। সর্বমস্তা আশ্রমে ‘অস্পৃশ্য’ একটি মেয়েকে পালিত কন্যাক্রমে নিলেন, একবার প্রকাশ্য বিবৃতি দেন যে স্বাধীন ভারতবর্ষ যেন রাষ্ট্রপতিপদে বসায় কোনও ‘অস্পৃশ্য’ বংশোদ্ভূত মেয়েকে। মুখের কথায় শুধু কখনও তিনি থাকেননি, প্রতিটি সংকল্প বাস্তবায়নে শ্বশুরে কাজে নেমেছেন। স্বয়ং কৃষ্ণগোত্র প্রাণীর সেবা করেছেন, শাখান্য পরিষ্কারের কাজে নেমেছেন, অপরকে নামিয়েছেন, সরল সুখ পাবলস্বী জীবনযাত্রার শুধু প্রবক্তা নয়, হাতে-নাতে কাজে নেমেছেন। প্রতিটি মানুষকে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য সমাজের কাছে দায়িত্ব পালনের কর্তব্য ঘোষণা করে উত্থান করেছেন ‘bread-labour’ গ্রন্থ, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে হাতের কাজ সকলকেই কিছু করতে হবে দাবি করেছেন। অবৈধকে সহ্য করে শুভ কর্ম শেষে নিজেকে নেমেছেন, সবাইকে ডাক দিয়েছেন। মাঝে মাঝে বলেছেন যে, কোন বিশেষ প্রজ্ঞা বা কার্যক্রম গ্রহণ করার আগে ভাবা দরকার যে, তার ফলে সব চেয়ে দুর্গত মানুষের কিছু কল্যাণ ঘটবে কি না। দুঃখী মানুষের চোখ থেকে অজস্র লুচি দিতে না পারলে শাস্তি নেই, তাঁর এই কথা একেবারে অকৃত্রিম মানবমততা থেকেই উৎসৃত। আত্মিকায় মনুষ্যমীতির নির্লজ্জ পৈশাচিক লজ্জা তাঁর চোখে ফুলে দিয়েছিল, দেশে ঘিরে নিজে সর্বত্র ঘুরে জেনেছিলেন মানুষের অপর দুঃখের কথা। যে-দুঃখ ধর্মের সাধনা কিনা সহ্য করাই সম্ভব হত না। তবে আমরা অনেকে যাই ভাবি, ধর্মবিশ্বাসী গাছী ধর্মকেই বাস্তবায়ন করতে চেয়েছেন সং, সহজ, স্বাধ, যথাসম্ভব সুখী সমাজ গঠনের কাজে। নিজস্ব ভঙ্গিতে মানবমততাই ছিল মূল অনুরোধ। আর এজন্যই যখন ইংরেজ সফাজোর দুঃশাসন মূর্তি কর্ণভারে দেখা দিল জালায়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড ও আনুসঙ্গিক বর্বরতায় (এপ্রিল ১৯১৯) আর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতিতে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের হুকুমে ভূকীর খলিফার রাজত্বটি (Lloyd George বলেছিলেন যে, ‘the last and most triumphant of the crusades’ জেতা গেছে) সারা দুনিয়ার মুসলমানদের হুক (অতৌতিক হোক বা না হোক) বিঘ্নে কালানুজ্ঞান-এর মতো সংগ্রামী সাম্রাজ্যবাদবিরোধীদের পাশে দাঁড়িয়ে গাছী কোল দিলেন স্বদেশের মুসলমানকে আর বললেন

যে, ইংরেজ হুকুম হটাবার জন্য হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সংগ্রামের সুবর্ণসুযোগও এসে গেছে। এটা নিছক রাজনৈতিক হিসাব একেবারে নয়, মানবমততা, স্বদেশের শৃঙ্খলমোচনের সংকল্প, সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে পাকিয়ে তোলা হিন্দু-মুসলমানের অনৈক্য নীকরণ ও ভারতবাসীর জীবনে কল্যাণসাধনই ছিল মূল প্রেরণা।

গাছী চলে গেলেন আততায়ীর অন্ত্রাঘাত। প্রায় অনুরূপ দুর্ঘটনা হল ১৯৯২ সালে বাবার মসজিদ ধ্বংস। মনে পড়ছে, আমার বন্ধু, কশীর বিশ্বনাথ মন্দিরের পুরোইত বংশের কল্যাণপতি ত্রিপ্রাণী মুন্ডার পূর্বে বলেছিলেন যে, বাবার মসজিদ-এর একটি ঠিটও ভাঙা হয় তো তিনি সেখানে গিয়ে আমার প্রাণোপবেশন করবেন। তিনি কংগ্রেসের নেতা, কিন্তু প্রগতিশীল বা বিশেষভাবে ‘সেকুলার’ বলেও পরিচিত ছিলেন না। কিন্তু তিনিই বলেছিলেন

এই কথা, যার তুলনীয় কোনও বক্তব্য শোনা যায়নি আজকের নেতাদের কাছ থেকে (বিশেষী পক্ষও আমার এই অভিযোগের অন্তর্ভুক্ত)। গাছী বা আর কেউ তো চিরজীবী হতে পারেন না, কিন্তু গাছী যদি আরও বাঁচতেন এবং সক্রিয় থাকতেন, তাহলে হয়ত বা ১৯৫০ সালে মুন্ডার কিছু পূর্বে তালিম ভারতের রাষ্ট্রদূত কে শি এস মেনকে ভারত ও পাকিস্তানের ‘confederation’ বিষয়ে যা বলেন তার সম্ভাবনা মূটে উঠতে পারত। আজকের ভারত উপমহাদেশে যে নোরা পরিহিতা হাজির হয়েছে তা থেকে হয়ত বা পরিত্রাণ অসম্ভব হত না। পরিত্রাণ করে লাভ নেই, তবু গাছী-জয়ের পর একশো পঁচিশ বছর কেটে যাওয়া উপলক্ষে ‘মরণ কবি মানুষটিকে, আর অনেকের কাছে অবশ্য মনে হলেও বলি, কবি সত্যোন্নয়ন দত্তের ভাষায়— ‘কয় মাথা পুরুশোভম গাছীর গায়ে জয়!’

চতুর্থ সর্গে আগামী সংখ্যায় ছাপা হবে

ইতিহাসের অভিজ্ঞতার নিরিখে গভীর বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধ ‘সংস্কৃতির অবক্ষয়, সাম্প্রদায়িকতা ও বাঙালির সম্ভ্রান্তি ভাবনা’। প্রবন্ধের লেখক আহমদ রফিক। ইনি ঢাকার রবীন্দ্রচর্চা কেন্দ্র টাউন্টে চোয়ামান, কবি, প্রাবন্ধিক এবং কলামলেখক।

মহাত্মার জীবনদর্শন, স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অমূল্য ভূমিকা, দেশের সমাজ-জীবন সম্বন্ধে তাঁর চিন্তার আলোচনা করেছেন শ্রী অশীন দাশগুপ্ত দুটি প্রবন্ধে। অন্য গান্ধী এবং বাপু। শ্রীদামপ্রভুর মৌল বক্তব্যের উল্লেখ করা যেতে পারে।

বিলাতের বারিস্টার হওয়া সত্ত্বেও গান্ধীকে যেভাবে একজন সাহেবের প্রেমের প্রথম প্রেমের কামরা থেকে নিতে ফেলে দিয়েছিল, তা সুশ্রুতিগত। সেদিন রেলস্টেশনে বসে সারাত গান্ধী কী ভেবেছিলেন, তা কোনমতে জানা যাবে না। লজ্জা করার বিষয়, যে দেশে প্রত্যাভর্তন না করে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকা চলে গেলেন। বর্ণ-বৈষ্যম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত স্বৈরাচারের শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে গান্ধী সাহসের সঙ্গে পরিচালনা করেন অহিংস সত্যাগ্রহ। তাঁর সংগ্রাম ভারতীয়দের ব্যাপক সমর্থন লাভ করে। তাঁর মনে জাগে আত্মপ্রত্যয়। দেশে ফিরে স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন পর্বে গান্ধী অবিরল আত্মা নিয়ে অহিংস সত্যাগ্রহ পরিচালনা করেন।

গান্ধী ভারতবর্ষকে ভালবাসতেন। দেশের মানুষের মঙ্গলের জন্য তিনি সূত্রে কাটার উপর গুরুত্ব দেন। তিনি মনে করতেন, এর হলুদ শ্রী-পুস্পের জীবিকার ব্যবস্থা হবে। ভারতবর্ষ ছড়িয়ে আছে সাতলক্ষ গ্রামে। শহর গ্রামকে শোষণ করে। ভারতবর্ষকে বীজ্যত্ব হলে গ্রামে যেতে হবে। স্বাধীনতা আন্দোলনকে তিনি গ্রামমুখী করেছিলেন। এটা তাঁর অসাধারণ কৃতিত্ব। এতদিন আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল শহরে। ইতিপূর্বে আমরা গান্ধী-পরিচালিত বিভিন্ন গণআন্দোলনের আলোচনা করেছি। অহিংস সত্যাগ্রহে তিনি অক্লান্ত ছিলেন। বিদ্রোহী আন্দোলনকে তিনি সমর্থন করতেন। বিদ্রোহী আন্দোলনকে গান্ধী মন্থনিতর মনে ভেঙে পড়বে এবং জাতীয় আন্দোলনকে শেষ পর্যন্ত দুর্বল করবে। নতুন সমাজ গড়বার জন্য অহিংসার দরকার। তিনি মনে করতেন, “ভিত্তিই সত্যগ্রহের বৈজ্ঞানিক। তাঁর পথ ধরেই ভারতবর্ষ বিশ্বের লোকের কাছে শেঁছাবে।”

গান্ধী ইসলাম এবং মুসলমানদের ভালবাসতেন। বিলাফ আন্দোলনে মুসলমানদের প্রতি তাঁর ভালবাসা প্রতিফলিত। কিন্তু হায়, ব্রাহ্মণ্য কামাল স্বলিফায় পড়ই অবরুদ্ধ করলেন। গান্ধীর গড় প্রত্যয় ছিল, হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে হারী সত্যপ্রতি গড়ে উল্লেখ না পারলে দেশ স্বাধীনতা অর্জন করতে পারবে না। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এই মতে অবিরল ছিলেন (১)

এর জন্য তাঁকে চরম মূল্য দিতে হয়েছিল।

১৯৪৭-এর পরের কাল পর্বতে বলা চলে গান্ধীর জীবনের “শেষ দীপ্ত অধ্যায়।” ২৭শে মার্চ সাম্প্রদায়িক দাম্পত্য বিভীতি পর্ব। ২৮শে মার্চ সৈন্য নামল কলকাতার রাসপথে। কলকাতায় ছুটে এসেন গান্ধী, মাইটব্যটনে যৌকে বলেছেন, “My One-man Boundary Force”। বেলেঘাটার অবস্থান করে সার্বভৌমিক সঙ্গে নিয়ে তিনি দাম্পত্য বন্ধের জন্য জীবন মণ করলেন। এই দাম্পত্য চলেছিল স্বাধীনতার আগের দিন পর্যন্ত। মনে রাখতে হবে যে, তাঁর অনশনের বিরুদ্ধে হিন্দু সমাজের একটি বড় অংশের তীব্র অসন্তোষ ছিল।

কলকাতার পরে দাম্পত্য ছড়িয়ে পড়ল নোয়াখালিতে। তিনি নোয়াখালিতে ছুটে গেলেন। নোয়াখালির পরে দাম্পত্য ছড়াল বিহারে। প্রায় ৫০০০ মুসলমান হিন্দুদের হাতে খুন হল। উদ্ভগত বন্ধের জন্য তিনি গেলেন বিহারে। ডিসেম্বর (১৯৪৬) থেকে অবস্থার পরিবর্তন দেখা গেল। গান্ধীর প্রচেষ্টার সঙ্গে মিলিত হয়েছিল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বিজয় তরঙ্গ। মার্চ মাসে সার্বভৌম পুণি ধর্ম্যত্ব। বিহারের গণআন্দোলনের সাফল্যের মূল ছিল জাতিপ্রাণ থেকে শুরু করে ধর্ম্যত্বের দ্বন্দ্ব এবং কমিউনিস্টদের মিলিত চেষ্টা। শ্রী দীপঙ্কর ভট্টাচার্য এই পর্বের বিবরণ দিয়েছেন (২)

ইতিমধ্যে শাস্ত্রাবধে ডাবার এবং ক্রমবর্ধমান দাম্পত্য প্রতিক্রিয়া হিসাবে দিল্লীতে শুরু হয়েছিল দাম্পত্য। বিহার থেকে গান্ধী এসেন দিল্লীতে। বরাহমুখী সর্দার পাটেল এই সময়ে হিন্দু সাম্প্রদায়িক প্রচেষ্টার সমর্থক হলেন এবং পাকিস্তানকে ৫৫ কোটি টাকা দেশের পূর্ব পর্বত অধীকার করলেন। তাঁর অনশনের সমগ্র গান্ধী পাটেলকে বলেছিলেন, তুমি সেই সর্দার নও যাকে আমি চিনতাম (You are not the Sardar I once knew) (৩)

ইতিমধ্যে গান্ধী-হত্যার ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে গিয়েছিল। আঘাতিক গবেষণা থেকে জানা গিয়েছে, সাতারকরের শিষ্য এবং ভক্ত, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সভা নাগরায় গড়সে গান্ধী-হত্যার দায়িত্ব নিয়ে দিল্লীতে এসেছিলেন এবং প্রাণদান-সভায় তাঁর হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিলেন। বরাহমুখী সর্দার পাটেল এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করেননি। ৩০ জানুয়ারি (১৯৪৮) গান্ধী-হত্যার পরে সর্দার পাটেলের বাস-ভবনের সামনে জাতিপ্রাণের পরিচালিত মিছিলে শেখরাবীর ভোম

প্রতিভাত। নেহরুর অবৈশ্বাস্য বক্তৃতা কানে বাজে: “Friends and Comrades the light has gone out of our lives and there is darkness everywhere.”

অধ্যাপক গোপাল কম্বাট হস্তান্তরের দিনটিকে ‘এক বিশ্ব প্রভাত’ বলেছেন (৪) রক্ষণশীল গোষ্ঠী সমাজের পুনঃভাগে এল। ডি পি মেনন হলেন উড়িষ্যার অস্থায়ী গভর্নর। ইতিমধ্যে শরৎ বোসের সঙ্গে কলকাতার মধ্যস্থিত্যাক শেষ, তিনি আবার বামপন্থী শিবিরে। কংগ্রেস থেকে শরৎ বোসের পদত্যাগের পরে ডি পি মেনন শর্তে লিখেছেন: “...[I] do not support the Right-wing which is now in office, we will be swamped by the Left.” (৫) নিঃসন্দেহে মুক্তিপূর্ণ বক্তব্য। মেনন তখন মাইটব্যটনে এবং সর্দার পাটেলের শ্রিয় পাত্র। দক্ষিণপন্থীদের প্রধান নেতাদের মধ্যে ছিলেন এই তিন ব্যক্তি। ভারতীয় দমনভিত্তি দেশের অর্থিক জীবনে নিজেদের ক্ষমতা প্রসারিত করতে সচেষ্ট। টিমার্য নেতিয়েছেন, শাস্ত্রীর পুরনো ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠানকে ১৯৪৫ সালের পরে মাদেয়াবীরের হাতে ছেড়েছিলেন। ডালমিয়ারের হাতে গেল রেকিট কোমরান কোম্পানি, সুরভঙ্গ নাগরাল কিনে নিল ডেভেলপমেন্ট এবং ম্যাকলডেভ, সার ব্রিটান্স গোয়েন্দার দপ্তরে এল অল্টেভিয়ার স্টিল এবং ডানকান ব্রান্স (৬) একই বলে ভাব। বঙ্গ ব্রিটিশ অধিপত্য বিলীয়ায়ন, শুনহান পূর্ণ কচ্ছিক মাদেয়াবীর সম্প্রদায়। এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় মনে রাখা দরকার। জাতীয় নেতারা শিক্ষণত্বের হাতের পুঙ্খল হানি। অগ্রদূত দত্ত টিকই বলেছেন— “বাসবায়ীর সঙ্গে জাতীয় নেতাদের যোগাযোগ শেষে এই সিদ্ধান্তে আসা টিকই হব না যে, দেশের নেতারা বাসবায়ীর হাতের পুঙ্খল হয়ে গিয়েছিল। ইং গোল্ডার সামাজিক ভিত্তি এবং সত্যগ্রহ নিয়ে ভিঁজি ছিল। আসলে এদের ভিতর স্বার্থের বিরোধ ও পরিপূরকতা দুইই ছিল।” (৭)

আমরা বাংলার অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করব। ১৯৪৫ সালে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে কংগ্রেস নেতারা সমস্তরকমের প্রচেষ্টা শেখলেন। গান্ধীদর্শী বাদি গোষ্ঠীর নেতা ডঃ প্রমুদ্র যোগ হলেন প্রধানমন্ত্রী। দিগন্তে আর এক নেতার দক্ষতা তখন উদীয়মান। তিনি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। চট্টগ্রমে দশকে মাদেয়াবীরের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের বিষয় কে সি উল্লেখ করেছেন (৮) তিনি হলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। আধ্যাত গোপাল যোগই বৈশ্বকেন, ডাঃ রায় একজন প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিবিদ, অন্যান্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের তুলনায় সর্বাপেক্ষা রক্ষণশীল (৯) নব্বের আশ্রিত সত্ত্বেও তিনি বরাহমুখী কিরণপুত্র রায়ের সঙ্গে মিলিত হয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে ছাঁচ নিষিদ্ধ করলেন।

শ্রীঅশীন দাশগুপ্তের বক্তব্য দিয়ে গান্ধী সম্বন্ধে আলোচনা শুরু হয়েছি। তাঁর বক্তব্য দিয়ে এই আলোচনা শেষ করা হচ্ছে।

অস্পৃশ্যতা-বর্জন গান্ধীর রাজনৈতিক জীবনে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল। টেবুলকর অনেক দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখিয়েছেন, গান্ধী কী দৃঢ়ভাবে হিন্দু সমাজের বাস্য উপেক্ষা করে অস্পৃশ্যদের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। আয়েবর অবস্থা গান্ধীর সামাজিক আদর্শের সমাধোচনা করে বলেছেন, গান্ধীর মূল লক্ষ্য ছিল ক্ষমতা দখল, অস্পৃশ্যদের জন্য বাস্তবে তিনি কিছু করেননি। পার্লামেন্টের সভা থেকে শুরু করে আমলাতন্ত্রের মধ্যে হিন্দুদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত (১০)

শ্রীদামগুপ্ত লিখেছেন, গান্ধী হিন্দু-মুসলমান একা হয়েছিলেন, সে একা ঘটনা। তিনি বিহায়ে থেকে দেশের মানুষকে সরিয়ে নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ‘হিংসা এখন ভারতীয় সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে গেছে’। ভারতের মানুষ তাঁর অহিংসার আদর্শ বর্জন করেছে (১১)

শ্রীদামগুপ্তের বক্তব্য আশাতৃষ্টিতে সঠিক মনে হলো একটি ঐতিহাসিক সভা স্বীকার করতে হয়। গান্ধীর আদর্শ, তাঁর রাজনীতিক জীবনের সামান্য ভারতের প্রাণভিত্তিক অংশকে এবং প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগণিতিক চিন্তা ও কর্মসূচিকে প্রভাবিত করেছে। ইতিহাসে ক’জন ব্যক্তি এই দীর্ঘহাটী সাম্রাজ্য অর্জন করেছে?

তথ্যনির্ণয়

১. অশীন দাশগুপ্ত, অন্য গান্ধী, বাপু, দেশ, ৩০ জানুয়ারি, ১৯৯৩
২. দীপঙ্কর ভট্টাচার্য, শেখের মুক্তমেটস ইন বেকল এ্যান্ড হায়, ১৯৩৭-১৯৪৭, ১৯৯৩
৩. সুমিত সরকার, মর্মান ইতিহাস, ১৯৮৯, পৃঃ ৪৩৮
৪. গোপাল, জওহরলাল নেহেরু, ২য় খণ্ড, অক্সফোর্ড, সুনীল সেন, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ অধ্যায়, পৃঃ ৭৮
৫. শ্রী কালেকনসন, ১৯৪০-৪৮ ইতিহাস অফিস লাইব্রেরি, অগস্ট ১৯৪০। মেজর শর্ট ১৯৪০-এ দিল্লীতে অসুস্থিত সারা ভাড়া ছাত্র বৈশ্বকেনের বিশেষ সম্মেলনে যোগদান করেন; পি.সি. জোশী ও অরুণ কলসে সঙ্গে তাঁর তখন আলোচনা হয়। ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশে শ্রীইন্ডিয়ান সিজিল সার্ভিস থেকে পদত্যাগ করেন এবং লন্ডনে ফিরে যান। ১৯৪৭ সালে তিনি ক্রিপলের দুই আকর্ষণ করেন এবং তাঁর বিশেষ দৃষ্টি হিসাবে দিল্লীতে আসেন। ইতিহাসবিদ স্কেভারেল মঠের সঙ্গে তাঁর মাসের পর মাস পত্র বিলম্ব হয়। উৎসাহী গান্ধীকে মনে এবং শর্তে মধ্যে পত্র বিনিময় দেখতে পারেন। সেদিন স্কেভারেল মুন ভারতীয় রাজনীতিতে অগ্রগতহাল করেছিলেন। এই লেখায় এই বিষয়ের বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়।
৬. টি.এ. টিমার্য, দি মাদেয়াবীর, ১৯৭৮, পৃঃ ৭৮, ১০০

৭. অম্লান দত্ত, ভারতের আর্থিক বিকাশ ১৯৮৮, পৃঃ ৮১-৮২।
 ৮. পারসোনালা জাহির অব আর, জি, কেসি— ইন্ডিয়া অফিস
 লাইব্রেরি, ৭ নভেম্বর ১৯৪৪ এবং ৭ জুন ১৯৪৫।
 মাড়োয়ারীদের সঙ্গে জাঃ রায়ের যোগাযোগ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য
 বি.আর. টেলিনসন, দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস এ্যান্ড
 দি রাজ, ১৯৭৬, পৃঃ ৪২।
 ৯. গোশাল, তদেব, রায়কে নেহেরুর চিঠি, ১৩ মে, ১৯৪৯,
 সুনীল সেন, স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ অধ্যায়, পৃঃ ৭৪।

১০. আয়েদকরের বক্তব্য, দেশ, ৩১ জুলাই ১৯৯৩। আয়েদকর
 বলেছেন, অস্পৃশ্যদের জন্য নতুন গ্রাম তৈরি করতে হবে।
 হিন্দু সমাজ থেকে অস্পৃশ্যতা অবশ্যই দূর করতে হবে।
 ভারতীয় সংবিধানে এর ব্যবস্থা করা দরকার। সংবিধানে
 অস্পৃশ্যরা কিছু সুবিচার দাবি করে। মুসলমানরা দাবি করছে
 পাকিস্তান, তুলনায় অস্পৃশ্যদের দাবি সামান্য।
 ১১. দাশগুপ্ত, বাপু, দেশ পৃঃ ২৮, ৩০ জানুয়ারি, ১৯৯৩।

তিনটি কবিতা

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

শেষবার তোমার কোলে মাথা রেখে

শেষবার তোমার কোলে মাথা রেখে কৈদেছিলাম মুজিব যখন
 মৃত্যুদণ্ড এবং প্রবাসে।
 এরপর ফিরলেন তিনি স্বদেশে, সংক্ষিপ্তভাবে উদ্ঘাষিত হয়ে
 নিহত হলেন যেই, কালার বদলে ইতিহাসে
 পর্ণালোচনায় খুব ডুবে গেছি, এবং দেখেছি
 অনান্য অনেক চোরা খুন,
 তথাপি ভেঙে পড়িনি, সুজিত চৌধুরী আর জাকারিয়াদের
 বাঙালির আশাশরিচয়
 বিষয়ক সেমিনারে এমন-কি কুট তার্কিকের
 ভূমিকা নিয়েছি কিংবা নর্মদা নদীর
 সংরক্ষণে যে-নদীটি ব্যস্ত আছে তার
 আর্তির ভিতরে কেন আরো যুক্তি নেই ইত্যাকার
 শলাপরামর্শের ভিতরে
 পংকজ ফারুক আর আলমের সঙ্গে বেফজুল
 প্রবৃত্ত হয়েছি।

তার অর্থ নয় এখন আমার
 চিনাকালে অশ্রু নেই, আমি শুধু বলতে চেয়েছি:
 এক-এক শতকে শুধু একটি বিরাট কান্না সংঘটিত হয় একবার।

কৃষ্ণ এখন রোহিনীর কাছে শুয়ে

মহান্না থেকে মহান্না গুরে আমরা ক'জন
 বিবেকের বুড়ি ছুঁয়ে
 ধর্ষিতাদের তালিকা তৈরি করে
 দরবার যেই করতে গিয়েছি, সমূহ সেবাসদন
 খাড় ধরে আমাদের
 বার করে দিল, এমন-কি এম.পি-রা
 নিতান্ত এক মুঁয়ে
 নিভিয়ে দিলেন দলছুট এই বিমর্ষ আয়োজন;
 আকাশেও আছে এজলাস ভেবে আমরা দেখি তখন:
 কৃষ্ণ আছে রোহিনীর কাছে শুয়ে!

সব জেনেছে পাখি বা লোকগীতি

বিশোল হাওয়ায় খঞ্জনের নাচে
 তৈরি হলো চিকন জালিকাজ
 সেই বাড়িতে থাকব আমি আজ
 ধার্য করে যেই-না এসিয়েছি
 রক্তে-রক্তে লুকিয়ে আছে দেখি
 আমি রিআস্তির।

আক্কা বাঁশের চাকের চালুন নিয়ে
 রাজশাহির মেঘেরা গাইছিল
 মুখা ধরব ঠাউরাতেই ওরা
 বলল মুত্য়া নির্ধাৎ এই গান
 গাইলেই একবার।

ফায়ার এলার্ম

কৃষ্ণ ধর

ছুটে যায় লালগাড়ি উর্ধ্বাঙ্গে শহরকে চকিত করে
কোথাও আগুন লেগেছে তাকে বুঁজে নেভাতে হবে
দৃষ্টি বাজাতে বাজাতে তারা চলে যায়
শহরের জটিলকুটিল পথ ধরে
আগুনের উৎসের কাছে কোনোদিকে না তাকিয়ে
শুধু ওই লাল জিভ লক্ষ করে মথারাতে একা।

আগুন বাইরে ঝলে ভিতরেও ঘরে ঘরে
ঝলছে আগুন সম্বৎসর কৃষ্টি ও খরায়
একা একা এই দ্বন্দ্বের সংসারে
সেখানে ফায়ার এলার্ম বাজাবার কেউ নেই
লালগাড়ি নেই, হোয়া নেই, টিংকার আকুলতা নেই
শুধু প্রব্রের পাহাড় উঠেছে উঁচুতে
শহরের স্মাইলফেসারের মিথ্যা স্পর্শকে ছুঁয়ে
বৃষ্ছনীলিমার বৃক্কের কাছটিতে

নেই কোনো জলাশয় চারিভিত্তে দক্ষ শহরে
সভ্যতার ভূকম্বর্ত কঠোর সামনে টাটটেলাস্ মিথ্যার কুশাশা
ছড়ায় সব ঢেকে দিতে

আশাতত বৃহৎপতির বৃকে বাজছে ফায়ার এলার্ম
দেখানেও কোনো জলাশয় নেই
ভূকম্বার সমুদ্রভরা প্রবালপাথর আর কয়েটি কঙ্কাল
তার জল শুয়ে নিয়ে গেছে পৃথিবীর মতোই কোনো আকাল ভয়াল।

খোলস-ভাঙা মানুষ

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

মানুষ বড় কম দেখিনি। মাটির মানুষ, রাগী মানুষ,
মহৎ, উদার, কৃপণ, পানী, দাগী মানুষ,
কম্বী, ভোগী, প্রেমিক, লোভী, কুর মানুষ,
অকর্মণ্য, দুঃখী, ত্যাগী, গুঢ় মানুষ,
হিংস্র, কোমল, শাস্তিকামী, যুদ্ধপুংহ,
গোয়ার, অটল, যুক্তিবাদী, নমনীয়,
রাজনীতিক, কূটনীতিক, সর্বগ্রাসী,
বিলুপ্ত, সন্তোষপ্রবণ, অবিশ্বাসী,
সদালাপী, রসিক, স্বয়ংসিদ্ধ মানুষ,
অসুখী আর যন্ত্রণাতে বিদ্ধ মানুষ,
ফাঁপা মানুষ, চাপা মানুষ, খোলা মানুষ,
সংশয়ী, সতর্ক, আগুনভোলা মানুষ....

অনেক মানুষ দেখা হল এই জীবনে,
সাজিয়ে তোলা হল অডেল নিভা-নতুন বিশেষণে
ঠিক সেভাবে, যেমন থাকে বিজ্ঞাপনের পরিচয়ে,
আজ দিনান্তে পড়ছে ধরা টিকের মনেই নিঃশ্ব হয়ে
খোলস-ভাঙা মানুষ তুমি আজও জটিল অন্ধকারে
এক বিশেষণ, দুই বিশেষণ, তিন বিশেষণ এক আধারে।

জুপিটার জানে না

ভাশস সেন

গ্রহরাজ বৃহস্পতি
তুমি কি জানো ইতিমধ্যে তোমার মুখের জিওগ্রাফী পাশ্টে গেছে?
তুল হল, জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভাষায় সঠিক হবে জ্যোতির্বিজ্ঞানী!
একছড়া মুক্তার মালা, পার্ল নেকলেস
সূর্য্যেকার নশ্পতির দেওয়া আদরের নাম 'পার্ল নেকলেস'
মহাকাশের কোন অজানা দূরত্ব থেকে আছড়ে পড়বে
সূর্য্যেকার লেভী বৈশ ক'মাস আগেই
দিনক্ষণ নিশুত্ব হিসেব করে জানিয়ে দিয়েছিলেন
যে গ্রহরাজ তুমি যে অতি প্রকাণ্ড আমাদের এ পৃথিবীর তুলনায়
বিজ্ঞানীদের মাশে অনেক বড়ো, আইও, গানিমেন্ড, ইয়োরোপা
ও ক্যালিস্টো চার চাঁদের গর্ভ তোমার

কিন্তু আমরা যা জানলাম
দূরত্ব অতিক্রমী দূরবীন দিয়ে
এই ছোট পৃথিবীর ক্ষুদ্র মানুষের সৃষ্টি
দূর আকাশে স্থাপিত স্যাটেলাইটের নতুন নয়ন দিয়ে
তোমার ওশিটে যে মহাসংঘর্ষ ঘটল সতেরই জুলাই থেকে
ক্রমাঙ্ক্য বারবার
আবার তোমার ওশিটে চেহারাও আমরা
কয়েক মিনিটের মধ্যেই
ঘনন হে গ্রহের রাজা বৃহস্পতি (বাই জোভে) ঘূর্ণশাক খেয়ে
আমাদের দূরবীনের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হল
দেখা গেল, অতিকায় বৃহস্পতির চিরপরিচিত 'রেডস্পট' ছাড়াও
ক্ষতচিহ্ন তোমার বুকে মুখে, আর জানলাম সেই চিহ্ন
আমাদের পৃথিবীর প্রায় আখ্যানা মাপের
শরে আবার জানা গেল, আরো বড়ো

সূর্য্যেকার ধূমকেতুর চুচন চিহ্ন

আমাদের পৃথিবীর ডবল আয়তন
আর ভারি, শুণু ভারি
আমাদের এ পৃথিবীতে যে প্রশ্ন আছে মন আছে চোখ আছে
তোমার অতি বৃহৎ বরষুপ্ত শুণু নিবোই প্রাপ্তহীন জড়পিণ্ড
এই নিবোই বিরাট কটন গোলক আমাদের চোখে তাও অদৃশ্য

কারণ, তোমার সত্তাকারের দেহ আছে নানা অস্থঙ্ক
গ্যাসীয় ঘেরাটোশে ঢাকা
আর সেই আবরণও এই পৃথিবীর ইনহ্রময়েরত:
বিশ্বকবির বিশ্বপরিচয়ের
লাল উজানী আলো দিয়ে আমরা বৃহস্পতি তোমার বারবীর,
পৃষ্ঠি গ্যাসীয়

আবরণ ভেদ করে দেখতে শেল্যাম
ফলকে ফলকে পলকে পলকে
তোমার পরিবর্তিত রূপ—
কিন্তু হয় মুক্তমালায় ধূমকেতু এত বড়ো সংঘর্ষ ঘটল
সে বিষয় উদাসীন বৃহস্পতির মূলিকণা থেকে
অতিকায় বিশাল পর্বত প্রস্তর
কেউই জানল না জানবে না কোনও দিন
যা নাকি লক্ষ বছরের মধ্যে এই মাত্র ঘটল
তোমার যে ফলন নেই মন নেই
নেই কোনও প্রাণের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আভাস
যে সৌররাজার গ্রহমণ্ডলীর রাজাবিরাজ,
কী আঘাত এল তোমার ওপর
আবার এও শুনি যে এই হঠাৎ আসা ধূমকেতু
শালোমার মানমন্দিরের সদা আবিষ্কার তার সিকির সিকিও
যদি আছড়ে পড়ে এ পৃথিবীতে
কখনও কোন দিন
তবে ক্ষণকালেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে
আমাদের চেতনা
আমাদের সকল সভ্যতার ইতিহাসের অহঙ্কার
আর অসভ্যতার গ্রামিণী ও অশমার
তুমি তো জানলে না
কিন্তু আমরা অজানা অশঙ্ক্য উদ্ভি
আমাদের যে মন আছে ভয় আছে
চিন্তা আছে

সার্চলাইট

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

বুক পিছলে গর্জন জ্যোৎস্নায় ডুবে গেল
পাতাভাষান। ওপরে বানজলের মতো লোকের আবর্ত।
সবাই সবাইকে ঠেলে আগে ছুটিয়ে। উজাল ট্রাফিক।
জিলতে ফাঁকটুকু নিয়ে খোয়া পিচ হকার আর মাইকের
রোলারগুলি—একটা ঘাসকোড়ও কেউ উঠতে দেবে না।
ঘাম-মোটা ঝলঝল করাছিল কাগজিলেবুর মতন
মুখখানায়। এখন আর মুখ নেই।
পার্কেও সে বসে না আর। নেই বলে।
বর্ষার আয়স্ফটের ভিলে কাম সেক্রে সেক্রে,
শাঁক পোস্টারের নেতা জড়িয়ে, ঘিরেছে সে এইমাত্র।
ডাঙ্গাপ। ছাদলা ধরা রোম্যকের খাপগুনো।
সবজো ব্যাঙ মকুমির চার ঘের নেমা পেছন ডিটিতে
সে এখন বসে বসে মশার বোলতান গান শুনবে।
ওপারের দশতলা হ্যাটবাড়ির খোশে খোশে
আলো গান ভেঙে উঠল। সার্চলাইট পড়ৈ ফার সাদা
তাকে ফুঁড়ে চলে যায়। পায় না কাউকে। নেই বলে।

দুটি কবিতা

কবিরুল ইসলাম

এক ॥

প্রতিমা কে চায়, বলো, বিশুদ্ধ বিবেকী,
মুষ্টিপূজা যেন দেউটি নিভুছে একে-একে :
নিজস্ব নিষেধ তুলে মুষ্টিমেয় রুচি
দিনে-দিনে ফুল হয় বায়ুগ্রস্ত শুষ্কি ॥

দুই ॥

আকাশে শ্রাবণী মেঘ পরেছে মুখোশ
গাছশালা সবুজ আরও প্রাকৃতিক টেউ-এ
টেলিফোন সৌড়ে যায় 'ঈশ্বর নিবাসে'

এক প্রান্ত মুখর যদি অন্য প্রান্ত শ্রোতা ॥

লোহার গারদ

সজল বন্দ্যোপাধ্যায়

এটা আমার বাড়ি—
এটা আমার শোবার ঘর—
এটা বসবার ঘর—

এখানে আমার মা থাকে—
এখানে আমার বউ থাকে—
এখানে আমার মেয়ে থাকে—

এটা আমার স্নানঘর—
নিজে নিজেই দেখি।

এটা রান্নাঘর—
জাতের গন্ধে মো মো করে—
এটা খাবার টেবিল—
কত কী সাজানো থাকে

কিন্তু সব কটা জানলায় যে লোহার গারদ রয়েছে।

তুমি কোন্ দিকে মুখ করে

পঙ্কজ সাহা

সবুজের আগুন ধরে আমি দাঁড়িয়ে আছি
তোমার প্রপাত্তে জিভ বলে
শুধু হাঁসের কেটে যাওয়া জলের বেঘাঘা
তোমার সিঁথির গান
মোদ শড়ে গেলে
তোমার পায়ের ছায়া সেরে যাবে
আশেপাশের কোপের ধার থেকে
কচুবনের নরম সোহাগে

সীমান্তে বাতিল রেল লাইনের ফাঁকে ফাঁকে
ফুটে আছে সন্তপ্ত ঘাসফুল

সবুজের আগুন যে কোন মুহূর্তে
ধরে নেবে আমার শরীর
আমি তোমার প্রশ্নতে জিভ বলে...

তোমাকে দেখেছিলাম এক বিনিমির কিশোরী
চোখে ভরা দিগির রহস্যভাস
এখন তোমার এলিয়ে পড়া টুলে
এক বাংলার হাওয়া খেলে
আর কপালের ঘাম সপেছে মুখিয়ে যেয়ে
এই বাংলার আনন্দনা হাওয়া

আমি সবুজের আগুন বরাবর দাঁড়িয়ে
তোমাকে দেখব বলে
তুমি কোন্ দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছ।

মাঝে মাঝে এমন কল্পনা করতে ইচ্ছা করে— বিশেষ 'দেবযান' পড়তে পড়তে— 'দেবযান'-এর প্রধান চরিত্র পুন্পের মতোই বিভূতিভূষণেরও মূল প্রার্থনা ছিল 'অশাব্দ্য'— যখনকা সরিয়ে দাও— জীবনমৃত্যুর রহস্যে ভরা সমগ্র অস্তিত্বের স্বরূপ আমাকে দেখতে দাও। এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকে বিভূতিভূষণ যখন প্রথম তাঁর নিজস্ব লেখার কলমটি হাতে তুলে নিচ্ছেন তখন ভারতবর্ষের এক ক্রান্তিলয়— গণঅভ্যুত্থান অকাল স্তব্ধিত, চরমশহীদা চরম আয়োজনের প্রস্তুতি শুরু করেছেন, শ্রমিক অসন্তোষ বিদ্রোহিত হতে চাইছে, কমিউনিস্টরা রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে প্রবেশের জন্য উইলসনের আড়ালে অপেক্ষমান। এদিকে 'কল্লোল' বাংলা সাহিত্যে অশান্ত, অসন্তুষ্ট মধ্যবিত্ত যুবকশ্রেণীর মুখপত্র হিসাবে বিদ্রোহ-ব্যাকুল। বিভূতিভূষণ কোনওদিকে তাকালেন না। তাঁর দীর্ঘায়ত সানুপুঙ্খ দিনলিপিতে ইতিহাসের সঙ্গরহমান পদধনীর কোনও প্রতিধ্বনি বাজেনি। আমরা বলতে পারলে সুখী হতাম, সামাজিক ধ্বংসযাত্রা, ব্যক্তিমানসের গহন কুটিলতা তাকে অন্তত একবার কি দু'বার আলতোভাবে, কিংবা আলগোছেও স্পর্শ করছে। কিন্তু বলতেই হচ্ছে, প্রধানত তাকে স্পষ্ট হতে হয়নি সমাজ বা ইতিহাসের কোন ডেউয়ে। যখন দূর দূরান্তের নানা মনোদল— নানা পানপাড়ে বাস্তবতার নানা তত্ত্বের সুরা বর্ণন্যা হয়ে উঠছে, তখন বিভূতিভূষণ তাঁর প্রথম গল্প লেখার প্রাথমিক অভিঘাত পেয়েছিলেন:

পঞ্জীগ্রামের একটি ছায়াবহল নিরুত পথ দিয়ে শরতের পর্ণিপুরী আলো ও অজস্র বিহঙ্গ কাকলীর মধ্যে প্রতিদিন ঝুলে যাই, আর একটি বনুকে বেঁধে পথিপার্শ্বের একটি পুকুর থেকে জল নিয়ে কলসী ককে প্রতিদিন স্নান করে যেতেন। প্রায়ই তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হই— কিন্তু দেখা ওই পর্যন্ত।

এমনকি তিনি গল্পের ফর্ষের দিকেও তাকালেন না। দেখতে দেখতে তাঁর কন্সটেন্টই হয়ে উঠল তাঁর 'ফর্ম'। একটু আগে যে কথাটি বলেছি, 'কিছুর দ্বারা তিনি স্পষ্ট হননি'— সে কথাটি এবার একটু সংশোধন করে নিতে চাই। বলতে চাই, অথচ সব কিছুই নির্নিহিত স্তরে তার মধ্যে আছে। এটা ঠিক, গল্প লেখার সময় তিনি কোনও দিকে তাকাতেন না, গল্পরসে জন্মে থাকতেন। সেই রসাবলি অবস্থায় সুসূত্রের দৃষ্টীয়গমগমা ছায়াপথ এবং নিশ্চিন্দপুন্পের ছায়াবিধি সহাবস্থিত এবং সমান সত্তা। অনুপুঙ্খগুলি পরে ভাবতে গেলে নজরে পড়ে। গল্পে তারা মঞ্জরিত পাতার

'সরাটির চরের ঝিঙে ফুল'

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

মতো স্বতঃজ্ঞাত এবং সারলীল। 'ডাকগাড়ী' গল্পে স্বস্তরবাড়ি থেকে বিভাতিত বিধবা রাসার দিন কাটে সাপের দরিদ্র সংসারে। পাটের আড়তের কর্মচারী বাবাটির চাকরি চলে যায়। জমিদার নালিস করে বড় জমা জেলক করে দেয়। বিমর্ষ বিমলিন একসঙ্গে রাসার জীবন, যে জেবায় সে বাসন মাজতে আসে তার মতো। একথা এমন করে বিভূতিভূষণ বলেননি। তিনি রাসার গণতান্ত্রিক জীবনের তথ্য জানিয়ে দিয়েই জেবার বর্ণনা দিয়েছেন:

ছোট্ট জেবাটা। চারিগাড়ে বড় বড় গাছের ছায়ায় বুশনি অন্ধকার হইয়া আছে। দুপুর বেলাতেও বোদ শব্দে ন। এইটুকু তো ডোবা, এর আবার চারিগাড়ে চারিটা ঘাট। বাঁধা নয়, কাঁচা ঘাট। দক্ষিণ দিকের জামতলায় জেলেপাড়ার ঘাট, শশিচমপাড়ার বেগতলায় নাপিতদের ঘাট, পূর্বদিকে বামুনপাড়ার ঘাট, উত্তরপাড়ে ঘাঁদের জমিতে জেবাটা তাঁদের ঘাট। তাঁরাও ব্রাহ্মণ, নিজেদের জন্য একটা ঘাট আলাদা রাখিয়াছেন, কাহাকেও সে ঘাটে যাইতে দেন না।

বর্ণনাটি জেবার রূপকল্পে একদিকে জানিয়ে দিচ্ছে রাসার পটভূমিকা, একই সঙ্গে পরোকে জানাচ্ছে, গ্রামসমাজের কাঁট রিজিউটি শ্রেণী অভ্যানে কেমন বিপন্ন। কিন্তু লেখক কোন কথাই এভাবে বলেননি। সমাজবিখ্যা বা অনন্যত্ব কিংবাসনা কোন উচ্চারণে তাঁর গল্পরস খমকে দাঁড়ায় না। জেবাটি গল্পের নিয়মে সিদ্ধ হল, জীবনের আয়রনিকে ধরিয়ে দিল, যখন রাসার ব্যাকুল মিনতিতে দান্তিক সুবি ওই বুশনি জেবার ধারে বসে রাখাকে শোনাল আরেক সর্বোবরের গান— 'যৌবন সরসী নীরে/ মিলন শতদল/ কেন্ চঞ্চল বনায় উলমল টলমল'! জীবনের দারিদ্র্য এবং বৈভবের বিপরীতার্থনামের মতো সোজা বিষয় নিয়ে তিনি গল্প লেখেন না। সোটা আরও বোঝা গেল গল্পের শেষে। স্বস্তরবাড়ি থেকে প্রত্যাহাত, বকিত, বিভাতিত, অভূত, অমাত রাসা ছোট্টাঙিক নিয়ে রানাঘাট স্টেশনে এসে দাঁড়াল। আঁচরের ফুটে বাঁধা কয়েকটি পয়সা। ঠিক এই সময়ে রানাঘাট স্টেশনে এসে দাঁড়াল দার্জিলিং মেল। রাসা আর সবু দেখতে গেল ঐশ্বর্যবান ওই মেল ট্রেনে এক 'উদ্ভীপনাময়ী কবিতা', এক ওস্তাদের বাঁধা গান। গাড়িটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কিছুকালের জন্য রাসা ভুলে গেল, জীবন এত দরিদ্র। রেলগাড়ি তাকে এনে দিল আনন্দিত হবার সার্থ্য। সেই সার্থ্যে সে হয়ে উঠল অমিত্যায়ী। যে আঁচল থেকে কটা পয়সা বার করে ফেঁসল। এই গল্প যে

তার কমনশি আশঙ্কিত যুবক—সেই সময়ের দান। বিভূতিভূষণের প্রথম বড় মাশের সৃষ্টি 'শখের পাঁচালী'-র মূল বিষয়টি এখানে অনুপ্রাণিত। অপরূপ বারের হাতছানি দিয়েছে দূরের জগৎ। এ গল্প শেষ প্রশ্ন নিশ্চিন্তপূর্ণ থেকে অশ্রু বেঁধিয়ে পড়ার গল্প। কিন্তু অধিকতর যে বিষয় অশেপা করছে নিশ্চিন্তপূর্ণের গভীর বাহিরে দূরে-দূরান্তরে সেই বিষয়ের প্রথম পাঁচ পড়া হয়েছে নিশ্চিন্তপূর্ণের দলন লাগেনে মাঠে। কিন্তু তিনি দূরে, তিনি নিরুত্তে— তদুপরে ভাবছিচ্ছে চ। বেরিয়ে পড়ার যাত্রারটি বিভূতিভূষণের জীবনে একটা শৌন্যসুন্দিক ঘটনা। ভাগ্যপুত্র, পুষ্টিয়া, আভিমান্য, সিংছ, পলচলিত জীবনের টান তিনি অনুভব করেছেন শবে পদে। কিন্তু পথে বেরিয়েছে তো ঘরের টান বোঝা যায় সব থেকে বেশি। পরশুরামপুরের কাছারিতে বাস করতে করতে তাঁর গলায় নেমে মনে পড়ছে ইছামতীর কণা:

বান করতে করতে কেবলই মনে হচ্ছিল, আমাদের গাঁয়ের ইছামতীর ঘাট থেকে এক সুন্দর সিঁধে চৈত্র পুপুরে কটি পাড়া ওটা বনোছায়ে গঙ্গা কাটিয়ে বীরবনের ছায়ায় কোকিলের ডাক শুনেও শুনতে ফিরে আসা।

আমরা একটা পরে কতগুলি গল্প ধরে ধরে দেখাব যে, বিভূতিভূষণের কাছে ফিরে আসা মানে শুধু প্রত্যাবর্তন নয়। সকলে হাত জামেন না, কিন্তু আমার সমবয়সীরা হয়ত মনে রেখেছেন, কলকাতার কেরানিরাবুদের উইকেন্ড বাড়ি দেখে। বিভূতিভূষণের প্রথম আবার গল্প সে গল্প নয়। তা নিহিত অর্থে উৎসাহকল্প।

এই যে উৎসাহমূর্তির জন্য আকুলতা, এটাকে বোঝ হ্যাঁ তিনি মনে করতেন মূল্যে মারাইনি একটা ডিমনিটো 'পালা', যা সে আশ্রম দলের প্রধান হতেন, এমনকি নির্জন শুরুরও বহন করে— তেজনে ও অর্থহতনে, মস্তিষ্কের কোন নিভৃততম কুঞ্জে তা আসা বোধে থাকে। সমগ্রটা আবার একবার বিবেচ্য। একে কিস্ত তখন আমাদের প্রচলিত প্রায়শঃ। শতাব্দীর মাঝেই ঘনিযে আসছিল এক অস্বাভাবিক। একদিকে এলিয়ারটা নাগরিকতায় আত্মা বন্ডতে চাইছে— শান্তি শুধু গ্রন্থাগারের অন্ধকারে, অপরদিকে হুয়েটোয় কুটুম্যায় নাগরিক নামক বিশাখার। চতুর্দিকের গরীবকিনীয়া এক উৎসাহভরা মাঝখানে বিভূতিভূষণের পরাজ সাধনার নৈতিক এক নন্দনিকীর্ষ তাকে দিয়েছে এক বাতাস। মনে পড়ে 'যাচাই' আর 'বংশ লতিকার সন্ধানে' গল্প দুটি এমনই গল্প। দুটি গল্পেই মূল চরিত্র দুটি মনে হারানো ঠিকানার সন্ধানে ফিরে আসছে। 'যাচাই' গল্পে দেখা যায়, চাঁদপুর গ্রামে গল্প গাড়ি টুপেই না চুকতেই শুক হ্যাঁ ছেলেসে কানে নীলবালার স্বামীয়া পরিচয়। ছায়া-শিল্প স্বহস্তের মধ্যবর্তী ব্যবধান চৈত্রবাতাসে শুকনো পাতার মতো উড়ো যায়। ন'মাংসের ছেলেসে নিয়ে নীলবালা এসেছেছিলেন। দশ বছরের বৈধবা জীবন তাঁর। আজ মূলেই বধিত কৃতী যুবক। তলসে কবে নীলবালা এসেছেন স্বজায়ে একশ

বছরের ধুলোর স্তর সরিয়ে ঠিক ঠিকানা খুঁজে নেবেন বলে। 'বংশলতিকার সন্ধানে'-র নামক নীরনের কিস্ত তার নিতুপুত্রের গ্রাম 'মোড়ি রামচন্দ্রপুর' স্বপ্নকে কোনও পুস্তিকালৈকি নেই। 'তাহার জানা ছিল না এমন একটা ছোট্ট স্টেশন তাদের সেবার কক্ষের সন্ধ্যা সে বাংলাদেশে আসে নাই হুপিপূরে এক কলিকাতা হাট'। সুন্দরভ ভারতপ্রান্ত থেকে সে এবার এদেশে তার মাতৃভূমির সীলীজীবনে। 'এ যেন নতুন একটা জগতে সে আত্মা পড়িয়েছে। এমন দেশে সে কখনো আসে নাই। যে দেশে তাহার জন্ম, সে দেশে এত বনজঙ্গল কেহ কখনো কবিরে পাশে না গ্রাসের মধ্যে। নতুন ধরনের গাছশালা, অসংখ্য গাখীর কলকল্লী, বন্যমূলের মূদু সৌভাগ্য। বড়ির রাসা শেষ হইতে রাত দশটা বাজিল। কেবল সৌদা সৌদা মাটির গন্ধ বাহির হওয়া দেশাশেয়া মাটির ঘরের দাওয়ায় কলার শাভা পাতিয়া বৃষ্টি তাহাকে বাইতে দিল। রাজা আউশ ঢালের ভাত, পেশের ডালনা, সোনামুগের ডাল, উজ্জ্বলভা, আলুভেতে, মন আঙোনে সরপাড়া মুদু, দুটি পাকা কলা, এক দলা আখের ছেলেদের পাতিলি'। এটা কেবল পশ্চিমে মানুস হওয়া একটা ছোট্ট দেশের বাড়িতে বেজাতে আসার গল্প নয়। এ গল্প সেই সময়ের গল্প, যখন শিকড় খুঁজে নেবার জন্য একটা নতুন আবেগ জায়মান। দেশপ্রেমের টানে যতটা তার থেকেও বেশি নিজে 'রাতিজামের সন্ধানে' এই খুঁজে বোঝেনা, খুঁজে পাওয়া। নীরনের যাবার কথ্য ছিল মনে পড়তে দিল। সোমানে আরে দূরান্তরে অমায়ুষ। আশ্রিত থেকে আলমোড়া, আলমোড়া থেকে বাঘুরা, বাঘুরা থেকে লিপুলেক পড়া। লিপুলেক থেকে মানস সরোবর। মনোনে ভাবে, বহুপূর্বে লিপুলেক বারিপুরে বরফ গলেছে— দলে দলে বরফের শিটে বোঝাই দিল যাত্রীরা চলছে কৈলাসের পথে। বরলা মাঝপথে তুম্বাকুরে শুষে সন্ধ্যার অন্তঃসূত্রের রত ঘরেছে। কিন্তু নীরনে মেল না। গেল না বলে সে কোনও মুমূর্ষু আশ্রয় কল না। তাদের গ্রামের বড় নিম্নাচ্ছতলায় দাঁড়িয়ে সে বাংলাদেশের নিবিড় পরিচয় যে শেষে গেলো। সে যদি কালো-পাক হ্যাঁ, তাহলে ওই নিম্নাচ্ছতলায় দাঁড়িয়ে সে মূদু গলময় ধ্বংসাত্মক করেছে— 'বাংলার মূদু আমি দেখিয়াছি, তাই আমি শুধুরি মূদু খুঁজিতে যাই না আর।' অথবা কীটস থেকে টেনে বসবে:

Happy is England! I could be content / To see no other verdure than its own.

অথবা বলবে জীবনানন্দেরই সঙ্গে:

এই ভাঙে ছেলে হ্যাঁ রূপ কে খুঁজিতে যায় পৃথিবীর পথ
বটের শুকনো পাতা যেন এক ঘাঘরক পথ থেকে আসে
ছায়া-গোছে থেকে তারা প্রান্তরের পথে পথে নির্জন আয়ালে
তাদের দেশের কত কত যাবে বিশেষ করে
অমি মনেওওতে

বাসমতী ধানক্ষেতে ছেড়ে দিয়ে মালাবাগে—

উটার পর্বতে

যাবো নাক—'

এখানে যদি আমরা স্মরণ করি, জীবনানন্দের সঙ্গে বিভূতিভূষণের সমান্তরাল সাধুদের প্রশঙ্গ, তবে তা অতীতকলা হবে না। আবার আশ্রি ফিরে শানসিঙ নীলটির ধারে, অথবা এই বাঘার বুক পাশে যে কোনও রূপেই আসে আবার ফিরে আসবে— এই মানস রূপসী বাঘার কবিতায় পুস্তকজাতীয়।

প্রত্যেক প্রত্যাবর্তনের গল্পও বিভূতিভূষণের ছোট্টগল্পে কম নেই। 'সরমতীর কাশীদাস' গল্পটি এখানে আমাদের মনে পড়বে। সরমতীর গ্রামের জীবন সুখের জীবন ছিল না। স্বজনপরিজন সবিতাক বিধবা বুদ্ধা মালেশিয়া ঘরে ভাঙা ভাঙা হচ্ছিলেন। নাতি এসে তাকে কাশীদাসী কালেনে, এক মধ্যপ্রাণা মহিলা সাধুসঙ্গের বাহ্যে করে দিলেন সরমতীর জন্য। দুটো জীবনব্যাপী, হাত বাঁটা জীবনব্যাপী সরমতীর অনন্তবন হ্যাঁ উঠল। সরমতীর আবার গ্রামে ফিরে এলেন। ন'ঠাকুরন ছুটে এলেন। সরমতীর প্রথম প্রিয়ভাঙার— আমার মূলি ভাঙো আছে? ন'ঠাকুরন জানালেন—ভাঙো নেই দিদি। ওঠে না, যায় না, তোমার যাওয়ার পর থেকেই গোলাসে শুয়েছি। ন'ঠাকুরন মূলিকে দড়ি ধরে নিয়ে এলেন। দ্রব ঠাকুরন তার গায়ে, মুখে হাত বুলিয়ে আবার করত লাগলেন। মূলির চোখে জল পড়ে, তাঁরও চোখে জল পড়ে। ন'ঠাকুরন বললেন— আর গায়ে ও তোমার মেয়ে ছিল দিদি। বাবা দিয়ে দ্রব ঠাকুরন বললেন— মূলি এজাইনি আমার মেয়ে, আর আন্ডা ছেড়ে দাও। কাক বড় মেয়েটি ছুটে হল— এয়েদেই শুনে ছুটে দেন্ধাতি আলম। আমাদের কথা মনে ছিল? এভাবে তখন লো পড়ল। আশ্রয়ের লম্বা দিন বীরবনের আড়ালে হারাতে চলেছে, যেটোকাল মূলেনে উগ্রকৃষ্ণ গন্ধ বাতাসে ভাসবে। দ্রব ঠাকুরনের মন শান্তিতে অবিস্ম পূর্ণ হবে। তিনি শ্রমোনে পূর্ণসিঙ হ্যাঁয়ে। ফিরে আসার এই অসুভূতিক লোক-কথনে। দ্রব ঠাকুরনের গ্রামীণ জীবনের গল্পটিতে সমস্ত প্রাকৃতিক ও মানবীয় সম্পর্কের শটুমিকায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, তাগল তাকে উগ্রকৃষ্ণ কত নিরুপক করা হয়েছে কাশী দীপনে। সংসার সম্পর্ক বিবর্তন, অস্বাভাবিকবিশ্ববর্তন কাল ব্যাকুল এক নরীকে স্থান দা হ্যাঁয়ে সরমতীর বিপরীতে। তখন থেকেই পাটচোটে শুক করছে গল্পের সূর। কাশীবাসিনীর পুণ্যায় দারিভা এবং দরির পরিত্যক্ত সরমতীর 'ফিটের ভৈরব আমাদের কাজ ঘরের ঠিকানাটি ধরিয়ে দেয়।

আমাদের পৃথক ধরনের গল্প বৃত্তি বাক্য ফেরা। বৃত্তি একটি মূল প্রাণী— একটি গাক। গোহাটার একটা দরমক কাক হ্যাঁয়ে বড় থেকে ছোটক বোঝিয়ে পড়ে বৃত্তি কোনওকম তার বাড়ির রাজা ভাবে। এমন বিষয় নিয়ে গল্প বাংলা সাহিত্যে আর ঘাই বলে জানি না। নানা পথের নানান জনা তার সঙ্গে কতকরমের

ব্যবহার করেছে। কতজনা তাকে দয়া করেছে, কেউ তারা হিন্দু, কেউ তারা মুসলমান। কতকরমে কৃত্রিম মুখোমুখি এসে সে দেড়িয়েছে। শব্দগুলি বড় তাকে করুণা করেছে। 'সন্ধ্যা ইহারে দেয়ী নাই। বৃত্তি দুই হুইতে বাড়ি দেয়ী পাই।' গাবতলায় যে আনারসের জমি ছিল, বৃত্তি আনন্দে, উৎসাহে আনারসের খেতের বোকা ভাঙিয়া ছুটে ছুটে বাড়ির উঠানে গিয়ে শৌছিতে বোকা হইতে এক ভীষণ মিষ্টি ছুত্র মেয়েলি কষ্টের আনন্দ ও বিষয় ভরা চিংকার শোনা গেল— ওমা, ও ঠাকুরা, শিয়ারি এসো, দেখো কে এসেছে— শিয়ারি এসো। বৃত্তি এসে পড়তে তার নিজের জায়গায়— 'এই তাহার আললা পরিচিত গোহাল, এই সেই বিভিলির গাভা, সেইরকম মন সাজালের দোয়ায় গোহাল অন্ধকার— একটাও মশা নাই, বড় বাহুরটা একশালে সানি থাইতেছে। বৃত্তিরে রাসাঘরে সুকির মা রাখিতেছে, বৃত্তির উরুকাঁ শোনা যাউতেছে। কাল সকালে নদীরা ধারে তার শ্রিক পরিচিত মাঠটিতে সে ঘাস খাইতে যাউবে। আর একটা সাধী বন্ধু জুটিয়া মাওঘা বিচিরি নাই।'

একাধিকবার এই ফিরে আসার গল্প পড়তে পড়তে আমরা শৌছে যাই একটা অতিক্রান্ত রসের গল্পে। এ গল্পটির নাম 'শৈতক ভিটা'। রাসাঘরে কতকাল পর ফিরে এসেছে তার শৈতক ভিটা। মদুমতী নদীর ওপরে সেকালের কোঠাবাড়ি। পুকুর ছুটিতে রাসাঘরো এসেছে— একাই এসেছে শৈতক বড়িধর জায়গাভরি একটা বিলিবাহ্য কতবে। পশের ঠৈব মাছুজো একাকী অসমক রাসাঘরোহনের দেশোশানা করলেন। সন্ধ্যার বাহ্যায় অন্ধকারে রাসাঘরো ঘোড়া একটা মন-গোয়োর বহরসে সুন্দর হুইটুটে মেয়ে ঘরের দাওঘার আড়াল থেকে উঠি কতবে। এই মেয়েটিতে একা কতকিম মেয়ে রাসাঘরোহর আবিষ্ক করে। এলা নির্ভর বাড়িতে রাসাঘরোহনের বিন কাটে। সে ভাবে এই বাড়িতে তার শিতাও বাল্যকালে মেয়ে বেড়িয়েছিল। তার শিতামতী নববাহুর প্রথম এসে দুই-তিন-আতায় পা থেকে দেড়িয়েছিলে বাহুর উঠানে। আঙ্গ রাসাঘরোহরো বিন্দেব নিয়ে বড় বাড়ি বৈরো বস কতবে, দেশকে ছুড়িয়ে। পড়ার রাতে মুমের মেয়ে সেব পূর্ণপূর্ণগোনা বেনে অনুযোয় করেন— কেনে আমাদের চোখে হলে গেলো? কী করেছিলম এতবে? এই ই প্রেক্ষাপটে যে ছায়ামুটি কাল ঘরে, সেই বালিকার মন লক্ষী। এতাবধিরে গৃহপুত্র রাসাঘরোহর লক্ষী হলে— তুমি একা ভাঙা কনিত? কৌথিরে নিয়ে এস। এত বড় বাড়ি পড়ে আছে। আয়েদ করক। তোমার সবাই এস, বাড়িতে শাঁখ বাজক, সন্ধ্যার শিদি দেওয়া করে। চিঠি চিঠি বহর চল গেছে এই লক্ষী, যে আলো রাসাঘরোহনের শিদিয়া, তার বাগো বহরো কাল গিয়েছে। যা অনোর হলে পড়লে হুইত পাগল রাসাঘরন কুড়ত গর, তা বিভূতিভূষণের হাতে হল প্রামল্যী বা গুরুক্ষীর আল আয়গেনে গর। দেহতে দেহতে লক্ষী হয়ে ওঠে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশি যুগে লেখা কবিতা

ঠিক হাজারাতনের গল্প নয়, তবু পক্ষেও গল্প 'নিবন্ধের নিবে'। এ গল্পের পাত্ররা হাজার প্রকারে 'কালি এলি' বা 'স্রাস এলি'। কালের কাছে হাজার নয়। গল্পের বিনিম, কল্প, ভিত্তি যে নিম্নকোণে ও 'হাজার' অঙ্গ সমকালি তখন, তার কাছে নয়, কল্পের মাটিম মোটা মোটোই পছন্দ করেন না। তার কথা হচ্ছে ভুল? হুঁলে বানানি ছাড়া ছেলের কণ, সেখানে কী দেখের বাহ্যি হু? হুঁলে বানানি গল্পদান না কল্পে শুধু নয়।। গ্রাম্য জীবনের বারের হুঁ উর বাহুল্যনে এটাও পছন্দে বহিষ্ণ ও প্শ্চজিতি রবির অভিজ্ঞাত। এ ব্যক্তি জীবনে থেকে বিচ্ছিন্ন। আর শাশ্বতব্রত সরাটরি হুঁলে বারের হুঁ উর তার বাণী, হিউ হুঁলে সৌন্দর্য তার বাণী। সন্ধ্যাকালো বারেরনে পক্ষী কীভাবে মতে? শাশ্বত বানানি পছন্দে বহিষ্ণ খণ্ডত তার আশ্রয়। হুঁ উর পাখিটি মাসিন তার হৌজ হানে নয়। কী হুঁলে বারের কণ, আমদের পছন্দে বিচ্ছিন্নত্ব শাশ্বতব্রতের ব্রত আমদের অভিজ্ঞানে চিহ্নিত। তার উানে তারই কাছে বারের বাহ্যি মেরে। এ হৌ জে তার আশ্রয়কী। সব পছন্দে উচ্চৈশ্বর কপি আরেকটি গল্প। এরই নাম 'শাশ্বতব্রত'। হাজারে পক্ষ কাল বিনয়ান মতে কাছে মেরে যাই

বিত্তিকৃষ্ণ আর জীবনানন্দ যখন তাঁদের এইসব লেখাগুলি
লিখছিলেন, তখন তারা কেউই জানতেন না, এক দশকের মধ্যে
উদ্বৃত্ত হয়ে উঠবে বাঙালির প্রধান মর্মবেদনার কারণ। তারা
জানতেন না, অভিজ্ঞানসঙ্কট, ভাষাসঙ্কট, শিকড়সঙ্কটে তা
জীবনে নানা বিলুপ্ত দেখা দেবে। দেশে এবং কাছ কোথা
আছে সমীপবর্তী শিকড়, নুজো নানাভাষে তা যুঁজেছিলেন।

এটা বোঝা যায় উনিশ শতক থেকে যে মধ্যাধিত বাঙালি সমাজ নিজের জন্য যে ঘোরটোপ তৈরি করছিল তাকে আরও বেশদূরের সাহস ছিল না। সু দূরন্ত আশাকে সে মনে মনে কখনো করবে কিংবা তার বেশি কিছু নয়। স্বাভীক্ষ্যবাহী উসুকে দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু বাঙালির চিন্তা সৌন্দর্যে খুব বেশি মনোযোগ দেখনি। মধ্যাধিতের সঙ্ঘটী তীব্র বা তীব্র হয়েও তার গারামুখ ঘণাধর্ম পথে এগোল না। অসহযোগ, বিপ্লবী-চিন্তা তাকে উসাহ জোগালও অধিকাংশ বাঙালি সেই ঘোরটোপের বাইরে আসতে পারেনি। মহাদ্রাঘী ডিক্টেয়ারার ছবি তার ঘরে শোকা শেভা। কলোনীর শাসনে মধ্যাধিতের একটা শাসন আর অভাবত্ব হয়ে পড়েছিল। আবার সাম্রাজ্যবাদী বাঘ আর শেভার কৃত্রিম ন্যায়িকতার প্রলোভনে সাত কোটিজন সে থেকে, কয়েক কোটি বাঙালিকে মুক্ত করে রেখেছিল। আশা শতাব্দীতে হোক, এসে হলেও

বিভূতিভূষণের উপন্যাসে অনেক সময় লিপিিকা, কবিকা, গল্পিকার সমন্বয় দেখতে পাই। এদের উপকাহিনীও বলা যাবে না। এসবের

কথাগুলি কি বলপল বল বলা, না কোথাও একটা কাকগোলের অংশটি বেধা হাড়গোলের মুখে জেগে উঠতে থাকে। রাসবিহারীর বিশাল সাম্রাজ্য এখন বিকৃতভাষা নাট্যমূর্তিগায়াকে তুলে আনেন। তিনি প্রকৃতি বিশাল পরিচ্ছদে এ দু'জনকে অভিনয় করতে দেন। যে বৈশাখীরা প্রকৃতিতে মানুষের মধ্যেও তো তাই। নৈমিত্তিক কি কেবল পতঙ্গাচরণের মাথা, আসলে ভূনান্ডাজো এই টেনশন। আত্মনিক কবিতা 'শস্য'র টেনশন আনেন। বিকৃতভাষার হাড়গোলের কি শব্দ শস্য পর্যায়ের? জীবনানন্দের বিকৃতভাষার জীবনানন্দের ব্যাচরণ। জীবনানন্দের মধ্যে যথেষ্ট স্মৃতি, বহু বৈক্য নির্ধারিত, সহজ। বিকৃতভাষা সেরকম কোনও আত্মনিকতার কাককর্ম নেই কিন্তু তার এসেচলছে আছে। যাকে কোলবিজ এসেছিল বলেছেন। কবক সত্যচরণ সম্ভাব্য করেন হাড়গোলের। হাড়গোলের নাও এখন দড়। কুকুরাঙ্গি নাও শিখেছে। সে শোকা মনোহারা। গায়া জেলার ডিউলদাস বুড়ে হয়ে গেছে। এককালের দক্ষ শিল্পী। হাড়গোলের বোঁজ পেয়ে চলে যায় গায়া জেলার। বুড়ে পাশ ডিউলদাস বলেছেন। ডিউলদাস কী বলেন, "আমার হয়েছে সেই, হাইয়ের কেউ এসে শিকতে কী চলনি আমার এত কাল সে, এর মধ্যে। আজ তুমি প্রথম এলে। আচ্ছা, তোমায় শোকাব।" উপন্যাসে একটা আবহাওয়া ইঙ্গিত ঘনিয়ে এল। মেঘন মঞ্জীর ফেটে সত্যচরণ মন্তব্য করেছিলেন, কোনদিন হাতে আড়কাটার হাতে আসায়েব চা-বাগানে কুলি হয়ে চালান যাবে। ডিউলদাসের উত্তরে বুড়ে পারি, সে শিল্পের জগৎ থেকে বাউল। হাত যে হো নাহি এখনকাল দস্তার। পরিচরিত ইঙ্গিত। এর বেশি কিছু নয়। কিন্তু একটা ছেলে বুড়ে বুড়ে সত্যের-আঠের মূল্য বেঁচে যে পরশপাখারের জন্য গেছে তার সামান্য কি কোন মুহূর্ত নেই। কলকাতায় যাবার জন্য আত্ম হাড়গোলের অধির করে তুলেছিল। সত্যচরণ এভাবেও বুড়েছেন, বনোনা বন সুপল। সত্যচরণের এর কোন মত নেই। কিন্তু যথার্থের চিত্রণের কলকাতার কবিগোলের ভরতে মানুষটি জেগে থাকবে। সত্যচরণ লক্ষ করছিলেন, হাড়গোলের মা একটা নিজস্ব শিল্প-পাণ্ডা ওভল। ভূতীয়ের যখন দেখছেন তিনি তখন হাড়গোলা-গায়া ওভল। প্রায় একমাস অজুত হাড়গোলা নাচ দেখাতে এসেছে। লোকেরা দেখে আশ্বিনিত। সত্যচরণ হাড়গোলের মধ্যে বুড়ে সেলশন শিল্পীর দর্শন ও সন্ধান। এই বোধ প্রকৃতির মধ্যবর্তের অর্জন। রোমান্টিক মনোব সত্যচরণের দক্ষ। আবার একবার সত্যচরণ চোঁটা করলেন, জনি-জানো দিয়ে হাড়গোলাকে বসিয়ে দেবার। কিন্তু হাড়গোলা কখন কথা যায় না। সে নাচের প্রকৃতি, গঠন, নীচায়ের নাট্যমূর্তি কাককর্ম ইত্যাদি আলোচনায় বিভোরে। সে সত্যচরণের কথায় কানই ছিল না। কিছুদিন পর জানা গেল, হাড়গোলা রোগাটাইকটা পড়ে মারা গেছে। খুব সাদামাটা গর। কথকর গল্প বলার পরিচিত রূপ। নিয়তির মতোই ঘটলে বা ঘটিল।

এ ভাবনা নিশ্চয়ই পশ্চাদ্ধাতিয়ার। বিকৃতভাষা গল্পের প্রবাহও হোং বামিয়ে দিলেন। কিন্তু আমাদের কানে বোধ হয় এই কাতরেজি বাজতে থাকে 'একবার কলকাতায় কোন নিয়ে চলুন না?' ওখানে নাচের আদর আছে। কলকাতার জন্য কাকগোলের সুধার অধিম উচ্চারণের কথা আমাদের মনে পড়া অসম্ভব নয়।

৥ ৩ ৥

‘রোমান্টিকতার বিকটা বিচ্ছিন্নতার বিক, প্রাচুর্যের বিক, তাহা জীবনসমুদ্রের তরঙ্গশীলার বিক, তাহা অবিরাম গতিচাক্ষুরের উপর আলোকছায়ায় স্ব-সম্পাতে দিক; আর একটা কিস আছে যাহা বিস্তার, যাহা আকাশনিমিষার নির্নিমেঘতা, যাহা সুদূর দিগন্তবোধ্য অসীমতার নিস্তর্র অভ্যাস। আমাদের গান ভারতবর্ষের নক্ষত্রাচিট নিখিখিনীকে ও নবোদয়েষিত অক্ষরাগকে ভাষা দিতেছে; আমাদের গান ঘনকণির বিদ্যোমণি বিরহবন্দনা ও নবসমুদ্রের বনাস্ত্রপ্রসারিত গভীর উদ্ভাসনার বারাবিধি বহুতাল।’ বহেছিকের রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য সঙ্গীতের ভাবরূপ বিব্রলময়। প্রথম অংশটি পাশ্চাত্যভাষা লিখেছেন। দ্বিতীয় ভাবরূপে আমরা রোমান্টিক লেখক বলে চিহ্নিত করি বিশেষ ‘আরগাফ’ উপন্যাসের সাক্ষ্য। প্রকৃতি-প্রেক্ষিক তো তিনি বেটাই। কিন্তু ইউরোপীয় রোমান্টিকতার গতিচাক্ষুর ইত্যাদি বিকৃতভাষায় খুব বেশি আছে বলে মনে হয় না। সে বহু বহু বর্ষকালের উপন্যাসে লভা। বাংলা উপন্যাসে বিকৃতভাষা প্রকৃতির সাক্ষ্য করেই আর এক ধরনের বিশেষ বোধ, সৌন্দর্যবোধের সন্ধান করছেন। যা ‘নক্ষত্রাচিট নিখিখিনীকে’, নবোদয়েষিত অক্ষরাগকে’ ভাষা দিতেছে। বিদ্যোমণি বিরহবন্দনা অথবা বনাস্ত্রপ্রসারিত গভীর উদ্ভাসনার বাক্যবিশুদ্ধ বিকল অবিভক্তভাষা কবি উপন্যাসে বিকৃত করতে শেরেছেন। ‘বাক্যবিশুদ্ধ’ অবশ্য সঙ্গীতের কথা। কিন্তু উপন্যাসে বাক্যের জালে সে বিহ্বলতা, বিহ্বলতার সর্বসমুদ্র উঠে ওঠেন। সে বহুর সাক্ষ্য পাই ‘ছিন্নপ্রাঙ্গণীতে’। বিকৃতভাষার রোমান্টিকতা এক জাতি মিসিকতার (?) রহস্যে আবৃত হয়ে যায়। বিস্তার বিহ্বলতা সত্ত্বেও এই রহস্যে ভুল বোঝে বিচলিত। এখানে ‘আরগাফ’ প্রকৃতি এবং মানুষ রোমান্টিক বিভাজনভাষা। এখানে বিকৃতভাষা অবশ্যই রোমান্টিক এবং আত্মনিক। শীলজন্তু মজুমদারকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ‘আমাদের দেখা আমার ভারি ভালো লাগে। এর মধ্যে কোনোমতই মিলে মিথ্যা ছায়া নেই।’ বিকৃতভাষার হোঁচপাড় এবং আরগাফ সত্ত্বেও বোমকর কিম্বদন্তীনাচবেই প্রয়োগ করা যায়। তাঁর আরগাফকে ‘নচেলি’ ব্যাখ্যার নেই। একটা ছদ্ম আবরণ অবশ্যই আছে। যথার্থ সত্যচরণের শিফা, কবি, তাঁর কলকাতা এবং প্রাচুর্যের প্রতি শ্রীতি দিক মাকে উপন্যাসটিতে ঢুকে পড়েছে। পরবর্তী কথা। কিন্তু হাড়গোলা যা রাঙ্গা গাড়ের মতো তিনি নিম্পেষ দৃষ্টি নিয়েই দেখেছিলেন

নাচা বইহার লবণুদিয়া মহালিখী-রূপ, সরস্বতী কুণ্ড। এ তো বাংলা সাহিত্যে অভিব। কিন্তু আত্মনিকতা এবং অভিব্যক্ত আরগাফ উপন্যাসের অন্য দিক থেকে। শীলজন্তু মজুমদারকে রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ আমরা খুব করতেশ পাই: ‘আমাদের এই চিরশীলজন্তু, বৈশাখীল, স্বজনবৎসল, বাউলীদিয়া, প্রাচুর্য অশীল, শূন্যবীর্য এবং নিশ্চয় প্রাচুর্যবাসী শাখা ব্যাকলি কাহিনী কেউ ভালো করে বলে নি।’ ব্যাকলির পরিবর্তে নাচা-বইহার লবণুদিয়ার জন্মসাক্ষ্য কথ্যটি ব্যবহার করলে আমরা বিকৃতভাষায় যেতে পারি। এর অর্থে রবীন্দ্রনাথই এ কালে ক্রতী হয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র তার কিছু শিখায় গাই। কিন্তু বিকৃতভাষা সামগ্রিকভাবে যে সামাজিক ধরতে চেয়েছিলেন আরগাফ উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু কিন্তু সেখানে। খুব সামান্য মতো তিনি অসামান্যকে দেখেছেন কিন্তু সমাজের সুখদুখ বিরহজননপূর্ণ জীবন তাঁকে আশেপাশি করেছিল। তিনি জঙ্গলময়নের কথা বলেছিলেন। তারা এককালের। নৈরবক বিদ্রোহই ইতিহাস লিখতে তিনি সমর্থ বেশি নেননি। কিন্তু তার এ সময়ের জীবনকে তিনি তাকেই তুলেছেন। রোমান্টিক অতীতভাবিত্যন্য, রোমান্টিক গ্রীষ্মই হতে ‘বৈশাখী, চিরশীলজন্তু’ ইত্যাদি মানুষগুলির দিকে আগ্রহই এগিয়ে নিয়ে গেছে।

ডোমন (গোস্তা) থাকে জঙ্গলের থেকে বানিকটা মুরে। প্রাচুর্য শীতেরও স্পষ্টতরিত্য। খুশিগিরি মধ্যে আগুন আলানো সত্ত্বেও ডোমনের হৃদয়সের শিশুরক বাধ ছিলিয়ে নিয়ে গেল। পরদিন জঙ্গলে পাওগা গেল শিশুর তরঙ্গভূত মৃত্যুহাং। বাঘের সঙ্গে বাস করত বহু গোস্তা পরিবারের অলেকেরই এ গা-সওয়া ব্যাপার। বিকৃতভাষায় ‘বনে জঙ্গলে’ লেখেননি, মানুষকেই কাহিনী লিখতে গিয়ে তার পরিচয়কে স্পষ্ট করেন। এনি করে লেখ ভাষে নকহেদী ভকতের কথা। নকহেদীর দারিস বিকৃতভাষা প্রায় ঠুটিয়ে ঠুটিয়ে মরেন। দারুণ শীতে। নকহেদীরা কান্টী মুরল। প্রাচুর্য ফল কান্টী তাদের জীবিকা। আমাদের নিভুতানা সঁওতল মজুমদারের মতো। এদেরও প্রায় যাবার জীবন। জীবন মালিক এদের থেকে নেই। আগুন ছালিয়ে শীত-পূর্ণ নিয়ে শীতের রাত কান্টী। খবর বিহানাপল আসাবলপ্ত নেই। মেয়েতে শুকনো পান্থা বিছানো। বাসকোমেনের মধ্যে বড়ো একটা জামাবাট আর লোটা। কাপড় পরানো যা আছে। দারুণ শীতের জন্য শেখেরা নেই। বিকল্প অবশ্যই আছে— কলাইয়ের ডুবি। ডুবির মধ্যে ছুকে ছেলোপানো শুয়ে যাক মাথা বার করে। বড়ো ওঠে। নকহেদী এখনভাবে সত্যচরণকে তাদের জীবনগাফের কথা বলার মধ্যে কোন সন্দেহ না। দীর্ঘকালের শপ নেই। কিন্তু মানুষগুলির মূলে শেঁচে গাচ্ছেন। তিনি বিকৃতভাষা বলেন, এই প্রথম তিনি সত্যিভাবে ভারতবর্ষকে চিনেছেন। আরগাফের মতও যেমন করি

ভারতআহার সন্ধান। গায়েস্তা নকহেদীর আহ্বার কী? যাটো। অর্থাৎ মহাশয় নিচ। আর মটপাশ। সামনে এনিয়ে এল নকহেদীর দ্বিতীয় ক্রী। কলকাতার গন্ধ পেলে দূরপ্রান্তের মানুষ কৌতূহলী হয়ে উঠবে। জঙ্গলের নকহেদী প্রথম সঙ্গত প্রব্র। ‘কলকাতায় নাকি গাছ নাই?’ এইভাবেই জানেন বিকৃতভাষা জঙ্গলের নাকি। আগুননে তাইয়ে ওঠে কৌতূহলী হয়ে ওঠে। আর একটু বন হয়ে বসে প্রোত্তারা। বিকৃতভাষা নকহেদীর জীবনকে আর একটু মেলে ধরেন। নকহেদীরা কীভাবে বৈশাখী? নকহেদী বলে দেখে গিরত তাদের অলেকের। ‘বারউটালদলী’ নকহেদীরা একরকম ব্যাঘ্রহাই, ‘এখান থেকে ধরমপুর অঙ্গলে ধান কাটতে যাব— ধান তো এদেশে হয় না— ওখানে হয়। ধানকাটার কাজ শেষ হলে আবার যাব গান বুড়ে মুসের জেলায়। গমনের কাজ শেষ হতে জোঁতা মাস এসে পড়বে। তখন আমার থেকেও কাটা শুক হয়ে আশানন্দেই এখানে। তারপর কিছুদিন ছুটি। প্রাচুর্য-ভায়ে আবার মকাই ফসলের সময় আসবে। মকাই শেষ হলেই কলাই এবং ধরমপুর-পূর্ণিয়া অঙ্গলে কাটিকচালিয়ে। আমরা সারা বছর এইরকম দেশে দেশেই ঘুরে বেড়াই। যেখানে সেখানে যে ফসল, সেখানে যাব। নকহেদী কী?’ এ কি মুরুলার ‘বারোমাসী’ শুভিই আমরা? অথবা রবিসংস ক্রুসার নিচনুলিপি? যথার্থিতার কাছে এই কাহিনী পরসের ভরতে যে প্রম ও উপদানের ইতিহাস লেটেই আছে তা যে পরমরমণীয়, কোথো আমরা অসীকার করতে পারি না। এর পরের ফলকাল, বাবাসীদেবের আগমন, সেই সূত্রে সরাসর্য বাক্যের এক চলিতে হৈ চৈ। মজুমদার হাতে পড়ায়। মনিহরী জিহ্বা, কানের দান, পুতুল, গিয়াটে, ছিটের কাপড়, সাদা কিনেত পরত উৎসাহ তাদের। রামসীতা সেজে হুমুনানজী নিমুদ্রাফা কটি-হাত পাভা ঠাকুর এসে গেল। কবক বিকৃতভাষা এখানেই থেমে যায় না। কীদীয়ার আশ্রয়ের দিকেই ছুড়ে নেন তার নিশ্চয় মামনত। মহামনরা কীভাবে নীরী জঙ্গলবাসীদের ঠাকুর, ঘিরিওয়ালারা যা-তা বুঝিয়ে মেয়েদের কাজ থেকে সরে যান। চারচরণ আশ্রয় করে ঘিরিওয়ালারা চলে যায়। বিকৃতভাষা এদের পরসের ‘ইহার উপর রামজী, হুমুনানজীর প্রণামী ও পূজা তো আছেই। জমিদারদের পাইক-সোদারাদেও লুটে এনে এরের কাজ থেকে, যে যেমন পারে।’ একই মাত্রায় ঘিরিওয়াল, পাইক-সোদার, মামোয়ালী বাবাসী আর হুমুনানজীর পাণ্ডাটুকরকে সারিবদ্ধ করে বিকৃতভাষা ঠাকুর আর পুরোহিতকে সমান মর্যাদা দিয়েছেন। কী? রক্তকবীরী রাজার রক্ত, অশ্রাবক নরকটুরা এনিই সারিবদ্ধ হয়। বিকৃতভাষা এ চিত্রকতা নেই, শোকারের আত্মনিক মারাগ্রাণগুলির কথা বলেন না তিনি। কিন্তু আমরা খুব নিম্ন, কুকুর বাঘী বেদী সিং আর দালাবাজ রাসবিহারী জঙ্গল অভিযানে প্রায় এইরকম ভূমিকা নেন।

বাঙরিয়া হুজুরবাগি নামে দক্ষ। আর এক নারীথাকে বিভূতিভূষণ আশেরে নিয়ে আসেন— দমরব। হুইহর ব্রাহ্মণ। সত্যচরণের সিংহাশীরা তাকে ধরে এনেছে রাজনার জনা, দমরব উজার করে দিল তার সম্পত্তি। ছেড়েরা আনা পক্ষ্য। আর পোলা থেকে বেরোলে নাগের সাধ। হুইহর ব্রাহ্মণ দ্বিনের বশি কেনার পক্ষ্য। জোগাড় করতে পারেনি। মল্যপাড়াতে বশিহেই সে মুক্ত করলে পাগলোবোনে। এ ছোলানো বাসবা বিশ শতাব্দের শেষ প্রান্তেও চলে উঠি নিম্ন মহেশ। প্রায়শ্চর্য্য যার গাঙ্গোতা কাহিনী লেখেন। মহাশেখা দেবী আদিবাসী নিয়ে উপন্যাস রচনা করেন। আমাদের কি মনে হ'ল না, মাল্যপাড়াবী অত্যাচার উপেক্ষায় আমরা কেউই এ সমাজকে দিকে তাকাইনি। মেইন স্ট্রিম থেকে যখন এরা সরে যায় তখনও আমরা সচেতন হইনি। মাল্যপাড়া শেলজননম সে কাজে হাত দিয়েছিলেন। আর উনিবিশ শতকে দারকানায় বিনাভ্রমণ কৃতি কাহিনীতে সে বৃত্তান্ত বিস্তৃত করেছিলেন। কিন্তু কবেছিলেন উত্তরালে ভেসে উঠছিল এইসর সমস্যা। উঠে এসেছিলেন বিভূতিভূষণ, তারানাশ্বর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, ব্রজেন বসু। এঁদের মধ্যে অনেকেরই সারলভ্যকর্তী জগৎ থেকেও নেমে গিয়েছিলেন আরও সাব সময়ে। বাস্তব থাক বা না থাক ব্রজেন বিত্তীয় দ্বীপী মজী যে প্রায় স্বামীয় মেয়ের সমান তার সব-অস্থায়, ঘর-পেরাশবির লেখনীয়া এবং একান্ত বাস্তব জীবন বিত্তাভাব তুলে আনতেন কেন? কাকই, সারান, আটি, চীনা মটির পুতুল, এনালগের টিশ, লাল চিত্রে তার আছে মহামূল্যবান নীল-হলসে হিংলাজের পাখি। রক্ত বানানাপূরণের এইকথা মনেইথাকি। অজোজন মধ্যবিত্ত জীবনকে কৃত্তর করে সংযত। এই বিভূতিভূষণী কালজা এবং অনুপেক্ষা দিগেও মনোযোগী হবে এই জীবনের অকপট প্রকাশকে। নকছেদীকে বিভূতিভূষণ আরও একটু বেয়ে ধরতে চান। অসম মজী তার মন কেটে নিয়েছে। বাগানেসে ব্রজেন তরুণী ভাগ্যের কথা তাকান দেননি। ইয়ামতী উপন্যাসে তরুণী ভাগ্যের মন নিয়ে ভেবেছেন। ভালোবাসাবাসির মধ্যে যে প্রেমের দীর্ঘা, মনে অভিমানে থাকে তাকে বিভূতিভূষণ উপন্যাসে ভালোবাসে ঘুটিয়েছেন।

মজী তার সেব্যবস্ত্রে সত্যচরণকে গুপ্ত করল। তারপর সে তার এক কণ্ঠ অভিজ্ঞতার কাহিনী শোনাল। পূর্ণিবার যোগে মজী সূর্যকণ্ঠ মন করতে যাক্ষিল। বাগা শেল পাগল থাকে। গাঙ্গোতা জাভের কোনো অধিকার নেই সূর্যকণ্ঠে চান করার। মজী বিদ্রোহ করেছিল। কিন্তু সে কতখান। মেয়ে তারা গাড়িয়ে দিল মজীর। মজীর এই অভিজ্ঞতার কাহিনীর মধ্যে নিহিত থাকে ধর্মীয় স্বর্গীয়তার ক্রন্দ। কিছুদিন আগেও সংবাদপত্রে রাজাঝা নামে এক সাংবাদিক এই জাতীয় জাতপাতের স্বর্গীয়তা থেকে দাবার সংবাদ প্রকাশ করেছিলেন। নাত্য বইহার ফুলকিতা ললুটিয়া

থেকে চলে যেতে থাকে জঙ্গলের শাসন-গ্নেহ। শহর দুখ পড়ে। বিদ্রোহ ঘণিয়ে আসেন— এ তাইহেই আমাদের মুখ। কলকাতা সত্যচরণের মনে হয়েছিল 'সে যেন বনালজী। পরিপূর্ণ্যোবনা, প্রাণময়ী, তেজস্বিনী অথচ মুখা, অনভিজ্ঞা, বালিকাধনভাবা।' বিদ্রোহ নেই, অথাকথিত সহানুভূতি কিংবা অনুপেক্ষাও নেই। বিভূতিভূষণ সমাজ বাস্তবতাকেই বিক্ষিপ্তভাবে কিছু ঘটনা, কিছু ঘটনা, কিছু ভেজত, কিছু সহনশীলতা দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন। পরিবেশদ্বারা যে জলি বলির সরে সরেই শুরু হয়েছিল। আর এই দৃশ্যের সঙ্গে মানুষের স্বার্থবুদ্ধি যুক্ত হল। দৃশ্যিত মানুষের কল্যাণ বাড়তে লাগল। কিন্তু তারানাশ্বরের ভূতবলের (নারীনি কসার কাহিনী) মানুষের প্রতি বিভূতিভূষণ যেমন দেখতে পান অরণের মন্থা তেমনি মধ্যবিত্তসমূহও এদের অজ্ঞতার প্রতি তীব্র-অসন্তোষ। নকছেদী আধুনিক চিকিৎসার প্রতি সন্নিহান (সোটাই স্বাভাবিক) সে চার আনা পক্ষ্য নিয়ে টিকা নিয়ে আসা-কম্বো তড়িয়ে দেয়। কিছুদিন বাবে তারাই ঘরে মজীর ছেলে বসন্ত রোগে মারা যায়। মজীর ইতিহাস তারপর সম্বন্ধিত। ঘোঁষতে রোগের ভয়ে মজীরের বাসমহল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। সেই রাঙেই মজী নকছেদ। হাত তাকে প্রলোভিত করে নিয়ে থেকে কোন আড়কাঠি। পথের পাঁচালীর দুর্গার মৃত্যুর পর দুর্গার লব্ধ যন্ত্রে রক্তিত বাস্তব সূলে অনেক রহস্য আবিষ্কৃত হল। মজীও সব কিছু ফেলে গেছে। তারও শেষের বাস্তব খোলা হল— মিলেছিল, ছোট আনান, নুঁজি মালা, একদানা সূর্যকণ্ঠের খেলো ক্রমা। কিন্তু নেই হিংলাজের মালাগাছটা। নকছেদীর মেয়ে সূর্যচিতা এদিন মন দিয়ে কীভাবে পাণি কবির কবিতা দেখায়। মজী কি এই মনেই পড়ল আর আমাদের চা-বাগানে গলান হয়ে গেল? বাঘ যেমন মায়ের কোল থেকে বাজা ছিনিয়ে নিয়ে যায়, হাতি যেমন গুঁড়িয়ে বয়ে মানুষকে ভেমনই এই সমাজে ঘুরে বেড়ায় আড়কাঠি ব্যাধা চা-বাগানে প্রমিত চালান করে এগান থেকে। বিভূতিভূষণ ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন নকছেদীর উপর, নিজের কর্তব্য প্রতিও ছিল এক ধরনের অপরাধবোধ। অরণের কাজে তিনি ফসা চেয়েছেন। কিন্তু মজী— হিংলাজের মালা গলয় মজীর ক্ষমা চাওয়ার কোনও দেরতা নেই। দেবতা-পরিভ্রাতা এই মজী আধুনিক মানুষের চিত্রে নিশ্চয়ই জায়গা করে দেন।

মেমোই আমাদের আভ্যন্তরীণ করে গঠন করেছে। অথচ এর কথা বলেছি। সৌভাগ্য বিদ্রোহের বীর দেবক মারা গেলে ভানুমতী বানিকীরা অসহায় হয়ে পড়ে। দেবক সেই অক্ষরের মুকুটিনী রাখা। এমন গরক হয়ে। দেবকস মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মহাজান তার গর-ময়ি বেঁচে রেখেছে। মহাজান টাকা না পেয়ে গর-ময়ি বেঁচে নে। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটা প্রেম— আধুনিক মানুষের প্রেম। কাল নূন রাজার অস্তিত্ব। ভানুমতী যেন এই

প্রসঙ্গ : বিভূতিভূষণের আরণ্যক

পরিবৃত্তিতে একা হয়ে যায়। শোক তাকে তখনও অধিকার করে রেখেছে। দেবকস সমাহিতে ভানুমতী সত্যচরণ মূল ছড়িয়ে দিল। এরপর কব্জ সত্যচরণের মন্তব্য 'হিক সেই সময় ডানা ঝটপট করিয়া একদল সিলি ডাকিতে ডাকিতে উড়িয়া গেল চাঁদমাটির মগজাল হইতে— যেন ভানুমতী ও রাজা দেবকর সমস্ত অবশেষত অত্যাচারিত প্রাচীন পূর্বপুরুষগণ আমার কাণে তুলিয়াস করিয়া সমুদ্রে ডাকিতে উড়িলেন— সাধু! সাধু! কারণ আর্জাজিত বংশধরের এই বোধ হয় প্রথম সন্ধান অনার্য্য রাজ-সমাহির উদ্দেশ্যে।' এই নিবেদনে কেউ কেউ বানানো ম্যাপার লক্ষ করতে পারেন। কিন্তু সেভাবে দেখলেও বিদ্রোহের প্রতি প্রাঙ্গা এবং আশ্রয়ী শক্তির প্রতি বিজ্ঞার একালের মনোভাবকেই সম্মান দেয়। সৌভাগ্য বিদ্রোহ সাব-অলটার আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। বিভূতিভূষণের তার ইঙ্গিত।

বিভূতিভূষণের উপন্যাসে যেসব নারীরা এসেছে তাদের বৈচিত্র্যে লক্ষণীয়। বাইজী কাকা স্বামীর মৃত্যুর পর যে দারিদ্র্য অনুভব করেন মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করে চলছিল কলকাতা দৃশ্যে লেখক তা উদ্ভাষন করেছেন। দেবী সিংহের প্রচুর ঘনসংপত্তিও বিদ্যাপের মধ্যে থেকে নির্গত। কুস্তারাজির অক্ষকপের দাঁড়িয়ে থাকে ভাতের আশা। কুল কুড়োতে বেগম লাক্ষিত্তি এবং ইজারাদারের হাতে। নিম্নর থাকে দিনের পর দিন। কিন্তু নারীই বিঘর্জন দেয় না। সমাজের কাছ থেকে কোনও সহানুভূতিই সে পায় না। আর বিভূতিভূষণ একটি পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে ফেঁকেপ করেন সমস্ত স্ত্রীলোক। গিরিগাির কুঠি হয়েছে বলে তাকে কেউ রাঁধে না। চরম দুর্দশা, যার মৃত্যুর মনোমুখি গিরিগাির। কুস্তারাজী হয়ে গেল গিরিগািরের সেবায়। সেই এগিয়ে ধল। সব মিলিয়ে বেনে এ সময়েই মহাপ্রাণের একটা বোঝা ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন। সতীত্ববাদের টোঁজি হারিত না, বিভূতিভূষণ এটা সমাজের চিত্রারির আঁকতে চেয়েছেন। সমাজকে ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে অসুস্থচিত্ত জন্মানোর বিলম্বিতার। আর 'মহাে জীবনাবসানের কিছু কুটিল রীতিনীতি। সম্পূর্ণ একটি বিলম্বিত সমাজের চিত্র উপস্থিত করছেন বিভূতিভূষণ। যে ভূমি তাদের ন্যাসে চলে এল তারা শতাব্দী কাল পর্যন্ত নূন করে কিটো বাজ্ঞানের সঙ্গে গেল কব্জ বন্ধিতমস্ত্র কথিত জীবিত্য ও অমায়ার দাপট। মায়ে মায়ে বন্ধিতমস্ত্রের ভাষায় কই মাছ ক্ষুদ্র মাছকে ঘেঁষে ফেলবে।

11 8 11

বিভূতিভূষণের অরণ্যপ্রীতি কি বাহ্যত করে দিয়েছে অরণ্য? এ প্রশ্ন কেউ কেউ তুলেছেন। অরণ্যের রহস্য কি জ্ঞান্য কখনও কখনও লুক্ণ? এ অরণ্যের আদিবাসীরা অরণ্যের এই বাতবরণে

থেকে কী উত্তর দেন? তাদের কাছে অরণ্যকে ভালোবাসা আর ভয় পাওয়া— দুই-ই মিলে গিয়ে গেছে। এ সম্বন্ধে সত্যচরণের প্রশ্ন বোধ করি তাদের নেই। চীনা বাসের দানা, বাটো, অথবা উপাস— একে মজী করে এ জীবন প্রবাহিত। হিংসে প্রাণীর থাবা যখন এদের উপর এসে পড়ে তখনও একরকমের নিমিত্তির মতোই তারা মেনে দেন। সত্যচরণের মনে হয়েছে, 'দুটি ভুট্টার ছায়া আর চীনাগাছের এককণ্ঠা দনার জন্য প্রকৃতির অমন বসন্তক' ধ্বংস করা উচিত নয়। অরণ্যের মানুষগুলি মাল্যপাড়া বৈদ্যক বোধে না, তারা জানে শত্রুর মতো খেটে জীবনধারণ করতে।

বিভূতিভূষণ অরণ্যপ্রেমিক যুগলপ্রসাদকে নিয়ে এসেছেন এই উপন্যাসে। যুগলপ্রসাদ এই অরণ্যে নূন জাগ লাগায়, মূল খোঁটার আর অরণ্যের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়। বিভূতিভূষণ বলেছেন, যদি সত্যকার কোনো অরণ্যপ্রেমিক থাকত তবে কালিফোর্নিয়ার যেসেমাই ন্যানালন পার্ক, দক্ষিণ আফ্রিকার কুপার ন্যানালন পার্ক, বেলজিয়ামের পার্ক ন্যানালন মন্ট্রাল-এর মতো এ অরণ্যকে সেই মর্যাদা দিত। উপন্যাসে এ অন্তর্য্য না থাকলেও ক্ষতি ছিল না। কেননা, আমরা জানি কলোনিয়ালিজমের কাঠামোয় এ একেবারেই অবাঞ্ছিত। বিভূতিভূষণ সে সমসার অবতারণা করেননি। তারানশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় সে মিলিয়ে আছেন। বং বারহীন এবং সত্যাবগুণ্ডা মানুষগুলির চিত্রে মহিষের দেবতার প্রতি বিশ্বাস, হলদামজী দিনপারীর রক্তচোখের আভাষ বাসে বেঁধে থাকা। বননে চাপ অক্ষর আর এদের মুখ-বলির করে রেখেছে। সত্যচরণ রাজমন্ত্রের উদ্যম হয়ে যাওয়া আর ইজারাদারের পুতুরে মৃত্যুতে জঙ্গল ছেড়ে কলকাতায় চলে আসবে ঠিক করছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে জঙ্গল ছাড়তে পারেনি।

যুগলপ্রসাদ কি আধুনিক ইকোসিস্টেমের প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছিল? বিভূতিভূষণ কি কুস্তারাজী, ভানুমতী, সূর্যচিতা, রাজালবাস্ত্র স্ত্রী, গিরিগাির, রাজ শপে, দেবক, দেবকর জীবনকেই কামা মনে করেছিলেন? একেবারেই না। রত্নিন্দ্রনাথ জাশানের পথে প্রত্যেকটি বংশের কুস্তারাজী বংশে ফুটুটিতে বাগিনাদানের দানবলীলা সংবলন করে 'মানব হতে হবে'— এই আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ করেছিলেন। শরিকজনহীন সেসব বদর গড়ে উঠেছে তার মূলে রয়েছে লোভ। রত্নিন্দ্রনাথ বলেছেন 'মানুষের লোভা উত্তর হয়ে এই বিশ্বব্যাপী মৃত্যুজীবাঘ নিজেই পণ বেয়ে কর্তন খেলা চালাবে' এ লোভা ভাঙতে হবে। যে-খোলা মানুষ লড়া করার লোভে নিজেকে লোকসান করে চেপেছে, সে কখনোই জ্বলবে না। আরাকানের যুগলপ্রসাদকেও বোধ করি এই। আধুনিক মানুষের ভাবনাও কি তাই হয়?

ছোটগল্পের বিভূতিভূষণ

সনাতন মিত্র

সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক অত্যন্ত অবিভক্ত ছোটগল্প। মানুষের সমাজ-নীল প্রকৃতি তাকে নিয়ে অসাধারণ করতে পারে। কী থেকে কী হল, কী করে কী হল পাঠক করে বুঝাবার আগেই তার চোখের সামনে নিজের মহিমায় সে ভাসে হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। অবশ্য কবিতাও তো মায়িক, সাহিত্যের সবচেয়ে বড় মায়িক। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন ছদ্মের যাদুকর, কবি-মাত্রেরই শব্দের যাদুকর। কিন্তু তার অনেক চাছিল থাকে, কল্পনা, ভাষা, ছন্দ, আরও কত কী। ছোটগল্পের কী চাছিল, যা না হলে ছোটগল্প হয় না? ঈশ্বর জানেন। স্বীকৃত্যন্য একটি গল্পের নাম দিয়েছিলেন 'না-মুখের গল্প'। তার শেষের দিকে আছে—

মাছের বাহরই তারিখে সম্পাদক-বন্ধু এ-ও বললেন—
'একি ব্যাপার! ঠাট্টা নাকি। এই কি তোমার গল্পের অভিজ্ঞতা!'

আমি হেসে বললাম, 'ছোলের বাজারে চলবে না কী।'
'একবারেই না। এটা তো অত্যন্ত হালকা জিনিস।'

হালকা জিনিস আদৌ নয়, যে গল্পের ভিতরকার কথাটি সীমিতও প্রকৃত, যদিও তার খানটি তিক্ত-কমায় কৌতুকের এবং চলটা একটি হালকাই বটে। ঠিক এই মেজাজ এবং এই চলটি ছোটগল্পে এমন সৃষ্টি শেষে পারে, যাতে মনে হয় যেন এর জন্য ওই সাহিত্য-রূপটিরই প্রয়োজন ছিল। তারপর একটি ভেবে দেখলেই আরও বোঝা যায়, সমাজের শিক্ষা-নীতি, সভ্যতা-সংস্কৃতি পরিপাকতার একটি অভিন্ন উন্নত স্তরে না পৌঁছানো পর্যন্ত, এবং লেখকের নিজের মধ্যে সমাজের সেই পরিণতি পরিপূর্ণতা ফলবান না হওয়া পর্যন্ত এই ধরনের লেখার উদ্ভব হতে পারে না। বিভূতিভূষণের বেশ কয়েকটি গল্প শড়তে শড়তে সেই একই কথা মনে হয়।

মনে হয়, লেখার এমন অনুরাগ স্বাচ্ছন্দ্য, পাঠকের সবেদনশীলতায় ও পরিশীলিত রসবোধের ওপর লেখকের এমন সহজ, নিঃসংঘর্ষ নির্ভরতা, এখানে উপনীত হতে গেলে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আসতে হয়, অনেক কিছু গ্রহণ করতে করতে, অনেক কিছু ত্যাগ করতে করতে। এবং অনেক পরিশ্রমাদায়ক করতে। তখন আর, নাটকীয়তা তো দূরের কথা, তখন বিশেষ কোনও তারার, এবং জোরালো কোনও 'মেসেজ' তো দূরের কথা, বুঝে স্পষ্ট কোনও বক্তব্যের দরকার পড়ে না। হয়তো

কোনও একটা বোধ মনের মধ্যে আকার নিল, কোনও একটা সামান্যের কিংবা বৈশিষ্ট্যের, একটি অভাবের কিংবা প্রান্তির অভাব মাত্র জাগ্রত মনে, বাস, হলে কোনও। লেখকও সেখানে ছিলেন, পাঠকও দেখে নিলেন, বাস, ওটুকুই হেস্টে, আর দরকার নেই। যা অবাক, অনির্বচনীয়, অনুভূতি, সেইটাই হয়ত গল্পটির আসল বক্তব্য। বলা-না-বলার চিন্তাশোভনের এই যে বুনাটো, এই তো কথা-শিল্পের পরকথা। বলা-না-বলার এই রহস্য বারো বার উচ্চারণ করবার চেষ্টা করেছেন রবীন্দ্রনাথ: 'মূলগুলি যেন কথা/ শাওগুলি যেন চারিটিকে তার সৃষ্টিতে নীরতরা।'

এইখানে শৌছে আবার একটি থামতে হয়, 'অব্যক্ত' বলতে বোঝায়, বলার কথা ছিল, কিন্তু বলা হয় না, কিংবা বলা গেল না, কিংবা বলা যায় না। কিন্তু এমনও হতে পারে, বলার কিছু আর নেই, 'বি কেস্ট ইজ সাইলেন্ট'। এবং বলার কথা যে আর কিছু নেই, একটি ছোট গল্পের সেটাই মূল বলার কথা হতে পারে। যেহেতু একটি রচনা বিভূতিভূষণের 'ডুমন বেটুমী'। রবীন্দ্রনাথের 'না-মুখের গল্প' নামটি পরিহাস-ক্রিয় লোকের সম্পদকূলের নিয়ে একটি কৌতুক মাত্র, আসলে তাকে বাস্তব করতে পারত এমন কতোর বিরাক সম্পদকূলের মধ্যেও দৃষ্ট। 'ডুমন বেটুমী' কিন্তু সম্পাদকের হাতে না-মুখের হার মতই গল্প, বিশেষত যদি নতুন লেখকের প্রথম রচনা হিসাবে তাঁর সামনে স্থাপিত হয়। হালকা না ভারী, সে কথা ছেড়ে বিন, এর মধ্যে গল্পই বা কোথায়? 'যোগে যোগে টুটে ফুল ভর্তি সন্ধান-অপরাধে গ্রাসে নিশ্চিন্দার মাঠ ও বনের মধ্যবর্তী সুসাঁপের ঘরে' দাঁড়িয়ে একজনের মনে মন্দল, 'ওই পথে ডুমন বেটুমী যেতে।' তখন সে ছোট ছিল, আজ বয়স্ক। এখন সংসারের চাপ, নানা সমস্যা, অব্যবস্থা। 'কিন্তু যেমন ওখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, হুল করে দাঁড়িয়ে মনকে শান্ত সংযত করবার চেষ্টা করছি, অর্মনি কর কব্জের পার থেকে ডুমন বেটুমীর গাছ সুখী মুখখানী ঘিরে ঘিরে ঘিরে মনো মুটে ওঠে। অথচ ভুবনি আমার কেউ ছিল না, আমাদের পাড়ার মানুষই ছিল না সে। খুব বেশি যে তার সংস্পর্শে এসেছি বালো, তাও না। তার চোখে আমার কোনও বিশেষি যাদের সঙ্গে, তাদেরই অনেকই আজ বিপত্তির অন্ধকারে বিলীন। কতবার ভেবেছি অবাক হয়ে— কেন এমন হয়?'

"কিন্তু বুঝতে পারি নি।"

শুধু যে লেখক বুঝতে পারেননি তাই নয়, তিনি বলেছেন, 'এ কথাই জবাব নেই।'

আমি পাঠকও তাঁর সঙ্গে 'আশ্চর্য' হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি বন্যোপ-যেরা জনশূন্য পথে, ফুটন্ত ঘৌমুলের কাছে।" আমারও যেন মনে পড়ে, 'সে এ-পথে যেতে, এই বিকেলেরো এই বন্যোপ যেরা সখ ছায়া-মিথ পথটি বেয়ে রাতিতে বন ও গায়েবেতো গায়েহ পাশ কাটিয়ে। স্বপ্না শুকনো বাঁশপাতার রাশ পা দিয়ে মচমচ করে মাজতে মাজতে, ওই মাদার গাছের দেয়াল পড়া হলেই হলেই মাদার ফুলের কুঁড়ি সুস্নায় আশ্রয় করত করত, এ পথ দিয়ে নদীর ঘাটে পা ধুতে যেত ক্রিশ-বরিশ বরষা আগে।"

বিভূতিভূষণের এই এক আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল যে, তিনি মানুষ আর তার সমাজ আর তার প্রাকৃতিক পরিবেশ আর এই সমস্তকে জড়িয়ে নিয়ে কালের যে নিরন্তর যাত্রা এবং যে অবিচ্ছেদ্য সম্মেলনে এই সব কিছু পরস্পরের সঙ্গে একীভূত করে তার মগ্ন উপলব্ধি। কোনও ব্যাঘাৎ এবং বিশ্লেষণ ছাড়াই, এমনকি সোজাসুজি কোনও বক্তব্য প্রকাশ না করেই, কোনও মন্তব্য বাতিরেকেই শুধুমাত্র কাহিনীর আকারে একেবারে বাস্তব অভিজ্ঞতার রূপান্তরিত করতে পারতেন। এই ঘৌমুলের খাড়, ওই মাদার গাছের হলেই হলেই পড়ত, ওই ঘরে-পড়া বাঁশপাতার রাশ, এমনকি সেই পাতার রাশ পা দিয়ে মাড়িয়ে যাওয়ার শব্দ, বিভূতিভূষণের দেখায় এ-সবেরই মধ্যে নিহিত, এই সবেই রূপান্তর জীবন ও জগৎ বলতে আমরা যা বুঝি তার প্রকৃত ব্যবহৃত। সত্যিই তো, এই যে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ, আর তার সৃষ্টি, আর তার বসনা, তার বাসের, আমাদের এই রূপ-রস-রস-স্পর্শের জগৎ, আর তার শব্দমুখে আমাদের এই, কারো তো-চালা, কারো চার-চালা খর আর চরীমুখের এই যে সুস্নায়, তার বাইরে আর বা-কিন্তু সেই তো আমাদের মন-ভাড়া, যাকে বলে mental construct মহাকাব্যের যাত্রাই বনুন আর প্রাণের রহস্যই বনুন, আরও সব বড় বড় ওই ঘরনের ব্যাপার, যার কথাই মনে কর, এসবই জগৎ জগৎ জগৎ জগৎ হয়ে আসে একমাত্র আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা আর আমাদের পারিপার্শ্বিকের মধ্য দিয়ে। অতীন্দ্রিয় জগৎও বিভূতিভূষণের গল্পে এমন, যে মনে হয় বেশি পড়ে নয়, সামনের ওই বীকটা ঘুরে গেলেই তার সাক্ষাৎ শাব। "অমন শীতলত, বরাকর নদীর জল কম হয়েছে অনেক, জলের ধারে জলজ লিপিগাছ শুকিয়ে হলদে হয়ে এসেছে, আগে যখনে জল ছিল, সেখানে বালির ওপর অরুণা জোয়ারমারাতে ঢুকত করে, বরাকর নদীর দু'শাখের শালকণ পাড়া অরিয়ে দিচ্ছে।" সেইখানে, সেই বালির চরের, শুকনো হলদে লিপিগাছের পাশে জগতে অপর্যব চাঁদের আলোয় অবগীর্ণ হলেন ময়ুমুখী ঘোঁষা—

উদায়, ভানু প্রতীকশা বিদ্যুৎপূর্ণনিভা সতী
নীলাশ্বরশরিণায়া মদবিহুল প্লোনা—
(তারানন্দ তান্ত্রিকের দ্বিতীয় গল্প)

আমাদের এই অত্যন্ত সাধারণ দৈনন্দিন জগতের জমির ওপর বিভূতিভূষণ তাঁর কাহিনী, তা সে যতই নিম্ন না অপারিহ কল্পনা আর অতীন্দ্রিয় রহস্যের কাহিনী হোক, ফুটিয়ে তুলতে ভালবাসতেন, তাঁর ভূতের গল্পের ঘটনাগুলি কখনও কলকাতার মশলাপোস্তা, কখনও বিদিশপুরের কাটিয়াসার খার, কখনও চীনাপটীর গতি আর মনে পড়ে সেই মহাগাণ্ডিক কাহিনী 'দেবানা'। তার আরও অনেক— "কুহুল-বিনোদপুরের বিখ্যাত বস্ত্র-বাসসরী রায়চাহেব ভরসারাম কুণ্ডুর একমাত্র কন্যার আদর্শ বিবাহ।" তাঁর কল্পনায়, কিংবা তাঁর উপলব্ধিতে বিশ্বজগতের গভীরতম রহস্য বাস্যা বৈশেষে আমাদের নিত্যদিনের যাওয়া-আসার পথের ধারে ওই যে তিৎপল্লবটি লড়িয়ে উঠেছে, তার মধ্যে। "কচি কচি লতা দুলছে, ওই দূরে পল্লবী প্রকাশপতি উড়ে বেড়াচ্ছে, সৌন্দর্য ফুলের মাড়ে মাড়ে, আবার নীল বনকলমীর ফুলে ভর্তি একটা লতা উঠেছে ঘাঁড়াগাছের মাথায়, অকালে একটা শিমুলের শাখা রাতা রাতা ফুলে উঠেছে, টুকটুকে মাকালমল ফুলছে, লেজঝোলা হলেই পারী বাবে আছে, যে ফুল কোঁড়ে নেয় না ও কেউ আশ্রয় নাহা না— ডেমন ফুল ফুটে আছে তাঁর বনভলতে, তাই দিয়ে রচিত হয়েছে তাঁর শত্রুঘ্না।" (বিশ-শিল্পী)

গল্প ভূত-হেলেই হোক, ডাকিনী-যোগিনীরই হোক, আর ঠাকুর-দেবতারই হোক, আমাদের এই সঙ্গীত বস্তুতাত্ত্বিক জীবনের বাইরে বিভূতিভূষণ যখনই আমাদেরকে নিয়ে যান, তখনই, একটি বিখ্যাত ইয়েজি কবিতায় যেমন আছে, জেকবের স্বর্ণের সিঁড়ি, 'দেহতে পাই, যোগারি ক্রসই স্থাপিত।'

ব্রহ্মকলম ঘোটে মানসসংকোচের, পারিতোষি ক্রমে স্বর্ণের নন্দনকলম। এর একটি সভা, একটি কল্পনা। কিন্তু আমাদের স্পর্শে, আমাদের আশ্রয়ে, আমাদের দৃষ্টিতে সভা না এর কোনটিই। আমাদের যেমতুম প্রভাতের আলো পড়ে না এর কোনটির ওপর। যেমন আমরা রক্তমাংসের মানুষ, রোগে শুষ্ক, নিঃশেষে ভিজি, মূলাপোষে পথ হাটি, গাছতলায় বসে দু-দু-কিরিয়ে বঠি, তাহাই মধ্যে আবার কুঁচি কখনও চেয়ার আচ্ছাদিত থেকে অচেনার, সীমার শেখন থেকে অসীমের অভাস শেষে ঘরকে নড়াই, তেমনি আমাদের গাছ-লতা-পাতা, আমাদের ফল-ফুল, কত যেন আমাদের, কোথাও একটি জমি পেল, একটি জল পেল, বেড়ে উঠল, লড়িয়ে উঠল, ফুটে উঠল, আবার কুঁচি-কখনও কর্ণভাঙতার কোনও অবসরে বহন করে আনল কোন অনির্বচনীয় শেখানে। সে বীকটা চরের, শুকনো হলদে লিপিগাছের পাশে জগতে অপর্যব চাঁদের আলোয় অবগীর্ণ হলেন ময়ুমুখী ঘোঁষা—

বড় সুন্দর বলেছেন দার্শনিক-কবি এয়ার্সন, “খুব বৃহৎ, খুব সুন্দর, খুব রোমাণ্টিক কিছুতে আমার দরকার নেই।”

“I ask not for the great, the remote, the romantic.... I embrace the common; I sit at the feet of the familiar and the low... Man is surprised to find that things near are not less beautiful and wondrous than things remote.... The perception of the worth of the vulgar is fruitful in discoveries... The foolish man wonders at the unusual, but the wise man at the usual.”

(Quoted in Criticism and Fiction by William Dean Howells.)

সময়ের অত্যন্ত অল্প পরিসরের মধ্যে, বাইরে থেকে দেখলে অতিশয় অকিঞ্চিৎকর, এমন একটি ঘটনা, যাকে ঘটনা বলা যায় কিনা তাও সন্দেহ, এই নিয়ে গড়ে উঠতে পারে একটি ছোটগল্প। ‘কিছু নয়’-এর মধ্যে অতিশয় বৃহৎ, অতিশয় বহৎ একটা কিছুই উপলব্ধি যে বিশ্বায়, বিকৃতিভূষণের কোনও কোনও গল্পের সেইটাই মর্মসত্তা। বারে বারে এই কথাটা তাঁর গল্পে ফিরে এসেছে। মনে হয়েছে তাঁর গল্প যেন “তুচ্ছ” গল্পের সেই “তেরো চৌদ্দ বছরের” নানিকট বসে আছে, একলাটি বসে আছে, কেউ ওর নিকে মনোযোগ দিচ্ছে না, কেউ কথা বলছে না ওর সঙ্গে। অথচ কত বিশ্বায়, কত রহস্য তার ওটুকু মনের মধ্যে। সন তার বিয়ে হয়েছে, স্বপ্নবোধিত থেকে বাড়ি এসেছে, সবই আশ্চর্য, সবই নতুন তার কাছে। “ও যে আমদের ঘরে ঢুকে ঘরের ওপর নতুন এসেছে, এই অনমনে ও জগতের!” তার ওপর গল্পটা বিনীত বহুদৈর্ঘ্য, তিনি আবার তার চুলে একটু গন্ধ লেগে মাথিয়ে দিলেন।

বললাম, কিরকম গল্প?

— চমৎকার, কাকাবাবু।

— কি তেজ বদলি ক’রে?

— কি জানি?

তারপর? “চলে গেল খুঁকী। কাকটুকু আর তেল দিলাম ওর মাথায়।” কি আনন্দ আমার স্নান করতে নেমে নীলজোড়। আমার নীল আকাশে কিসের যেন সুস্পষ্ট, সৌন্দর্য্যবয়বী। অল্পের ও বাইরের প্রোথায় প্রোথায় ছিল। চমৎকার বিনীতা। সুন্দর বিনীতা।

কিছুই নয়। রুম্ম ফুল, তাতে একফোটা সুগন্ধী তেল, বাস, আকাশ-ভুবন ভরে গেল সৌন্দর্য্যে, আনন্দে। “অন্তরের ও বাইরের প্রোথায় প্রোথায় ছিল।” মামবাবু চিত্ত তখন আর নিজের সর্বাঙ্গ স্বপ্ন স্বার্থ নিয়ে, নিজের বিষয়-সম্পত্তি আর

মামলা-মোকদ্দমা নিয়ে, আতুল-হারার যন্ত্রণা নিয়ে আতুল যেমন আলোয় হয়ে থাকে, তেমনভাবে দাঁড়িয়ে নেই নিজের যা বাঁচিয়ে এই বিশ্ব-সংসারের মাফকান্দে। তখন আসে সে বোঝান্ন নয় এই উদার বিশ্বের, প্রোথায় প্রোথায় মিলে গেছে।

নীলজোড়ের গানে আছে, “আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া, বুকের মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সাজা।” এ আর কাউকে বন্ধ দিতে হয় না, মানুষ মারেই কোনও না কোনও ভাবে, কিন্তু না কিছু একটা অবলম্বন করে, নিজের বাইরে এসে একটু দোলা হওয়ায় নিঃশ্বাস নিচ্ছে চায়, নইলে তার মহাপ্রাণ ধীরেই ওঠে। বিশ্বলোকের সাজা, যার কাছে যতটুকু শৌঁছবার, সেইভাবেই নেই। তবে একটা কিছু অবলম্বন চাই, একটা সূত্র চাই। সে অবলম্বন, সে সূত্র, আমাদেরই মায়াম-মতায় জড়ানো, সংশ্লিষ্ট বিশ্বায় ও রহস্যে ভরাপূর্ণ আমাদের এই ক্ষুদ্র সংসার আর, যার শক্ষমত্ব তার আশ্রয়, সেই সীমাহীন বিশ্বরাজ্যেও আকর্ষী। এখানে ক্ষুদ্র ও বৃহত্তে কোনও আভাওড়াই নেই। নারকোণ বলা হয়েছে যে বিংশবার লগাটি বেড়ে উঠছে, বনমহীর যে মুগি গালাটি জটো গলালার অভূত খেতের শালের জমিতে ঘাস বাসে, তারা কেউই বিজিমা নয় নীলজোড়ের গানের বিশ্বলোক থেকে। ওই ক্ষুদ্র লতা, ওই গ্রাম্য গাছটিই “আপন হতে বাহির” করে আনতে পারে মানুষকে। তবে, কোথাও না কোথাও একটা নাকির টান চাই। হৈমন্তিক পার্থক্যের টান নয়, সত্যিকারের নাকির টান। “ব্রহ্মমহীর কালীবাস” বিকৃতিভূষণের আলোকসামান্য প্রতিভার একটা সর্বোচ্চ নির্দেশ। বিকৃতিভূষণ বলতে আমরা যা বুঝি, তার সীমিত-নির্দেশ নির্দেশ।

এই অস্বাভাবিক গল্প। এই একটা গল্পে তিনি তাঁর উপলব্ধির একেবারে মর্মমূলো পাঠককে শোঁতে চান, পাঠকের মনে হয়, যে বোধ এবং যে কল্পনার শক্তি, সূচন-কল্পনায় যে পরাকাষ্ঠা “শব্দের শাঁড়ালী”-কে বলা যায়, সব প্রস্তরের, সব সংসারের উর্ধ্ব স্থাপিত করেছে (Others abide our questions, though art lure)। এক গ্রাম্য রমণীর সফিক্ত কালীবাসই এই কাহিনীতে তার প্রায় সমস্তটাই বর্তমান। বোধ—মহাশয় নামক জীব যা নিয়ে বঁচে, তার, আর কর্মকাণ্ডিত্ব, যা আমাদের দ্বারা-চৌর্য্যায় মাথায় এসে দিয়ে অনস্বীকার্য বাস্তবে পরিশ্রণ করে মানুষের সহস্র বন্ধন এবং সেই বন্ধনের মধ্যে কিয়টই নিজের ক্ষুদ্রতা, নিজের সংকীর্ণতাকে ছাড়িয়ে গিয়ে অসীমের মধ্যে মুক্তিকে। “ব্রহ্মমহীর কালীবাস”-এ নীলজোড় দেখলে কোন, “আমি বলি, সংসারের মায়ায় আর না। গানে বলে—কোকা তার শর, কে কার আনন?” আর সব্রতাকুল্য ভাবেন, “মুগী কোন কী? কি বলে, কি করে! মুগী এমন পাশাণ যে, ছোট ছেলের গিঁদেতে বাড়ি পেল না। মুগী দেখতে আছে ওর? কি?” “সারাজি” ঘরের ঘোরে দেখলেন, তাঁর গোশীনাংশেরের ডিটেতে জালাঘরের ছাঁড়লার মতো মুখ হললল তোঁচো তাঁর মুগি দাঁড়িয়ে রয়েছে—“নইকী তাকে যড় করলে না, বুড়ী হয়েছে মুগি, হয়েছে মুখ ও ছুর

দিতে পারে না—মুগিকে তিনি তার মাঘের শেট থেকে টেনে বার করে একজন নিজের ঘরের মত পুথিখেলিলেন—তিনি নেই, কে ওকে দেখে?”

নাকির টান চাই, না হলে সব শুধু কথার কথা।

—নিরীক্স সমাধি না হওয়া পর্যন্ত আমাদের মনে শান্তি পাচ্ছিলে, পাচোও না। দেখ কি-জন্মে দিদি? যুগুবাবু জন্ম নয়, শুধু নিজের কাক করে যাওয়ার জন্যে। দিদি কিনে নাও, শুধু দিদি কিনে নাও—

ব্রহ্ম ঠাকুরের শিডি ছিল গেল। কিংগে যা দিদি মাগী, যদি তোর শরসা থাকে। রাতিরে একটু ঘুমুতে সে অসত।

যে ধর্মকর্ম, যে ধর্মের আধ্যাত্মিক কথাবার্তার নমন নীলজোড় প্রথমটিকে দেখালেন, তার প্রথমটীর কেউ নয়। ধর্মকর্ম বলতে তিনি যা জানেন, তা তাঁর নিজের গ্রামে নিজের সংসারে, নিজের পরিবেশের সঙ্গে আঠেপুঠে জড়ানো। তাঁর মায়াম-মতায়, তাঁর মেহ-বাংসলা, তাঁর ঠুঁটামার্গ, তাঁর সার্কীর্ণতা, তাঁর কুসংস্কার, কিছু থেকেই তাঁকে ছাড়িয়ে আনবার জো নেই। তাঁর নিজের মতোই ভাললম্বন মেশান তাঁর ধর্ম। তাতেই তাঁর বন্ধন, তাতেই তাঁর মুক্তি। মুক্তি মানে, “আপন হতে বাহির হয়ে” এসে একটু অন্যাক্ষর করে বোটা।

গ্রাম্যাজীবন, বিশেষ করে গ্রামের সবচেয়ে গরীব, অসহায় এবং অল্প মানুষদের জীবনে, ধর্মকর্মের কথা যখনই তাঁর গল্পে এসেছে তখনই বিকৃতিভূষণ কোবানো গ্রামের মাটির কাছাকাছি তাকে নামিয়ে এনেছেন, সে ধর্মের চাহিলা খুবই সামান্য, গ্রামের গরীব মানুষ, যে যতটুকু দিতে পারে, সে যতটুকু দিতে চায়, দিয়ে মুখ পাশ, তাই যেতে। “এরা সবাই আশাপ্রসাদের গরীব, গোপ, কাপালী ভ্রাতৃপিত্রী প্রাণীর নরনারী। সবাই মিলে বেশ আমোদ করছে দেখে আমার খুব ভাল লাগলো। রাতে ওরাই রীতহে, বিড় বড় আঙঠি কাপাল পাটা পেতে আঁশে চালেদে তার আর লাল ডিটার চুড়টি সোনা হেন মুখ করে বেশ। যে যখন আসে, বেশি গিরিবালাকে সাতায়ে পরম ভক্তিভরে প্রণাম করে হু’হুতে পারের ধুলো নিয়ে মাথায় মুখে দেয়।” (গিরিবালা)

রাতকুশ পরামহই বয়সারাটা দিক বুঝেছিলেন। একই জিনিস মা এক একমনের জন্য এক এক রকম করে বেঁচে যেন, শেটে যা সা, যার মুখে যা রোতে। কেউ অজুত না থাকে, তা হলেই না। বিদে সবলেই আছে, যে বিদে শুধু আঙঠি করার পাতে আউল কাপের ডাতে যেতে না, “নৌ বড়ি রেড আয়েলেন।” তবে সবই মিলে একসঙ্গে বদল ভাল করে খাওয়ারও আনন্দ আছে, সেই আনন্দকে বাদ দিলে জগতে মাতৃকোষ পাওয়া যাবে কী করে? তবু, আরও কিছু চাই:

যাই, মা এসময় দু’একটা ভালো কথা আমাদের শোনান—

— কি কথা?

— ভালো কথা। তেনার-ভানমানের কথা। আমাদের ওসব কথা কে বলতে বলুন। চামাভোজ সামান্যি উদ্বাস ক্ষেত-মায়ার নিয়েই থাকি। মাঘের ছিরিমুখ ছাড়া আর পাচি কোথায় বদুন—কে মাঘের শোনাচ্ছে। (গিরিবালা)

এ ধর্ম, মনে হয় যেন পৃথিবীর মাটি থেকে আপনি গড়িয়েছে, যে মাটি বড় সোজা জিনিস নয়, যাতে শব শবত বহর ধরে মিছেছে পুরুমানুষের মাতৃবিশ্বের সুখ-দুঃখ, আশা-আতঙ্ক, ভিত্তা-ভাবনার ধারা, কত ধর্মোপাধান, কত নীতিকথার অনুশাসন। ‘গিরিবালা’ বড় সহজ গল্প নয়, যদিও, বিকৃতিভূষণের প্রোথায় যেমন হয়ে থাকে, তার ভাল থেকে সেটা বৃহৎতার উপায় নেই। সে এমন লেখা যে পড়বার সময় মনে হয় না, কষ্ট করে মাথা ঘামিয়ে কাউকে কিছতে হয়েছে। অথচ একটু ঘুটিয়ে দেখলে বোঝা যায়, এ গল্পের প্রত্যেকটি শব্দকল্প মাসা, প্রত্যেকটি ভক্তি যেন যা কিছু অনুভূত, সেই হিসাব করা। গল্প যিনি শোনাচ্ছেন তিনি নিজে, তাঁর স্ত্রী, গ্রামের যতকিছু চক্চকি, গিরিবালা পূর্ব ইতিহাস, আর তাদের সকলকে নিয়ে সেই গ্রাম, সব নিয়ে গল্প যখন যামারকালনার নিজের বনের প্রান্তে এক ঘুরি-নামা বটগাছের তলায় গিরিবালায় আশ্রমের ভিন-চারনামা ছড়ের ঘরে এসে শৌঁলে, সেখানে সন্ধ্যামালতীর ফুল ফুটেছে, বনে-জঙ্গলে পাখির দল কিসিগিটিত করছে, তখন বুঝতে আর বাধা রইল না, গিরিবালায় ধর্ম আসলে কী, এবং কাদের জন্য। গিরিবালা নিজে, এবং তার ধর্মবিশ্বাস, এবং যে গ্রামের মাটিতে তার আধ্যাত্মিকতার জন্ম, সবই তখন একেবারে প্রত্যক্ষ সত্য আমাদের সম্মুখে।

দেহাধারের দৈনন্দিন সুখ-দুঃখ যেমন অধীকার করা যায় না, অধীকার করা দুঃসর কথা, সে যেমন শিল্পীর কল্পনা আমাদের সামগ্রী, তেমনই আবার, শিল্পীর কাছে এটাও একটা অসুখক প্রেরণার উৎস, যে মানুষ তাকে অতিক্রম করে যেতে উদ্বুধ হয়। সে তার যেন জন্মের প্রান্তে দাঁড়িয়ে অচেনার নিভৃত ভেতরে চায়, বিশ্বিত হতে চায়, রোম্যান্টিক হতে চায়, অনুভব করতে চায়, সে নিজে ছোট হলে কী হবে, এই কিসে হতে ন্য। “কোথাও আমার ছিরিয়ে যাবার নেই মানা।” এই বিশ্বায়, এই রোমান্সের জন্য বেশি দুঃখ যাবার দরকার পড়ে না পাশা-পাঠে ভিত্তিয়ে। বাহাদুরশর স্টেশনে নেমে যান কানিকুর এসেই সিঁদুরকায় বলে, “কোথায় ছোলাম আর কত আদাম! উঃ! এ শিরিগিরী কী সিঁদুরকায়!” এই হ্যাঁগা, আর কন্দুর আছে ছিরিগিরী (সিঁদুরকায়)।

সীমেষুড়ো নেই, না এই পৃথিবীর, না তার মানুষের, দেখুন না, যে সিঁদুরকায় অসীমের আহ্বানে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে, সেই আবার নতুন কোনো রঙিন গামছাখানী কঁপে কোমোকে বাড়ি ফেরার জন্য অস্থির হয়ে ওঠে। কাভুকে দেখতে হতে তো! যে

স্রবসী তাঁর লেখণ্যের একটি লেখু কেউ লুকিয়ে পাড়তে গেলে তেপেবেগনে ছলে ওঠেন, ভিনই আবার দুম্বিহীন বৃদ্ধা মুন্সি গাইয়ের টান গ্রামে ফিরে এলেন, “মাখার থাকুন বাবা বিখনাং।” বারবণিতার দুখে অন্ধ বিসর্জন করবার লোকের এখন অবশ্য অভাব নেই, কিন্তু ‘হিসের কুচুরি’র যে কুসুম অসুখ বালকটিকে দেখার জন্য উদ্বিগ্নিতে তার জানালার বাইরে এসে কুঠিতভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, সে কোনও সামাজিক প্রতিভার প্রতিভা নয়, একবারের রক্তমাংসের মায়ামমতার মানুশ।

কিন্তু একটা রহস্য বিশ্বব্যাপারের মর্মেই বিবৃত। মানুষের মধ্যে তাকেই প্রত্যক্ষ করেছেন বিজ্ঞিত্বশন, প্রত্যক্ষ করেছেন বলেই তাকে মৃত করে তুলতে পেরেছেন আমাদের কাছে। মানুষের যুগ-যুগান্তের বিশ্বাসের মধ্যে, তার অসংখ্য কিংবদন্তীতে সেই রহস্যের বোধ টুকরো-টুকরো হয়ে ছড়িয়ে আছে। একটি আশ্চর্য গল্প ‘হুটি দেবতা’। অতি সাধারণ লোকী মানুষ রাখব চরুভাটী, অতি সাধারণ দরিদ্র যুবক নন্দলাল এবং তাঁর সুবর্তী স্ত্রী। এদের জীবনে সেই রহস্যের আবির্ভাব হল, যা তাদের অতি পরিচিত সামান্য বস্তু সেই গ্রাম্যবস্তুর তত্ত্বাশয়ের বিশেষ স্টুটি অবলম্বন করে, “এই বিশাল মন্দির প্রতিদিন সকাল হয়, সূর্য মাঝ-আকাশে দুপুরে আশ্রয় ছড়ায়, বেলা ঢলিয়া বৈকাল নামিয়া আসে, গোপালিতে পশ্চিমকিন কত কি রঙে রঞ্জিত হয়। চাঁদ ওঠে—সারা মঠ, জা, তেলওয়ে বীথ ও পাশের বড় কলশটা জ্যোৎস্নায় প্রাণিত হইয়া যায়, কিন্তু কখনও কোনো কালে রাখব চরুভাটী বা তাহার প্রতিবেশীরা এই সুন্দর শরীরাশ্রয়ের প্রকৃতি দীপার মধ্যে কোনো বেগতার পুষা আবির্ভাব করুন করেন নাই—সেখানে আজ সর্বপ্রথম এই নিরক্ষর বিকৃত-মস্তিষ্কা গ্রাম্যবস্তু বৈদিক যুগের মন্ত্রস্ত্রী বিদ্যুর মত বনেপ্রাণে স্টুটি দেবতার সন্ধান করিল।” বিশ্বাস অধিকারের প্রাণ এখানে সম্পূর্ণ অব্যাহত।

কোনও ভাব নয়, এ গল্পে যা প্রত্যক্ষ হল, সামান্য গ্রাম্যবস্তুর যথাসম্পর্ক, একটি গদ্যনার ব্যঙ্গ চুরি করে রাখব চরুভাটীর যে শাস্তি, তা ওই চন্দ্রালোকিত প্রান্তর, ওই স্নেহের বীথ, ওই নদীর চরার মতোই, অভিজ্ঞতার বস্তু।

আরেকটি অবিম্বরণীয় গল্প, এক ভাব্যকার রহস্যের গল্প, ‘তিব্বালের বালা’। এবারে আর চন্দ্রালোকিত নির্জন প্রান্তর নয়, একটি বসন্ত ষ্টুটিনের আলোয় দেখা গেল, স্বী প্রাচ্যত অমঙ্গলের শক্তি বার হয়ে এল, এক স্মৃকরোম্বন্ধ প্রাণোচ্ছ্বল হাস্যকৌতুকময়ী তরুণীর মনের কোন অতল গহ্বর থেকে। একবার বেরিয়ে এল, রক্তজল করল ধরণীকে, আবার সেই অতল গহরে গিয়ে আত্মগোপন করল। এই গল্পের ভাষা, এর বর্ণনা, সবই যেন ‘শক্তিচরম্বন্ধ’ আলোয় কলম করছে, তার মধ্যে ছাঁচ ওই অন্ধকারের শক্তির আবির্ভাব আমাদের নিশ্চিত সৈন্যনিয় জীবনের ভিত্তিমূল নাজি দিয়ে যায়।

বিজ্ঞিত্বশনের লেখায় বীরা শুধু সরল গ্রাম্য জীবনের আর সহজ সৈন্যনিয় সূচ-পুথির কথাই দেখতে পান, তাঁরা ভুলে যান ‘শবের শাশালী’-র ইন্দ্রির ঠাকুরের মৃত্যুর কথা, ভুলে যান ‘দুর্গিন্দীপে’ বিকৃতমস্তিষ্ক শিতাকে দরহাড়া, গ্রাম্যভাড়া করবার অভিজ্ঞানে পুরুর যোগদানের কথা। অমঙ্গল অতি ভয়ঙ্কর বিজ্ঞিত্বশনের লেখায়, কেন না তা হাজার হাজার তির্যক রূপে, যেন মনে হয়, বিশ্বব্যাপারের মূল থেকে তার উদ্ভব, অস্তিত্বের মূলেই তার বাস। মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় ন্যায়ালয়ে সে বাইরে।

বিজ্ঞিত্বশন বন্দোশাধায় জানতেন, জীবনের বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানুষের, এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে, তার আবার রহস্যকে, তার অন্তর্নিহিত বিশ্বাসকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বস্তুতে পরিণত করতে হয়।

গল্প

মা বললেন, মরণ! বিম্বি মণীর যেন আর তার সইছে না।
বিয়ে বিয়ে বিয়ে—

মায়ের ভাষা এরকমই। দাঁতে দাঁতে চেপে কথাটা বলতে বলতে, কামেরে আঁচল জড়িয়ে ষ্টুটি পর্নাজ শাড়ি তুলে, মা চললেন নন্দয়া পরিত্যক্ত করতে খাঁটা হাতে।

ভেবেছিলাম সুখি আমাকেই বলছে। তা নয়। নন্দার কলকলানি শুনে বুঝলাম যে, মা তাকেই খোঁজা দিয়েছেন। তবু মনে কথাটা আমার গায়েও বিধল। আমারও যে তার সইছে না, বিয়ে করতে চাই। বিয়ে বিয়ে বিয়ে—

চিরদিনের অভ্যাস আমার সকালে যান করা। গরমও পড়েছে খুব। শাড়ি-শায়া, তেল-সালাব নিয়ে এগোলাম বাথরুমের দিকে। গরমের দিনে সাবান মেখে বাথরুমের মেখেতে শুয়ে-বসে থাকতে বেশ লাগে। বাথরুমে একটি বাথটব থাকলে বেশ হয়। আমাদেব নেই। একটা ছোট আদনা আছে। বসে বসে সেই আদনায় দেখলাম বিজ্ঞেরে। খুশি কী কনকাল হয়েছে শরীরাট? বিম্বি বুড়ি নাকি, নিজেই বয়স গেছে পেরিয়ে!

আমার বয়স এখন ছুটিল। বিয়ে করার শকে বয়সটা বেশি নাগেতা কি। তা কারব বই, ঠিক বয়সে বিয়ে যনি কাশেনি। আমার ভাষাতে। কাল।। আদনারটার পারা খসে গেছে, যাচ্ছেতাই, কপালটাই যা হোক কিছুটা দেখা যায়। আমার আবার কপাল!

বয়স তখনও পুরো মেল হয়নি। নেতুদেহের রাঘবাবির ছোট ছেলে জ্যোতিগ্রামার সাথে বিয়ে হয়েছিল। জমিদারি করেই উঠে গেছে। তবু লোকের বলত জমিদারবাড়ি। বিশাল বাড়ি, কোন খিরি-দ্বীপ নেই, প্রাণ নেই, ক্রতি নেই। সর্বত্র, তাদের যে অনেক টাকা, যেন তারই যোগ্যতা। তখন না আমার মত দেবার বয়স হয়েছিল, না একটা স্তন্যদে চেষ্টাও আমার মত। মদনাতারা সবলেই একেবারে বলেছিল, এ হল দৈব যোগাযোগ, নইলে এমন পাতল জোটে। কত সুন্দরী মেয়েই তো পথ-ঘাটে গুরুই।

এখনও লোকে আমাকে বলে সুন্দরী। ছেলে-ফোকরা বাজারে-দোকানে, অফিস-পাক্ষায় ফিরে ফিরে দেখে, ব্যবসার চিন্তাটা কাটে। মেল বছরে নিশ্চয়ই আরও সুন্দরী হিলাম। লালবা চিটা, চামড়া আরও মোলাস্ফায় হিম, দেহের গড়ন ছিল আরও নিশ্চুত।

দেওয়াল অশোকেশু সেনগুপ্ত

রূপে কি সবাই ভোলে, অস্ত্র সেই লোকটা তো ভোলেনি।
ফুপশার রাতে বয়েছিল, যুঃ, সুন্দরী!— বুড়া ভাম, ছেলে-বৌ-র মুখ দেখে, গায়ে-মাখায় হাত বুলিয়ে সাম মেটতে চায়।

আরও কত কী যে বলেছিল। আমার প্রাণে বেশি বেজেছিল—
যুঃ, সুন্দরী! ক্ষোভে, দুঃখে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলাম।
লোকটার যেমন চেহারা, তেমন ভাষা আর ক্রতি। নিজের বাবা সম্পর্কে অশ্রীল মন্তব্য করেই থাকেনি, বতকরা ঘরে ছিল ততক্ষণই সে অসভ্য অশ্রুজল আর মাঝেমাঝেই কুসংসিত চিৎকার করছিল। দরজা খুলে খাড়া মেরে লোকটাকে ঘরে থেকে বার করে নিয়েছিলাম। সে এক দুষ্ট।

অন্যদিকের রায় জানতেন, তাঁর ছেলে লম্পট, দুশ্চরিত।
বড়ভায়ের বৌ-এর সাথে জ্যোতিগ্রামার সম্পর্কও নাকি তাঁর জাননা ছিল না। ভেবেছিলেন, সুন্দরী বৌ পেয়ে ছেলে সুখ-স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে। রেহ বোধ্যয় এরকমই অন্ধ, অবিবেক হয়। অবৈধ সম্পর্কের টানও সে বোঝে না।

অন্যদিকের লোকের অসম্মি করলে পরিনি কোনদিন। তার-চোখের জল ভোলাতে পারেনি আমার নীরবে। অতীত।
অষ্টমঙ্গল্য বাড়ি ফিরেছিলাম একা। বহুবার ভিনি ষ্টো করেছিলাম ফিরিয়ে নিতে। যাইনি কখনও।

ভুলে তো নাম ছিলই। বাবা ফের ভুলে পাঠালেন। আমিও তাই চেয়েছিলাম। অনেকের আশপিত ছিল। আমার মায়েরও। বাবা গ্রাছ করেনি। ভাগিস!

তবে, বাবা বিয়ে দেবারও খুব চেষ্টা করেছিলেন। আমাকে জানিয়ে, আমাকে না-জানিয়ে। কখনও কেঁদেছি, কখনও চিৎকার করে হাত-পা ঝুঁতেছি। বাড়ি ছেড়ে আত্মীয় বা বন্ধুর বাড়ি চলে গেছি। সে একটা বয়স ছিল যখন চোখের জল সঞ্চার বীথ ভাঙত। আমি কীদাম, আর আমাকে দেখে বাবা কীদেত। মা বলতেন, আদিত্যোতা। গোঁয়ারুটি না করলে কবেই বিয়ে হয়ে যেত। তখন তো পুরুষ জাউটকেই থুণা। তারা কামুক, তারা লোভী, তারা কুসংসিত, তারা অত্যাচারী। আমার জীবনে কুদাল না এসে কতকাল যে ধারণাটা হয়ে বেড়াতে হতো কে জানে।

কুদালকে আমি বিয়ে করতে চাই। আর সে কথাটা জানতেই

তো এবার এই হঠাৎ বাড়ি আসা! কাকে জানাই কথাটা প্রথমে। কে সবচেয়ে দুষ্ট হবে এই সবচেয়ে?

নন্দার ডাকচাকিত্তি ঘোর কাঁদে। সত্যি অনেকক্ষণ বায়ব্রম আটকে রেখেছি। একটাই হে।

॥ ২ ॥

নন্দা যে বিয়ের জন্য ব্যস্ত হয়েছে মায়ের একথা মনে হবার কারণ কী? মায়ের অনুমান, নাকি নন্দা নিজে বলছে? নন্দারও বিয়ের বয়স হয়েছে। তু, বস, কেউ নিজের মুখে বলতে পারবে—বিয়ে করতে চাই। কেমন মেয়ে, লজ্জা করে না? কেমন করে শুক করতে হয়?

জলখাবারের থালা নিয়ে এলেন মা। মায়ের মুখে এখন প্রসন্ন হাসি। মা জানেন যে, আমার প্রিয় জলখাবার লুচি-বেগুনভাজা। তাই এনেছেন। মায়ের কাছেরি কি প্রথম মুখ খোলা যায়?

আমার মায়ের থান-বারগা সবই সেকলে। বর যার মরেনি, সে তো বিধবা নয়। সে বিধবা নয়, সে সখ্যা। এই হলো মায়ের সুক্টি, সরল বিশ্বাস। ডিভোর্স কথাটা মায়ের অজানা নয়, কিন্তু তা মায়ের বেসে গ্রহণযোগ্যও নয়, হাত অপবিত্র, তাই অগ্রহাণ। কিন্তুমি তো, গোড়াই একবারে, সংস্কারবশেই শাখা-সিঁদুর পরভাম। মা'ও জোর করতেন। নিজেও যখন যেমন সিরিষ খোঁজতেন, তখনই আমার শাখা-সিঁদুতেও খোঁজতেন। বাবা যে বসে আমার বিয়ের চেষ্টা করছিলেন তাতে মায়ের ছিল ঘোর আশঙ্কি।

—বিয়ে কি ছেলেখেলা? ঈশ্বরের বিধান বদলে দেবে এতই তোমাদের শক্তি! অসিদ্ধাঙ্গী দেখে যে বিয়ে হলো সে বিয়ে একটা কাগজে নাকচ হয়ে যাবে, এতই সহজ! এ সমস্তই অনাচার—

না। মাকে বলার সাহস আমার নেই। অনর্থক তর্ক, অশান্তি। তাগলে বরাকে বলি? বাবা কি চমকে উঠবেন—আনন্দে, বিস্ময়ে! নাক ধরে টান দেননি বা-হাত আর ডান-হাত দিয়ে এলোমেলো করে দেবেন আমার চুল। নাকি—

বাবা আর মেয়ের মধ্যে পারস্পরিক টানটান একটু বেশি হয়। মেয়ে দ্বি প্রথম সন্তান হয় তো টান আরও একটু বাড়ে। আমাদের পারস্পরিক টানটান ছিল তারও চেয়ে বেশি। মধুর, বহুস্বপ্নসূচী।

মা বলতেন, লাই দিয়ে মেয়ের মাথা খাচ্ছে। মেয়েটার সর্বনাশ করছে তুমি।

বাবা বলতেন, সর্বনাশ যা হবার হয়েছে অসময়ে বিয়ে দিয়ে। এর জন্য দীর্ঘ তোমারা বাবা। তুমিই এনেছিলেন সন্তান। যেমন তাঁর ভূঁড়ি, তেমন মুড়ি—দুই-ই মোটা।

—খরদার, মা লায় দিয়ে উঠতেন, আমার বাবা সম্পর্কে;

তুমি কোন কথা বলবে না, সাবধান করে দিচ্ছি। নিজের দোষ তো কেউ দেখতে পায় না, যাঁকে অন্যের দোষ। বাবা কি তোমাকে চাপ দিয়ে বা মিথ্যা বলে রাজি করিয়েছিল, তোমার উচিত ছিল না আরও যৌক্তিকবর নোবর? বড়লোকের বাড়ি, মেয়ে তোমার রাজস্বী হবে—এ দোষ কি তোমার ছিল না?

এ তো সব সত্যি কথা। বাবা যাদ নেড়ে মেনে নিতেন। যৌক্তিকবর তো নেওয়া উচিত ছিল। মেয়ে রাজস্বী হবে, সে আনন্দে হেসে দেখছিলেন। —লোভে পড়ে শাপ করেছি, সে শাপের প্রাপ্তিস্তি করব।

অন্যিগ্রসার বলতেন, শাপ করেছি আমি একা, আর কেউ নয়। একটা মূলের মতো মেয়ের জীবন কলঙ্কিত করার শাপ। প্রায়শ্চিত্ত করতে দিন আমাকে।

আমার পড়াশোনার স্বর, হাতখরচা, ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার বন্দোবস্ত—তিনি সব দায়িত্ব চেয়েছিলেন। বাবাকে বলছিলেন, মেয়ের জন্য ভাল শাড়ি বুজুন, আমার বিয়ে দিন। আমি নিজে এসে দাঁড়ান, সব ব্যয় আমার।

বাবা অন্যিগ্রসারকে কোন সুযোগ দেননি। বাবা বলতেন, ঈর্ষ মতো লোকের প্রায়শ্চিত্ত করারও অধিকার নেই, থাকতে পারে না। যা করার করব আমি, একমাত্র আমি। যা আমার সাধো সুফল।

আমারও তাই ছিল মত। মৃত্যুষ্টি কি ক্ষমার যোগ্য!

বাবা আমার জন্য কী না করেছেন। বড় সংসার, অভাব ছিল না, কিন্তু তেমন পাখন্দাও ছিল না। তার মধ্যেই আমার সহ-অধ্যায় মেটাতে বাবা কোনও কার্পণ্য করতেন না। সাক্ষ্যগোক্তর জন্য আমার বোনোরা যাক কিছু পেত না। আমি যখন যা চেয়েছি, শেয়েছি। প্রয়োজনের অতিরিক্ত। আমাকে হাতখরচের টকাও দিতেন বাবা। পেরের দুই বোন এজন্য আমাকে বড় হিসেসে টকাত। আমি তাদের সব দিইতাম, তবুও তারা তো স্বস্তি না।

বোনদের হয়ে লড়াই করতেন মা। এ তোমার একছোমামি, এর ফল ভাল হবে না।

বাবা কখনও নরম গলায় বোঝাতেন না—মেয়েটার মুখের দিকে তাকালে যে বুক বেঁটো যায়। আমাদের সাথে ওর ভুলনা কোর না। মেয়ের তো আমার কোন দোষ ছিল না। ছেলোটো যদি জ্ঞানোয়ার না হত—

হলেনদের অমন একটু-আর্থু দোষ থাকে। তায় বড়লোকের ছেলে। জোর করে পাঠিয়ে দিলে দেখতে সব ঠিক হয়ে যেত। পুরুষকে ভোলাতে পারেন না যে সে কেমন মেয়েছেলে। বুঝে তার নাস্তি।

এরপর আর বাবা নরম গলায় কথা বলতে পারতেন না।

লাফাতে শুক করতেন। আমার কানে গেলে আমিও। মাকে তবু থামানো যেত না।

—আমি কি ভয় পাই। আমার কথা আমি বলব। না শুনলে না শুনবে। আমি বুঝে দিচ্ছি, এ মেয়ের জন্য তোমার আরও ভোগান্তি আছে। তোমার আরও মেয়ে আছে, তাদেরও বিয়ে দিতে হবে।

আমার পরের দু'বোনের বিয়ে দিতে বেশ নাকাল হতে হয়েছে বাবাকে। আমার বোনোরা দেখতে মন্দ নয়, খোলাপড়া শিখছে। গান, গৃহকর্মও অপরূপ। তবু—কোথেকে লোকে সব খবর শোনে যাবে। বাবা অবশ্য কিছু গোপন বা আড়াল করার চেষ্টাও করেননি।

নন্দা সেজেগুজে এসে বলল, মে টাকা দে।

॥ ৩ ॥

কাল সন্ধ্যায় বাড়ি শেঁখছি। এসে থেকে লক্ষ করছি, বাবা খুব কাশছেন। ঘন ঘন। নন্দাকে বললাম সকালে, বাবা যে এত কাশছে, তাদের কানে যায় না? কী করিস, ডাক্তার দেখাতে পারিস না?

মা বললেন, তোমার ভাইবোনদের অত সময় কোথায়? যে যার নিজেকে নিয়ে মেতে আছে। সংসারে কার কী হলো সে বোঝি কি তারা রাখে? মদল কি বাতল—

—যেঁজ রাখ না কেন, নন্দা খেঁবে ওঠে। বাবা তো এরকম কেশে পাচ্ছে অনেকদিন। অল্প স্বরও বোহাগ হয় সন্ধ্যার দিকে। বাবা কি আমাদের কোন কথা শোনে? না যাবে ডাক্তারের কাছে, না যাবে ওখ। তুলসিপাড়া-টাটা কীসর যেন পাচ্ছে। রাত্তো তো ঘুমও ভাল হয় না। আমি সব জানি, কিন্তু কিছু করতে পারি না, বাবা কিছু করতে দেয় না। কিন্তু করার চেষ্টা করলে বেগে যায়।

এবার দেখছি, বাবার শরীরাটা যেন আরও ভেঙেছে। বেশ কিছুদিন হলোই বাবার শরীরাটা ভাল লাগছে না। কিছু না কিছু লেগেই আছে। যাকিনটো মানসিকও হাত, কিছুটা বাঁকা আর অবসাদ। অবসর সময়ের পর থেকে বাবা কেমন যেন মদলেও গেছেন। দিনের শেষে সময়টাই তার কাটে বাড়িতে বসে থাকে। শেলেও কিশোরী বেশি মাগায় না। অল্পেই মেজাজ যায় বিগড়ে, গালাম্ব করতে। বাবার সঙ্গে কথা বলতেও সবাই ভয় পায় এখন। আমার পরের বোনের এক মেয়ে, তার পরের জন্মে এক ছেলে। নানি-নাতনিরা দলুকে ভয় না শেলেও, গোমড়াযোনা দানুর জন্য তাদের কোন টান নেই।

অথবা বাবা কী অমুদে লোক ছিলেন। গান-বাজনা করতেন, গল্পের গল্পই শভতেন। কতকম খেলার সামগ্রী আছে আমাদের বাড়িতে। বাবা আমাদের সাইকেল নিয়ে সবজনে খেলায়। কত

নতুন নতুন খেলা বানাতেন। এখন সব বন্ধ। বাবার কিছুই ভাল লাগে না। বাবার যদি ভাল লাগে সেখানে কাজি রান্ডিন ডিঙি সেট কিনলাম। বাবা বিশেষ দেখেন না। যাক, এটাই হাত কারও বিয়েতে দেওয়া যাবে। তা সে-কথা ভাইবোনো শুনবে কেন।

বাবা এরকমই হয়েছে এখন। মানুষ কত ক্রুত বলায়। অসন্তব মনের জোর ছিল মানুষটির। কড়পাটা যা কিছু এককালে একা সামলেছেন, কাউকে ঠের শেতে দেননি। অবসর নোবর পর সেই মনের জোরটাই উবে গেল। প্রথম সব কৃষ্ণ-হাসির গেছে।

বাবা বলতেন, রিটারায় করে দেশের বাড়িতে গেল যাব। এরকম ছোটো মায়াযায় আর খরচ কী। শি এফ, গ্যারুটিউ ইত্যাদি মিলে যা পাব তাতে তোরা বোনোদের পার করে দেবে। পলাশেরও একটা কিছু হবে নিশ্চয়ই। পেশনশের টাকায় বুড়োবুড়ির গেম-তেজন চলে যাবে। না হয় উঠানো বেতন, টেডস, মুলো, পাল-এর চাষ করব।

তখন তো চাকরিতে ঢুকেছি। আমি আর বোঝা নেই। চাকরির জন্য দু'রে যেতে হয়েছে। বাবার টানে, বাড়ির চেষ্টা প্রতি মাসে দু'পাশ, ভিরাবা ছুটে আসতাম। তখনও কুনাল আসেনি জীবনে। তখনও আমার অকৃত্রিম বন্ধু কেবল এই একজন, আমার বাবা।

বাবা অবসর নিয়েছেন দশ বছর হল। এই দশ বছর আমাদের মাঝে একটা দেওয়াল উঠেছে অল্প অল্প করে। বাবার সাথে গল্প করার ইচ্ছে আজ আর প্রবল হয় না। আর গল্পই বা কোথায়। এখন কথা কেবল সংসারের হালচাল নিয়ে, অভাব-অনুন্ন নিয়ে। ছেলে বেকার, আরও দুটো মেয়ের বিয়ে বাকি। ডা আর হুতলা যেন বাবাকে খিরে রেখেছে। শর পর দুটো মেয়ের বিয়ে দিতেই বাবার সব গেছে। সামান্য জমিজমা যা ছিল তা'ও বড়ি ছাড়া আছে শুধু মায়ের সামান্য কিছু পয়সা, আর যান দুই ফিল্ড ডিগ্জিটি। করে থেকে বাবা যে আমার টাকারও নিতে শুরু করলেন, মনেও পড়ে না। অথচ গোড়াই বাবাকে টাকা দিতে গেলে ধমক খেতাম। বলতেন, সংসারের কথা তাকে ভাবতে হবে না। তার টাকা তার কাছেই যাবে। আনন্দ-মুগ্ধ করিস। এই চাকরি তাকে আরও ধার্মীতা দেবে, সুখে থাকবি।

বাবার কথা ছিল, মদ্রের মতো কোমাল, পার্থনার মতো ব্রিন্দ। সুখে আছি আমি, পূর্ণ ধার্মীতা দেখিয়েছি। তবু, পাণি এয়ে গিয়েছে, যেন সবটাই ফাঁকা। আনন্দ নেই জীবনে। আমার বাবা দু'রে সরে গেছেন। বাবা আমার বড় কষ্টে আছেন। বাবার কষ্টে প্রসন্ন দেখা, স্বপ্নের উপশম ঘটনা আমার কর্তব্য। সে চেষ্টাই তো করি। কিন্তু বোনদের বিয়ে, ভাই-এর চাকরি, কোন কিছুই যে আমার হাত নেই।

কুনাল বলছিল, তোমার বাবা যদি মত না দে, যদি আপত্তি করেন, যদি দুঃখ হয়?

তাও কি হতে পারে? বাবা বলছেন, কিন্তু তাঁর আদরের মেয়ে মেধা বিয়ে করতে চায়, এই সংবাদে তাঁর মুখে সেই উজ্জ্বল হাসি একবার দেখা দেবে না কি? মানুষ কি এতই বদলে যায়, একবারে ফুলসুন্দ! বিশ্বাস করি না। আবার ভয়ও হচ্ছে, অস্বস্তি।

নন্দার হাসতে টাকা দিয়ে বললাম, ভাতারকে সব বুঝিয়ে বলিস। আর তাত্ত্বিকি বিবরণ, তোর সাথে অনেক কথা আছে। গিরিয়াস কথা।

নন্দা মিষ্টি হেসে বলল, জানি তো।

নন্দা জানে! হতেই পারে না।

॥ ৪ ॥

নন্দা বেরোল আর ভাই ঢুকল বাজার নিয়ে। একটু পরেই স্নানঘর থেকে ভেঙ্গে এল মায়ের চিৎকার।

— হারামজাদ! বাজার এনেছে দেখো, যেন টানাটনি সংগ্রাম। বিনে-নাতে এখানে কটা পাত পড়ে সে খোঁজা আছে বাবুর? বেয়েটা এতদিন পরে বাড়ি এল তাকে যে একটু ভালমন্দ বোঁধে খাওয়া, তার জো আছে।

আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম, বাস্তব হওয়া না তো মা, আমি দেখছি।

— তুই কী দেখবি রে, আমার সংসার আমি বুঝি না?

এই পর্বত ত্রিক আছে। যা এরকমই। কিন্তু তারপর বা বললেন, তাত্তব আর স্নানঘরে দাঁড়ানো গেল না।

— সংসার তো নয়, রাবণের গুপ্তি। তা ছাড়া-কুকুরের মতো রাজা বিয়েগেলে হবে না? এখনও বুঝো এই এতগুলো মুখ ছুটে আসে হাঁ করে মাগে নিলত? কেন, যা তাদের বাপের কাঁধে গিয়ে খোঁজ।

পলাশ বলল, বাজারে কিছু নেই রে। যা গরম পড়েছে!

আমার পরে দুই বোন— যাদের বিয়ে হয়ে গেছে, তারপর নন্দা, পলাশ আর ছুটিকি।

লোডশেজি। পলাশকে একটা হাতপাশা এগিয়ে দিয়ে বললাম, মায়ের এসে কথার কান না দিলেও চলবে। জামাতা খুলে ফেল।

পলাশ বলল, দিবিবো, একটু চা খাওয়ায়।

— এখন চায়ে কথা বললে মা কাটা নিয়ে ভেঙে আসবে। বোস, একটু পরে।

— সংসার সময় নেই, একুনি বেরোতে হবে।

— কী তোর এত কাজ রে।

— সে তুই বুঝবি না।

পলাশ এবার বি এ পাশ করল। পাস কার্গের বি এ। ছাত্র

কি খুব খারাপ ছিল পলাশ? ফুলে বেশ ভাল করত। খুব খারাপ করল উচ্চমাধ্যমিক। এ একটা বার ছোট্ট খেল আর ওর সামনে নেন সব দরবার বন্ধ হয়ে গেল।

চুলের মুঠি ধরে টান মেরে বললাম, কেন বুঝ না রে?

পলাশ হাসল, কোন জবাব দিল না, উঠেও গেল না।

ভাই আমার চেয়ে অনেক ছোট। তার যাবস বাইশ। রোফ-বাড়ি গজালেও ওর মুখটা এখনও বেশ কুটি ছোটবেলায় বেশ দুশুভ ছিল। যেন এখনই একটু বেশি পিঁ। কী জানি কেন— হাতত অশিশিত ভবিষ্যতের জাবনয় বিহুল। পলাশ সাধারণ আর দশটা বুঝ ছেলের মতো নয়। পেশাকের বাহার নেই, সিনেমা-ভিডিও-র বৌক নেই। সম্ভবত কোনও পেশাও করে না। জানি না, বাইরে ওর কী মুঠি, ঘরে সে স্পষ্ট কথা বলে, চাল নেই, ঢালাকি নেই।

— হ্যাঁ রে ভাই, আজকাল তবলা বাজাস না আর, চর্চা আছে না গেছে?

— গেছে। একে তো অকালকৃত্যও বলে মা গালাগালি দিচ্ছে সকাল-সন্ধ্যা, ভায় যদি বাড়িতে বসে ধাই-ঘণা-বশুতবলা পোঁটাই তো দেবে বাড়ি থেকে বার করে। এখন তো আর ব্যাঙ্গদলও নেই যে পাঁচটা টাকা উপায় হবে। সেজির বিয়ের পর গায়-বাজানো পাট এ বাড়ি থেকে উঠে গেছে। ছোট্টিকি আর ছুটিকির কোন আগ্রহই নেই। তুই গাইবি তো বাল, আজ সন্ধ্যায় বার করি সব। তুই গান ঘরলে বাবাও—

বাবা আমাকে গান শেখানোর ছোট্টিকি ছিলেন, বিশেষ সুবিধা হয়নি। তবে সবাই মিলে ঐ যে একটা আমার তার একটা আলদা বাদ ছিল, আনন্দ ছিল। — বেশ তো, সন্ধ্যায় কোথাও যাস না, বাড়িতেই একটা আড্ডা তো হতে পারল।

— না রে, হবে না।

— কেন?

— আমাকে এখন কতরকম ধান্যায় ঘুরতে হয়। যা হোক তাহোক, একটা চাকরি জোটাতে হবে তো। তাদের সময় যদি বা কিছু চাকরি ছিল, এখন তাও নেই। সাধারণ চাকরি সব পাটিস মুঠো। তা সাধারণ চাকরি ছাড়া আমার আর তো কিছু হবার নয়। তাই পাটি করছি খুব মন দিয়ে। বাবা আবার এটাই বুঝতে চায় না। রাগ করে। পুরনো পড়া ধারণা সম্বল করে বসে আছে, ভাবে পাটি করা খারাপ কাজ।

পলাশ বাবার বিরুদ্ধে অভিযোগটা বেশ চড়া গলায় করল। দেওয়ালের ওপাশে বাবা, দেওয়াল তো শব্দনিরোধক নয়। নিশ্চয়ই শুনেছেন। বাবার হয়ে আমি ওকালতি করি।

— পাটি করা খারাপ কাজ, এমন কোন ধারণা বাবার আছে

তোকে কে বলেছে? পাটি করা মনে ভাগ্য, কৃষ্ণসাধন, নিষ্ঠা— সে তো সহজ কাজ নয়। একটা তপস্যা, সে কি তুই পারবি, এই ভেবে হয়ত বাবা চিন্তিত।

গলা নামিয়ে পলাশ বলল, হাঁ, তপস্যা! ত্যাস! উষ্ট্রপাশটা খাওয়াস না তো দিদি। তোর ভ্রাসনোটে এসে ছিল বোধহয়! আমি যেমন দেখছি, যেমন বুঝছি তেমন ভাবে পাটি করব, তারপর ভাড়া।

— ভাড়া! পাটিও করবে, ভাড়াও মানবে?

— অ্যাগ! ভাড়া ছোট, বাবার জম্বায়া হবে কেমন করে? তাই যেমনত, হিহাত, তেল, জল, বাবার ফুল সবই লাগে।

ভাড়া! ভাড়া আমার বিশ্বাস থাকার কথা নয়। কুটি-বিচার করে, গণনা করে, লয় শুভ দেখে আমার বিয়ে হয়েছিল। রাজস্বদানী হবে, দেখা ছিল জম্বাক্রিয়ায়। ফল তো মিলেছে হয়ে গরম। তবু আমি ভাগ্যে বিশ্বাসী। ঠাকুর-দেবতা মানি, শুভ-অশুভ মানি, মঙ্গল কামনা করি, অমঙ্গল আশঙ্কায় বেশে উঠি। ভাড়া ভাল বলেই না কুনালের ভালবাসা পেয়েছি। কুনাল হাসে এমন কথা শুনলে। না তার ভাগ্যে বিশ্বাস, না পাটিতে বিশ্বাস। তার নাকি বিশ্বাস কেবল ভালবাসায়। কী যে হোয়ালি করে। বিয়েটা হোক, তারপর ওর হোয়ালি খোঁজ।

চা করতে করতে ভাবছিলাম, একবার দুই থেকে টিল ছুঁতে দেখলে হয় কেমন। বিয়ে করব— সোজাসুজি বিয়েটা করতে কেমন লজ্জা তো করছেই। তা ভাইকে যদি বলি কথাটা, ঠাট্টার হলে, একটু গলা তুলে, যাতে দেওয়ালটা শুনিয়ে?

চায়ের কাপা হাতে নিয়ে পলাশ বলল, হ্যাঁ রে দিদি, তোর চাকরিতে কোন ইনক্রিমেন্ট নেই?

— কেন থাকবে না?

— তা হলে আমার হাতখরচের ইনক্রিমেন্ট নেই কেন? বললাম, আচ্ছা সে হবে। তবে চাকরি পেলে বেকারভাতা বন্ধ।

— ও বাবা, তা হবে না। এমন কোন কথা ছিল না। বিধ ওলাপাট হলেও আমার হাতখরচের টাকা বন্ধ করা চলবে না বলে দিচ্ছি, খবরদার!

— বটে! আর আমি যদি বিয়ে করি?

দুই করে বলে ফেললাম। পলাশ চোখ চিটিখিটি করে তাকাল।

— কী বলবি?

গলা আরও একটু চড়িয়ে টেনে টেনে বললাম, যদি আমি বিয়ে করি?

পলাশ দু'এক মুহূর্ত কী যেন ভাবল। তারপর বলল, হুঁ!

তুই করবি বিয়ে। তবে, বিয়েই করো আর যাই করো, আমার

টাকা তোমাকে দিতেই হবে।

না, ভাইটা ছেলেমানুষই রয়ে গেল। আমলই দিল না আমার কথায়। কিন্তু বাবা, শুনেছেন, দেওয়াল পর হয়েছে তো? আমার বেশ দু'ক পক্ষে।

হাতা পলাশ লাফ দিয়ে উঠে কাছে চলে এল। আর তখনই মা ঢুকলেন ঘরে। — হল তাদের চা খাওয়া? যে, কাপড়গুলো দে।

মা বেরিয়ে যাবার পর গিরিয়াস করে পলাশ বলল, একটা খবর শুনেছি দিদি। ঠাট্টা-হ্যাঁকি নয়, সত্যি খবর— ভাড়া খবর, জবাব খবর। ছোট্টিকি খবর!

হুঁ! ছোট্টিকি খবর— আমার খবরটা মায়ের কানে ঢুকল নাকি!

॥ ৫ ॥

ভাইবোনদের মধ্যে নন্দাটাই কেমন যেন সুচীছাড়া। যে দু'বোনদের বিয়ে হয়েছে তাদের একজন বি.এড. করেছে, অন্যজন বি.লি.ব. পলাশ যা হোক গ্রাজুয়েটই হতে পারে। ছুটিকির পড়াশোনাও প্রবল আগ্রহ, ভাল কিছু সে করবে আমানত খুব আশা। হল না কিছু নন্দার। কোনও চেষ্টাই করেন না। উচ্চমাধ্যমিকে আটকে গেল। ইচ্ছাও নেই, উৎসাহও নেই। গানবাজনা শেখারও কোনও চেষ্টা করেনি কখনও। কোথায় একসময় যেত থো যে নিখতে। তাতেও সুবিধা করতে পারেনি। দেখতেও সে যেমন ভাল নয়। কাশো, ঢাড়া। হাঁটুকা, পলাশ বর পুষাকালি। বেশ খরখরিও। মায়ের সঙ্গে তো লাসেই দু'বেলা। ভার নেই নন্দারের সঙ্গেও।

— টাকার গলি হাতে থাকলে তবে এমন ঘরে পার করা যায়। যখন চাকরি ছিল তখন তবু ছুটিকি নোবর সাহস ছিল। লোকে সাহায্য করত, ভরসা করে ধার দিত। এখন আমাকে কেউ পাড়া দেয় না, দেবেই বা কেন? ধার পারার যোগ্যতাও যে নেই আমার। দুটোকে যদি বা খাড়া থেকে নাগাতে শেখাই, এটাকে আর পারব বলে মনে হয় না। বাবার গলায় শুধু হতসার সুর।

নন্দার বিয়ে এক বড় দুশ্চিন্তা বাবার জীবনে। বাবা যখন এমন কথা বলে তখন মনে হয়, ঠিকই তো, এত দুশ্চিন্তা যার মাথায় সে আর ভাল থাকে কী করে। 'তব না, সব ঠিক হয়ে যাবে' গোছের কথা তো তাঁর কাছে অস্বাভাবিক শোনাতে পারে। কেউ কেউ নির্বাক থাকতে পারে, কেউ কেউ পারে দাবিফ্রী হতে। সমাজ বা সংসার উপেক্ষা করলেও হয়ত এধরনের অনেক সমস্যা আর দুঃসহ্য ভার মনে হয় না। আমার বাবা কিংবা মায়ের শিক্ষা-নীতি যে তখন নয়। সমাজ বা সংসার তারা উপেক্ষা করতে পারেন না, অশুভ এ বসে তো নয়ই। একটা বয়সে বাবা অনেকটা শেয়েছেন, এখন পারেন না।

পলাশের কথা শুনে বুঝলাম, মা কেন সকালে অমন দাশাখিল, মা কি সব খবর রাখে!

সজ্জেলো গা গুয়ে ছাদে গেলাম মাদুর নিয়ে। উঁচু কার্শিস। হুসুহুসে হাওয়া। বর্ষা আগভ্রাশ। বুকের বোতাম খুলে ত্রা আলগা করে শুলাম। নন্দা এল। অকারণে পাশে বসে পা টিপতে শুরু করল।

নন্দা আমার চেয়ে দশ বছরের ছোট। নন্দা, পলাশ আর ছুটিটি আমের গাছ, অনুগ্রহ। এদের যত মনের কথা, প্রাণের কথা আমার সাথে। আবদার যা আমাকে জানায়। আর জানাচ্ছেই বা কাকে। এরা একরকম আমার কোলে-শিটেই মানুষ।

এই নন্দা এতদিন পুরো ব্যাশারটা গোপন রেখেছিল!

— নিদি!

— থাক, আমি কিছু সুনতে চাই না। আমি সব জানি।

অন্ধকার। মুখ দেবারও উপায় নেই। গলার স্বর শুনে নন্দা বৃষ্টি ভালো, আমি বেগে আছি। হঠাৎ সে আমার পায়ে মাথা ঝেঁজে ডুকরে কেঁদে উঠল। নন্দার আমার কান্না কি শুনেছি আগে?

— আরে ওঁ, ওঁ, পারলি— সুফসুড়ি লাগে যে!

তাকে বুকে টেনে নিয়ে মাথায় হাত সুসিয়ে দিলাম। সাম্ভ্রনা নয়, আশীর্বাদ।

— প্রেম করিসি, সেটাও তো আমাকে বলিসনি।

— সে কি ঢাক শিটিয়ে বলার জিনিস। লজ্জা করে না!

সত্যিই তো। প্রেম কি বিচিত্র— লজ্জাও চাই, সাফল্যও চাই। আড়াল চাই, আকাশও চাই। আমার যে এতটা বকস হলো, বুড়াই বলা হবে, আমার প্রেমের চলন ভিন্ন হলেও চলটা কি একই না? লজ্জা যে আমার শায়েও নুপুর হয়ে বাজছে।

— বিয়ের কথা তো বলতেই হবে।

— কাকে বলব? কেউ শোনার জন্য আছে কি? বাবা আজগলস সব সময় এমন খিটখিট করে, তার কাছে যাওয়া যায় না। মা তো আমার কাঁচি ওপরে। মােরে মুখে কিছুই আটকায় না। মুখ করে হাত যা তা বলবে, আর দেখে থাকে আমার সাথে। তাকে বলব বলে কবে থেকে ছটফট করছি। তুই তো অনেকদিন পরে এলি। এর মধ্যে মেজাজ এসেছিল, তাকে বলি বলি করতেও বলে উঠতে পারিনি।

মনে মনে বললাম, আমারও যে একই সমস্যা রে। তুই তবু তো আমার কালে বহুর সুযোগ পেয়েছিস, আমি বলি কাকে? নন্দা বলল, ও অবস্থা এনই বলতে না ক'রবেই।

— বোকা কোণাকর, এসব কথা চাপতে হয় নাকি, না চাপা থাকে। আমি তো এসেই জেনে গেলাম। ভাই বলল। ভাই

জানল কোথেকে? সে নিশ্চয়ই আর কারও কাছে শুনেছে। আর দেরি না করে বাবাকে বল। একা না পারিস, বুজানো মিলে বল।

— ওরে বাবা, ও আসবে না।

কুনাল আসতে চেয়েছিল।— তোমার মা-বাবা, ভাই-বোন কেমন বুকে নেওয়া দরকার। তাঁরাও একটা সুযোগ পাবেন। তোমার শায়েবর পুষ্টিই কেনন ত্রা একবার বাড়িয়ে দেখতে পারেন। ভাছাড়, একটা হিসেব-নিকেশও করে ফেলা যাবে— আশীর্বাদি, প্রশমি, গমনা, দানসাম্রী— বিয়েটা বেশ বিয়ের মতো করতে হবে তো।

আমি তাকে আসতে দিইনি। সৃষ্টিছাড়া মানুষ, কী বলতে কী বলবে। বিয়ের কথা তো রসরসের করি। তবে ওর সাথে আলাপ হল ওকে নিশ্চয়ই সবারই ভাল লাগত। অনেক আগেই ওকে অনা উচিত ছিল। সকলেরই একটা বৈশিষ্ট্য আছে, সেটাই যে তার পরিচয়। সেই পরিচয়টা হওয়া দরকার ছিল, হলে আজ কাছটা অনেক সহজ হত।

— ভা রে, নন্দা কী করে, কোথায় থাকে, সেসব বল শুনি, তোর সাথে পরিচয়টা হল কেমন করে? বাড়িতে কে কে আছে?

— কোন ভাই বন্ধনি?

— তোর দুখেরে শুনি না।

— ঐ তো প্রতাপবাগানে ওদের বাড়ি। বাড়িতে সবারই আছে— মা, বাবা, ভাই, বোন। বায়েদের এই সেদিন বিয়ে হয়। ওদের একটা ছোট বাবসা আছে। বই-খাতার দোকান। বাবার সাথে ও বাবসা দেখে। বাস, এই তো, আর কী।

— আর কিছু নয়?

নন্দা উত্তর দিল না। কেমন করে পরিচয় হল, সে কথা বলল না। কী জামি, হাত ভালো ও যায় না। আমিও তো বলতে পারব না। প্রথম আলাপের দ্বিগুণ তো একান্ত আপন সম্পদ, ব্যক্তিগত। আর পরিচয় তো বিবরণ না। পরিচয় মাংসের আকারে, অনুভবে।

— নন্দা খানিকক্ষণ পরে বলল, ওদের বাড়িতে এ বিয়ে সহজে মানবে না। তার চায় অনুষ্ঠান করে বিয়ে। পণ নেবে না চিকই, কিছ—

— কিছ কী? গমনা চাই, দানসাম্রী চাই? বিয়ের খরচ দিতে হবে?

নিশ্চয়ই নন্দা বলল, ওদেরও তো অবস্থা তেমন ভাল নয়।

আমার খুব হচ্ছে হল, ডিংকার করে বলি, ঐনা কি শুধু বাইরে, না ভেতরেও?

বাতাস খেদে গেলো। ছেঁড়া মেখে ঢাকা পড়েছে আকাশের

তারা। বৃষ্টির আয়েজান চলছে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে নন্দা বলল, বল তো নিদি, এখন আমার কর্তব্য কী?

॥ ৬ ॥

আমি বলেছিলাম, লিভ টুগেদারই ভাল। এ বুড়ো বয়সে আর বিয়ের ফর্মালিটি কেন?

— বুড়ো বলেই তো তেতের-বাইরের দু'দিক দিয়ে বাঁধতে চাই। বাস যাগদেব কমে, পশ্চিমা-নিষ্কার অস্তিত্ব তালো থাক তামেরে জ্ঞান। আমাদের চাই বাঁধা সড়ক। ঝড়জলে, বনবালাড়ে অমনো পথ খোঁজা আমাদের কর্তব্য নয়।

কুনাল এমন সাহসিয়ে কথা বলে যেন সব বানানো, মিথ্যা। তবু কী দুর্নিবার তার আকর্ষণ। অবস্তার কথা বুঝি ভালবাসার অনুষ্ঠানকী? কী যে আগুন থাকে, দু'দিক স্থির থাকতে পারি না, হুটে ছুটে যাই।

কুনাল থাকে একা। বড় অগোছাল। আমি তার ঘর গুছিয়ে দিই। রান্নাও করি কখনও। আদর করে কাছে টেনে দিলে তার বুকে মুলুকে। পুরকে আবেশে সে মুহুর্তে কী যে ঘটে বকতে পারব না। সে মুহুর্তগুলি অন্যাসব মুহুর্ত থেকে একেবারে আলাদা, অনির্ভর্য। শুধু হনয় না, নারীর শরীরও আছে। তারও একটা প্রার্থনা থাকে, তুম্বা থাকে। তুম্বাও ছিলাম বলেই হাতও ঐ পুরুষ-শরীর থাকে পারার জন্য চপ্পলতা জাগে। কুনালকে কিছু বলতে হয় না, ও জানে কেমন করে ভালবাসতে হয় আর কখন কোন মুহুর্তে। কখনও কখনও খোঁজা দিই তাকে, কেমন করে এসব জানালে মশাই!

কুনাল খুব শান্ত, বিনীতি। তার চোখে-মুখে একটা মিষ্টি হাসির ছটা। কিন্তু ওর ভেতরে একটা অন্য মানুষও আছে। সে মানুষটা কোন কোন দিন বেগিয়ে পড়ে। সে মানুষটা দারুন চপ্পল, মুষ্টিভিঁ, আবেগপূর্ণ, উদার।

সেদিন সেই অন্য মানুষটা জেদ ধরল, বিয়ে করব, বিয়ে-বিয়ে—

বিয়ে জিনিবটাই তো আতঙ্ক আমার জীবনে। বিজীমিকা। বিয়ে আর স্বাধীনতা যেন দুই ভিন্ন মেরু। লুক মুক্ত পুরুষ তো কতই এসেছে এ জীবনে। কেউ এসেছে প্রেমিকের বেশে, কেউ সঙ্গারটির বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে। আমার জীবনের ট্রাজেডিতে প্রচণ্ড দেরির অছিল্য এসেছে কেউ কেউ। সকলেরই মূল লক্ষ্য যেন সওয়া করা। দরদাম করার সুযোগও দিইনি কাউকে। জোড়াপ্রসঙ্গর সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা যে কাটতে হয়েছে আমাকে। একা একা ঘরে। পুণ্য ভাটটাকে আমি চিনি। তারা বিয়ে করে কী আনতে যায় না, যায় দশী আনতে চিনি।

জীবগণতে কোন কোন প্রাণী আছে সঙ্গম শেষে তারা পুরুষ সঙ্গিকে মেরে ফেলে। নির্মম কিন্তু দ্ব্যর্থহীন সে প্রথা। সে জগৎ

ময়ুম। আমার জীবনে কুনাল না এলে কতকাল যে বয়ে বেড়াতো হত এই কুষ্টি ধারণাটা!

— এ কেমন বিশ্ব তোমার যেখানে স্বাধীনতা আছে, সেই সেখানে সুখেরে জন্য আসন পাতা। আলো না থাকলে আকাশের অস্তিত্ব কী মনো যায়?

কুনাল আমার মনের আকাশ রাঙিয়েছে।...

এই যে দু'দিন বাড়ি এসেছি, স্নানাগ্রহ বনের মধ্যে শুধু কুনাল। ভালবাসা যে এমন ভাঙুর করে কে জানত।

বাবার সাথে বিয়ে নিয়ে কোন কথাই হল না। নন্দার কথাটাও বলা হল না। নন্দাকে বলেছি, তোর কথাটা বাবাকে চিঠি লিখে জানাব। সেটাই সহজ হবে। বিয়ে দিতে খরচ আছে, এ তো জানাই ছিল। তবে কিনা এরকম বিয়েতেও—। যা হোক, অসুবিধা হবে না, বাবখা হবে। ভাবিস না।

নিজের বিয়ের ইচ্ছাও কি ঐ একই চিঠিতে জানাব?

কুনালকে আগেই বলেছিলাম, বাবার সামনে দাঁড়িয়ে, বিয়ে করতে চাই— এ কথাটা কিছুতেই বলে উঠতে পারব না। তার চেয়ে সহজ হয় চিঠি লেখা।

কুনাল বলেছিল, না না, এসব কথা চিঠিতে হয় না। বলতে গিয়ে লজ্জা রাঙা হয়ে উঠবে, হোটট থাকে— তবে না মজা।

বিয়ের গিয়ে কুনালকে যখন বলব, কিছুই বলা হয়নি, কাউকে বলা হয়নি— কুনাল খুব বেগে যাবে।— আর একদিন থাকলে না কেন, বলবে না। কিন্তু আর একটা বেলাও থাকতে ইচ্ছে করবে না। আমার আঁতলে একটা সমস্যা তো বাবার মশলকে লক্ষ্য। কুনাল এসব বুঝবে না। কুনাল বোকে না তাকে ছেড়ে একটা দিনও থাকতে আমার ভাবি কষ্ট। না বুঝে। কাল ভাতের আমাকে কখনোই হবে। কুনালকে বলব, বাবা এমনই অসুখ যে বাবাকে এখন এসব কথা বলাই যাবে না।

কিন্তু কুনালটা এমনই যে ঠিক বুটিয়ে বুটিয়ে সব টেনে বার করবে। তাকে দিয়ে কথা বলা যায় না। কিন্তু বাবার সাথে যা কথা হল তা বলব তাকে? কেমন করে বলব!

বাবার পর নন্দা সেছিল বাবাকে ওখু খাওয়াতে। পারেনি। তখন আমি লেগলাম।

— কী বাশার, ওখু খাচ্ছ না কেন, এ কী ছেলেমানুষি। অসুখ হলে তো ওখু খেতেই হবে বাবা। ডাক্তারের কথা শুনেই হবে। তুমি যদি ডিকিবাস অবহেলা কর, ডাক্তারের কথা না শোন, তো আর আসব না আমি, দেখো।

বাবা আমার হাত থেকে ওখু নিয়ে খেলেন। চোখের কোল ডিঞ্জে গেল আমার। এভাবে আমি ছাড়া কে পারবে বাবাকে শাসন করতে? এটাই নিয়ম বহুদিনের।—আমি বাবাকে শাসন করি,

বাবা আমাকে ভালোবাসেন।

— ডাক্তার বলেছেন, রক্ত পরীক্ষা করাতে আর একটা এস-ব্রেও করাতে হবে। কাল যথোৎ, নন্দা বা পলাশ নিয়ে যাবে।

বাবা আমার মুখের বিকে তাকিয়ে রইলেন, কোন উত্তর দিলেন না। কিছুক্ষণ পরে বলেন, ছুটিকি বলছিল, কম্পিউটার শিখবে তাতে কি কিছু লাভ হবে?

— এবার ছুটিকির সাথে খোঁজা হল না। সে গেছে মাসির বাড়ি বেড়াতে।

— হত পারে, চাকরির সুবিধা হতে পারে।

— তাহলে তো ভালই। পলাশটাও যদি তেমন কিছু শিখত। একটা জোয়ান ছেলে যদি চাকরিই না পেল—

— চাকরি ভাগ্যে থাকলে ঠিক হবে, তুমি ভেবে কী করবে।

— না ভাবতে হলে তো ভালই হত। না ভেবেই বা করি কী। কোথায়ও তো কোন আশার আলো দেখছি না। কী দিনকাল পড়েছে। আমি পম্পট দেখতে পাচ্ছি, রথের ঢাকা বসে যাচ্ছে। সংসার চলেছে তোর পাঠানো টাকায়। আমার পেনশন আর কটাকা। তুই যে জেল করে বিয়ে করলি না, এখন মনে হয়, তাই মনে ছিল ঈশ্বরের অভিশ্রাব। তুই না থাকলে আমাদের দু'লোক দু'মুঠো অল্পও জুটতো কি না কে জানে।

— বাবা!

বাবা কি দুঃখিদের? মাঝে মাঝে তো কানিশ শব্দ পাচ্ছি। বাকিরা দুঃখিদের। দুঃখ আসে না আমারও। বাবা যেন আরও ভেঙে পড়ছেন। সংসার যে আমার পাঠানো টাকায় চলছে সে কথাটা এভাবে বলার কোনও দরকার ছিল? নাকি তখনই একটা সন্ধ্যা-সহরক কথা আমি মনে পড়ি, যে, আমি বিয়ে করলেও টাকা পাঠানো বন্ধ করব না। বরু, তাই বলা যায় নাকি ওভাবে। কুনাল হযতো পারত। কত শব্দ কখন কুনাল কত সহজ বলে। আর এভাবে সোজা-সহরক কথা আমি মনে পড়ি শক্তি দিয়ে বলে উঠতে পারলাম না। অসমর্থ, একেবারেই অসমর্থ। কুনালের কাছে কত কী শিখেছি, শুধু শোনা হয়নি বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সত্য কথা বলতে।

ভোজের ট্রেন। ভাইকে বলে রেখেছিলাম, স্টেশনে পৌঁছে দিতে। স্টোপেজিন্ডেও উঠল না। জোরেও ডাকতে পারলাম না, পাছে বাবার মন ভেঙে যায়। মা বললেন, নবাবপুরের সব। ভোজের মিঠে হাওয়ায় স্বপ্ন দেখছে রাজকন্যার।

বেরোবার সময় সেনি মা'ও তৈরি। — তুমি যাবে কোথায়?

— কেন, কেউ পৌঁছে দিতে। এতটা পথ একা যাবি না কি? চান্দবিচ্ছে যাসব ঘটছে।

— না না, তোমাকে যেতে হবে না। আমি বেরিয়ে রিকশা দেখে যাব।

— পাবি না, তারো এক একজন নবাব। যদি বা কাউকে পাওয়া যায় তো সে তিনের জায়গায় দশ চাইবে। ফর্সা হয়ে এল, এসময় হাঁটতে ভালই লাগবে, চল। যেতে যেতে তোর সাথে একটা গল্পও হবে, আমারও তো ইচ্ছে করে—

মাকে আটকানো গেল না। হাঁটতেই হল, রিকশা পাওয়া গেল না। পথে যেতে যেতে মা কত কথাই বললেন। মায়ের গুরুসবের কথা, ঈশ্বরের কথা, ইহকাল-পরকালের কথা। ছেলেদেরার টুকরো টুকরো স্মৃতিগাথা। ট্রেনে চেষ্টে কোথাও যেতে যে মায়ের খুব আনন্দ হত, তা'ও বললেন।

মা একটাও সংসারের কথা বললেন না। আকাশে ছড়ানো নরম আলো, সুস্থ হাওয়া, নির্জন পথ। কাল শেষ রাতে কুটি হয়েছে সামান্য। হাওয়ায় সোমান্য হিম, শিরশিলায়। রাস্তার আলোগুলো ভোজের আলোর রেখায় ঘোঁষায়েছে। অল্প অল্প করে মায়ের সাথে গল্প জমে উঠল বিবি। মায়ের সাথে এভাবে গল্প কি করিছি কখনও? মনেও পড়ে না। অস্পষ্ট রেখায় স্মৃতিতে ধরা দেখে আমার ছেলেবেলায় দেখা অসামান্য রূপসী এক মহিলা। মাঝারি গড়ন, চাঁপা রঙ, কালো কৌকড়া ঘনচুল, দীর্ঘ ভ্রু-পাল্লেরে ছায়ায় শান্ত দীঘল চোখ, টিকন চিকু, চিকুকে ছোট চোঁট। সুবেলা শিউরি ধর। মায়ের গলায় ডকন শুনে ঠাকুরার চোখে জল গড়াতে।

মা কথা বলছিলেন চাষা গলার। মাঝে মাঝে নিজস্ব ঢং-এ হেসেও উঠছিলেন। ঠিকি হয়ে মনে সরের মতো জড়িয়ে ছিল মায়ের মুখে। কিছু স্পষ্ট বার বার উড়ে আসে পড়ছিল মুখে। মায়ের মুখে আজ যেন কোন প্রতিমার ছায়া।

স্টেশনে পৌঁছে মা বললেন, হ্যাঁ রে, তুই তো আজকাল এমন দুঃখ করে অসিস না। এবার এটা কেনে, যিনা কারণে, নাকি কিছু হলার ছিল? মনে হচ্ছে যেন আমি জানি—

স্টেশন একেবারেই ফাঁকা। প্রাট্রফর্মের বেঞ্চে দমল করে শুয়ে আছে কয়েকজন। দুয়ে সিগন্যালের লাল আলো। মায়ের চোখে আমার চোখের ওপর স্থির, অস্পষ্ট, লক্ষ্যহীন।

— মা! মাকে জড়িয়ে ধরলাম। — কেননা করে জানলে তুমি!

মা মৃদুস্বরে বললেন, মায়ের মন। মায়ের কাছে যে দূরা দিওতেই হয় বাছ।

আর কোন কথা নেই, সংকোচ নেই, দ্বন্দ্ব নেই। মায়ের কাছে মুখ গুঁজে বললাম, মা আমি বিয়ে করতে চাই।

এক হাতে আমার মুখটা তুলে ধরলেন না। মায়ের অন্য হাত লক্ষ করল আমার চিকু। আমি চোখ বুজলাম।

গল্প

পুকুর-লাগা পাঁচবিহার গায়া। গম লাগা ছিল। দু'দিনে কেটে শেষ করতে পারেনি পাঁচজন মুনিয়ে। তাই আজকেও এগোছে ভোরের ভাগে।

গম কাটতে ভোরভোরই আসতে হয়। ফাল্গুনের রোদ গমগাছে অনেক হাত সহ্য করে না। মচাং-মচাং শব্দে ভেঙে যায় শিশুগুলি। যতক্ষণ গমগাছের শিশিরের গন্ধ থাকে ততক্ষণই কাটা যায়।

পাঁচজন মুনিয়ে গম কাটছে খুব দ্রুত। তার মামসু খসখস শব্দে চারিদিক ফর্সা হচ্ছে। ওদের বিড়ি খাওয়ার সময় নেই। সূর্য ওঠার আগে গম কাটা শেষ করতে হবে ওদের। ওরা গম কাটছে। এমন সময় হঠাৎ ছাই রঙের কী একটা চারপাশে ছুটে বেরিয়ে গেল ওই গমগেত থেকে। প্রথমে ওরা হকচকিয়ে গেলো ও অনুমনে বৃথল, ওটা শোয়াল একটা।

শোয়াল অতীত মানুষের শত্রু। ওদের ভাঙা প্রাচীর টপকে যায়, মুরগি, ছাগল-ভেড়ার বাচ্চা নিয়ে পালায়। কোনদিন ওরা তাকে সম্মানে পায় না। আজ দেখেছে। তাই গমকাটা বন্ধ রেখে ওরা শোয়ালটার শিক্ত নিল। ওদের কেউ একজন বলল, কতদূর যাবি বোঁটা, বাঁটা—

শোয়াল খুব দ্রুত ছুটতে পারে। চারপাশে ছোটে সে। আর ওদের পা দুটি করে। যদিও ওরা এমন দশপায়ে দৌড়বে। ওদের প্রত্যেকের হাতে কাস্তে আছে। আকাশে আছে বিরাট চাঁদ। তারা নেই। তবে ওদের অন্তরে তারার মতো অসংখ্য দ্রুত আছে। কতগুলি ওদের ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে শোয়ালটার শিক্ত শিক্ত। ওদের আত্মবিধ্বাস শোয়ালটা ওদের সামনে পড়েছে যখন আর তার নিস্তার নেই।

শোয়াল খুব দ্রুত ছুটছে। তার চারটি পা। কিন্তু বিশদ এই যে, তার সামনে কোন গন্তব্য নেই। চারিদিকে সু-খু ফাঁকা মাঠ। কোথাও একটু কৌপাকড় নেই যে গিয়ে আশ্রয় নিবে। শোয়ালটার মনে পড়েছে, গত রাতের কথা। দু'দিনের না-খাওয়া শরীর নিয়ে সে সুযোগ খুঁজছিল গ্রাম ঘুরে ঘুরে। কারও বাড়িতে ঢুকতে পারছিল না। কিন্তু শেষ রাতে একরকম মরিয়া হয়েই কান্দা বেড়া ফাঁক করে এক বাড়িতে ঢুকে একটা মুরগি পেয়েছিল। সেটা নিয়ে

গেল—কোন নিরাপদ স্থানে যাওয়ার কথা তার মনেছিল ছিল না। শেপে তার দোষও ছিল। অগত্যা সে আশ্রয় নিয়েছিল

পঞ্চব্যাসের শিকার পর্ব

নীহারুল ইসলাম

এই গমগেতও। এখন ভরা শেট নিয়ে দৌড়তে অসুবিধা হচ্ছে তার। তবু সে দৌড়ছে মুখে লেগে থাকা কাঁচা রক্তের দাগ ভুলে কুঁতে। তার পেছনে ছুটে আসছে দশটি পা। তাদের ডয়ে সে কখনও আড়াখাড়ি, কখনও সোজাসৃষ্টি, কখনও আলোর ধার দেখে একের পর এক চমকেজতে অতিক্রম করে ছুটছে। কিছুক্ষণ সোজা ছুটে আচমকা বাকও নিচ্ছে। আবার ভাবলেই বাঁয়ে। যদি পেছনে তাকা করে আসা বিশদ দিকভ্রষ্ট হয় মনে করে।

ওদের পাঁচজনের একজন— নাম হামিদ মিঞা। ডিঙাটিতে শরীর। লম্বা লম্বা হাত-পা। সে দ্রুত ছুটতে পারে। ছুটেও। কিন্তু চমকেজতে তার উপর দিয়ে ছুটতে গিয়ে টাল খাচ্ছে তার শরীর। তবু ছুটে ছুটে ভাবছে হাজতে কাস্তে ছুঁতে মাংসে শোয়ালটাকে লক্ষ করে। আবার ভয়ও করছে, যদি লক্ষ্যভেদ না হা তবে সে শিখিয়ে পড়বে। যদিও টানি খেলায় তার হাত তুচ্ছাভ ছিল। তার সঙ্গে কোনদিন কেউ শেরে ওঠেনি। কিন্তু সে তো অনেকদিন আগের কথা। তখন তার বাহা তার ছিল। আর যথেষ্ট, তখন দু'বেলা পেটপুরে যেতে পেত। আর এখন বালবোজার সংসার নবীন এক চাকতে খেঁচ ঈদাম হবার কাছাকাছি। বই জামিয়ার একটা মুরগি ছিল। সেটার দৌলতে এই টানাটানির সংসারে প্রায় একটা করে ডিম জুটতো তার কপালে। এখন সেও নেই। এই শালা শোয়াল গত রাত মুরগিটাকে সারাদ খেয়েছিল।

মুরগিটার কথা মনে পড়তে হামিদের মরা জানের রক্ত টগবগ করে ছুটতে লাগল। সে শোয়ালটাকে লক্ষ করে ছুটছে। ছুটতে ছুটতে কাস্তেটা হাতে ঠিক করে ধরল ছুঁতে মারার জন্য। লাগলেই শোয়ালটা...। কিন্তু না, শোয়ালটা ততক্ষণে আমমকা বাক নিল। আর হামিদের হাতের কাস্তে ছুটে গিয়ে শুধু চামড়ার বানিকটা খুলে মিশিয়ে দিল ফাল্গুনের বাতাসে। সেই কাস্তে কুড়াকতে গিয়ে হামিদ সবার আগে থেকে সবার পেছনে পড়ে গেল।

একসঙ্গে পাঁচজনের 'এল্যা' উভারয়ে শোয়ালটা অসু পেয়েছে। তার গতি বেড়ে গেছে হঠাৎ। যদিও তার পেছনে দশটি পায়ের দম্পদ হারিয়ে যায়নি।

শোয়ালটাকে লক্ষ করে এবার সবার আগে যে ছুটছে তার নাম রসুল। রসুল হামিদের মতো চান্দা নয়— গাঢ়গোটা। শরীর তাকত আছে। হাতও সে শোয়ালটাকে মারতে পারবে। তার হাতের কাস্তে 'নেতি' আছে। শুধু তাক মুখে ছুঁতেই হয়। তবু তার

শোয়ালাটকে একটু বেশিই বেড়াইয়ে ছেড়ে হলে। আর অন্যরা চাইছিল রসুল এখনই হাতে কাশ্তে ছুঁতে মানক। কিন্তু শোয়ালা এখন আসের দার ঘরে ছুটছে যে! কাশ্তে ছুঁলে সেটা আসের দার পেঁচা যাবে। আর শোয়ালা তাদের সঙ্গে ব্যবধান বাড়াবার সুযোগ পেয়ে যাবে। রসুল পালা শিকারী। একবন্ধর সাঁওতাল পরগণা কাজ করতে গিয়ে সাঁওতালের সঙ্গে শিকার করে বেড়িয়েছে। তবে অনের কথা সে কেন ভুলবে? শোয়ালাটার প্রতি তার কোন রাগ নেই। শুধু শোয়ালাটা তার লক্ষ্য শিকারে সে আনন্দ পায় বলে। এই আনন্দের জন্যই সে কীবনে জ্বরুর রাখালজাভিন মেরেছে। এই রাখালজাভিন (গিরিগাট) যে জ্যোততে প্রতিটি রাখালজাভিনের জন্য যদি সে সোয়াসের করে গম পায় তবে সারাজীবনে পরিশ্রমের মূল্যে দেহেরের কাছে শাওয়া গম তার তুলনায় কিছুই নয়। তাই সে শুরঙ্গারের লোভে শোয়ালাকে পছন্দে ছুটছে না। সে ছুটছে শিকারের আনন্দে। শোয়ালাটা একদমে আসার চমকেদের মধ্যে দিয়ে ছুটতে শুরু করেছে। রসুল এরই অপেক্ষা ছিল। তার হাতের কাশ্তেটা সে এবার ছুঁতে মারবে। পেছনে যারা ছুটে আসছে তারাও নিঃশব্দ বন্ধ করে ছুটছে যাকে তাদের নিঃশব্দ রসুলের লক্ষ্যভেদে বিয় না ঘটায়। কে আবার নিজের উত্তেজনা চাপতে না পেরে বলল, রসুল মার না বঁ, দেবী কবিস কেনে?

রসুল হাতের কাশ্তে ছুঁতে বন্ধ করে ছুটছে এবারও শোয়ালাটা বেঁচে গেল। বেঁচে গেল সাধারণের জন্য। সালমা কথা না বললে তার মনসযোগে বিয় দাঁত না। সালমা শালা কিছু জানে না। জানেই বা কীকরে, বাপকালে কি কোনদিন শিকার করেছে। নিজের মনে খেয়ালি করলে করতে কাশ্তেটা কুড়িয়ে আবার ছুটতে শুরু করল। ততক্ষণে অনার আলম এগিয়ে গেল যে শোয়ালাটার পিছু শিল্প। সবার আগে ছুটছে সালমা।

কি জানি কেন, শোয়ালাটার পেছনে ছুটতে ছুটতে সালমার মনে হল, তার সামনে ছুটছে তার বই মাছুরার নান্দ একরল কানা। গ্রামে একরলের চামড়াটারে হিসাবে খাতি আছে। মাছুরার সাথে একরলের খুব সখ। সালমা নিজে বাড়িতে থাকলেও একরল মাছুরার কাছে আসে। কিন্তু সালমা তাকে কোনদিনই হায়েনতে ধরতে পারেনি। জানেই বা কীকরে, তা রবের কী করে? একদিনই শুধু জানতে পেরেছিল। কিন্তু যোগে এত অক্ষ হয়ে গেছিল যে হাতের কাছে হেয়া-পাসনি কিছু খুঁজ শারনি বলে চুপ করে দেখেছিল তার বটকে পরপক্ষের সোয়াগ করা। শোয়ালাটার পেছনে ছুটতে ছুটতে তার সামনে রূপা ভেসে উঠল তার চেয়েব সামনে। এমন তার হাতে কাশ্তে আছে। আর তার সামনে ছুটছে শুধু শোয়ালাটাই একরল কানা। কিছুতেই তার আঙ্গ নিস্তার নেই।

সালমা ভাবছে, এই সময় মাছুরা যদি তাকে একবে ছুটতে দেখত তাহলে সে আর কোনদিন তাকে মালোভা, লঙ্গভঙ্গ বল না। একরলের ভিত্তে পিত না নিজের কাছে। কিন্তু

সে যখন দেখছে না তখন শোয়ালাটাকে মেরেই দেখাবে মাছুরাকে যে তার খাতি নিমিত্ত না।

শোয়ালাটার পায়ে বিল ধরে আসছে। সে আর ছুটতে পারছে না। তার গতি কমে আসছে। মুখে লেগে-থাকা বরফির কাঁচা রক্ত শুকিয়ে গেছে। চট্টাট করছে। গন্ধ পাচ্ছে না। তার জীবনে এমন হানি কখনও। সে ডা পেল, মৃত্যুভা। তবে কি সে মাইই যাবে?

নিম্ন প্রকাশ হয়ে পড়ছে। চারিদিক স্পষ্ট তু কোণাও একটু কৌণিকভাবে পড়ছে না শোয়ালাটার। খু-খু মাই শুখ। এমন কোনদিকে যাবে সে। হঠাৎ তার চোখে পড়ল, ধূরে অবস্থায় কী একটা। সেটা গ্রামও হতে পারে, কৌণিকভাবে পড়ছে। এদিকে পেছনে দশপায়ে বিপদ এগিয়ে আসছে। তবে কি মৃত্যু আসন্ন? মৃত্যুর কথা মনে হতেই শোয়ালাটা সবকিছু ভুলে সর্বশক্তি দিয়ে নিজের গতি ব্যাঙ্গল।

শোয়ালাটা ছুটছে খুব দ্রুত। ছুটছে চারচারটে পা ফেলে। সালমা তার হাতের কাশ্তেটা ছুঁতে মারতে শোয়ালাটার সঙ্গে আর একটু ব্যবধান মারতে চাইছে। কিন্তু পারছে না। তবু তার জিদ কিছুতেই সে আর শোয়ালাটাকে ছাড়বে না, মারবেই। কিন্তু শোয়ালাটা কোথায় গেল? এই তো এখনি ছুটছিল তার সামনে। সালমার সামনে যেতে শোয়ালাটা হঠাৎ হারিয়ে যায় মায়িকের মতো। চারিদিক ফটফট করছে এমনই যুগ উঠবে। পুরাকাল লালটুকটুক করছে দশপায়েব বর্ধকী মেয়ের চেয়ে মতো। কিন্তু ওদের পাঁচজনের মূখ ময়াকাল। ওরা দাঁড়িয়ে পড়ে একে অপরের মূখ চাওয়া-চাওয়ি করছিল। এবিষয়ে অন্য চারজনের কোন সন্দেহ নেই। সালমা ইচ্ছা করলে অনেক আগেই শোয়ালাটাকে কুশোকাফত করতে পারত। কিন্তু কাননে। সালমা একটা অস্ত্র অহাশ্রয়। যে নিজের বটকে চোখে চোখে রাখতে পারে না সে সত্যিই অহাশ্রয়। কিন্তু একথা তারা ভুলে গিয়েছিল। হট করে শোয়ালাটা হারিয়ে যায় মাঝরা একথা তাদের আবার মনে পড়ল। এবং সফি বলেই ফেলল, যে শালা নিজের বটকে মেরে রাখতে পারে না সে বনের গাছ শোয়ালা দেখে রাখবে কী করে!

সফির কথায় সালমার রাগ হল খুব। হাতের কাশ্তে ছুঁতে সফিরে মেরেই দিত বোধহয়। এমন সময় কুবান আয়কা চিঁকাকের করে উঠল, ওইদারের শালা পাল্লাইছে— শালা যাবে ঘাণাট মেরে বসেছিল— ধর ধর...

সবাই ছুটতে শুরু করল আবার শোয়ালাটার পিছু।

শোয়ালাটা খুব মরিয়া হয়ে ছুটছে। ভুল করে সে গ্রাম ঢুকতে পড়ত একহাজার। আর গ্রামে ঢুকলে তার আঙ্গ নিস্তার ছিল না। ভাগ্যিস বৃদ্ধি করে লাগটিতে ঘাণাট মেরে গিয়েছিল। একে অশা বিপদও হতে পারত। হানি তা ভাগ্যের শালা পাল্লাইছে। এতে এই মুক্তিপদ দাদ শেত কি? এখন আর ছুটতে কোন অসুবিধা নেই। এ

যাত্রা হাত সে বেঁচেই যাবে। পেছনে দশপায়ে ছুটে আসা বিপদ অনেকটা শিথিয়ে পড়ছে। কিন্তু এক কোন্ দিকে ছুটছে সে? এদিকের যে গ্রাম!

সফি আর কুবান পাশাপাশি ছুটছে। শোয়ালাটা যাতে আর ডানে-বোঁয়ে রীক নিয়ে তাদেরকে বোকা বানাতে না পারে। একজনকে ধাক্কা দিয়ে অন্য জন যেন তার নাগাল পায়। দু'জনের উদ্দেশ্য এক— শোয়ালাটাকে মারা। যদিও এই উদ্দেশ্যের পেছনে রাগ জ্বালা। সফি মনে করছে, শোয়ালাটা চির তাদের গ্রামের সাজ্জাদ সেয়েম মতোই। শূঁট। সাজ্জাদ যেল সনে তার লোকের কাটা জমি হাতিয়ে নিয়েছে। কে জানত যে, সাজ্জাদ নিজের বটোর সঙ্গে তার বিটির বিয়ের সম্বন্ধ রচনা করে এমন ষড়যন্ত্র রচনা করবে! না হলে কি তার বিটির বিয়ে দিয়ে জমিটুকু হারিয়ে বিটিকে আশের ঘরে ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হত? হত না। সেই অপমান এখনও ধূরে ধূরে খাষ তাকে। মজলিস ভর্তি লোকের সামনে তার বিটিকে কলঙ্কিনী সাজিয়েছিল সাজ্জাদ। সাজ্জাদকে সে কিছুতেই ভুলতে পারবে না। ভুলতে পারে না জমিটুকুর কথাও। তাইতো শোয়ালাটাকে মারবার জন্য সে ছুটছে। শোয়ালাটা একইসঙ্গে তার কাছে অপমান এবং সাজ্জাদ। শোয়ালাটাকে মারতে মারতে হাত সে তার অপমানকেই মেরে ফেলবে। তখন আর সাজ্জাদের কথা মনে আসবে না তার। আর কুবান ছুটছে তার কুবানীর খামির দুরগে। সে খামিটা সে বছর শোয়ালাবের হাতে মারা পড়েছিল মারত চলেই গিয়ে। তার না যোয়ার নামে ছিল খামিটা। তার এই খামি শোয়ালা শোয়ালা উপর যোয়ারকি করেছিল। শালাল শেটে দেখাখ ছলে উঠেছিল। সেই দেখাখ নেভাতে কুবান দাঁতে দাঁত চিপে ছুটছে শোয়ালাটা পিছু পিছু।

গ্রাম নয়, যেন মৃত্যু দেখছে শিমালাটা। ঘাণাট মেরে দিক পরিবর্তন করতে ভুলে গেল সে। আসলে গ্রামেরে এত কাছাকাছি চলে এসেছে যে সেখান থেকে ফিরবার পথ নেই। অথচ হাতেরে তখনকে এই গ্রামগুলি তাকে বেঁচে থাকার আনন্দ জুটিয়েছে। অতএব কি দিনের আগেই ভয়দর? না হলে পেছনে ছুটতে আসা দশপায়েব বিপদের শাস-প্রশাস শুনে তার এত ভয় করতে কেন? শাস-প্রশাস নয়, এমন মৃত্যুর হলকা। অথচ যথায় যাক মানুষের শাস-প্রশাস রাতেরে বন্ধকরণ যখন সে বরুণি-ভেড়া চিরে ধরতে যায় তখন অনারকর লেগেছে। সেই শাস-প্রশাস তাকে সাহায্য জুটিয়েছে।

এর মধ্যে শোয়ালা টুক পড়েছে গ্রামের রাস্তায়। তার পেছনে এখন দশ নয়, একশো শায়ের বিপদ। একশো না— যেন একহাজার। শোয়ালাটা আর শারল না, রাস্তার ধারে একটা পুতুল, লোকে বলে সামনে সেয়েম পুতুলনী, সেখানেই নেমে পড়ল।

তার গলা শুকিয়ে গেছিল। একটু জলের জন্য নেমেছিল সে। কিংবা ভয়ে। কিন্তু পুতুলে জল নেই। সবই কমা। কমা বলেই ভয়। কাদায় নেমে তার মনে হল, এই কদাকে সে জল মনে করল কী ভাবে? তবে কি সজি তার মৃত্যু আসন্ন? চারিদিকে তাকিয়ে দেখল শোয়ালাটা তার মতোই সখ জ্যাও মানুষজন দাঁড়িয়ে আছে পাড়ে। কিন্তু তাদের কারও হাত খালি নেই। লাঠি-সড়কি, হেয়া-পাসনি, কাশ্তে, তীর-ধনুক, ষ্ট-পাটকেল— যে যা পেরেছে তাই নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সবার। শোয়ালাটা খুব ভয় পেলে। এমনই ভয় যে ছুটে পালাতে মনে ওয়ব মানুষদের মধ্য দিয়ে। কিন্তু মানুষ তো একটা নয়, প্রহরা। একজননের হাতে তার লেজ আটকে গেল, একজনকে কাছে পেছনেন দা, মাথা— এভাবে সম্পূর্ণরূপে সে যখন দূর পাড়ে গেল, আর আবার বেরিয়ে চোঁই করল না। সে মেরে গেল। এবং তাকে ফেলে দেওয়া হল সামনে সেয়েম পুতুলশীল কাদার মধ্যে। আর তার ওপর পড়তে লাগল ষ্ট-পাটকেল। দু-একটা তীরও ছুটে বিধে গেল তার শরীরে। নিম্নেই সে টুকে গেল কাদায়। তারপর আর তার অন্তিম আলাদা করা গেল না কাদার সঙ্গে। শুধু শরীরে বিধ-থাকা দু-চারটে তীর একটু-আমুট জেগে বইল কাদার উপরে।

তারও অনেক পরে দু'জন হা-হায়েতে মানুষ যখন শোয়ালাটাকে কাদামতো তুলে আনল ডায়াম, তখন আর তাকে শোয়ালা বলে চেনা গেল না। তখন সবার মনে দুঃখ হল। দুঃখ হল, অন্যরকম একটা প্রশ্নের অশয় দেখে। এমন নয় যে এই শোয়ালাটাই একদমের পুখিরীল সব অনিষ্ট করে দেবেছিল, মৃত্যুর পর আর কোন অনিষ্ট হবে না কারও। সবই তো যেনকনার ভয়েই চলবে। এদের মতোই একজন, যে এদের সবার চাইতে একটু বেশি ভাবতে পারে বলে গ্রামের মোয়েল, এই পুতুলটির বর্তমান মালিক সে। পুতুলটি আগে ছিল সামনে সেয়েম। সেয়েম দেখে দেখে শির শিরাতির মতো সে যেন আতঙ্ক বেঁচে আছে। গ্রামের মোয়েল হয়ে লোকটা তা সহ্য করতে পারে না। তার মনে হল, এটাই সুযোগ, সামনে সেয়েমের নাট্যই মুছে দেয়ায়। তাই সে বন্ধ না, তাই সলল, শোয়ালাটা যখন এখানেই মরল, এর করবটও এখানে হোক। আর এই পুতুলটির নাম আজ থেকে হোক শোয়ালা-মারা পুতুলনী। কী বলিস তোরা?

কে কী বলবে? পুতুলের মালিক যখন এই কথা বলছে তখন কার কী খামতি থাকতে পারে। তাই সবাই হে হে করে সম্মতি জানাল। মোয়েলের বুদ্ধি প্রশংসার কলং কেউ কেউ। আর লোকটাও সমস্ত হয়ে বাক্সা বিরোধ করল সবার মধ্যে। মজুরির বন্ধে সেই বাক্সা নিয়ে বাড়ি ফিরল হামির, রূপল, সালমা, সাতী, কুবানারা। তারা আজ গম কাটেনি বলে মজুরি শাখনি।

বিশ্বকর্মার বংশধরেরা

বেণু ওহঠাকুরতা

শ্রীমতী মীরা মুখোপাধ্যায়ের 'বিশ্বকর্মার সন্ধান' একটি নতুন স্বাক্ষরে বই। এর বিষয়বস্তুকে কোন ইতিহাসের পাতায় যুক্ত পাওয়া যাবে না। এর নব্যকল্পে যুক্তিতে হলে চলে যেতে হবে সভ্যতার শুকনো। লেখিকা এতজন শুরু করেছিলেন নিঃশেষই অজ্ঞাস্তে। যা মীরাই হয়ে রূপ পেয়েছে নিজের অভিজ্ঞতা ও সময়ের সাথে সাথে।

লেখিকা শিল্পী, তাই বিশ্বকর্মার ও তার সন্তানদের প্রতি তার সহানুভূতি অপরিসীম। এই অমৃতের সন্তানদেরা, যারা অমৃতের সন্ধানে সুর-অসুরের লড়াই-এর অশীশার আবার যারা সুর অথবা দেবতাদের আশ্রিতে অনায়াসে দলিত, তাদের আত্মাকেই লেখিকা ভিত্তি বেড়িয়েছেন ভারতবর্ষের দূর-রাষ্ট্রের শিল্পকর্মের মধ্যে। তিনি তাদের আঁকার করেছেন ইলারার গুহাচিত্র ও মূর্তিতে, স্থিতি ও লাহলহের বৌদ্ধ গুপ্ফায়।

এই বিশ্বকর্মার সন্তানরা ছড়িয়ে আছেন সমস্ত ভারতবর্ষে। বাংলার বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, মুর্শিদাবাদে, বীরভূমে আবার উড়িষ্যার বালেশ্বরে, আদিবাসী প্রধান উমেরগটে ও বস্তারে। এরা ছড়িয়ে আছে কামাখ্যায়, বেনারসে, এলাহাবাদে—কোথায় নর। যেখানেই শিল্প, সেখানেই বিশ্বকর্মার। এদের কোন কাজ নেই। তাই চণ্ডিশূরের শেষ মূল্যেমনকে তিনি বলতে শোনে, তাদেরও বিশ্বকর্মার পূজা আছে। সেসময় এরা ফাঁত্যা করেন। কোরান পাঠ হয়। পুরাণের গুঁড়ো, যু-কলা মিশিয়ে কাঁচা সিলি প্রসাদ হয়। ছেলেরপুত্রকে ভাগ করে তিনি ভগবান সত্যশীলকে ভেঙে সলভেবে ভাল মনেতে অনুবোধ করা হয়। নিরামিম রান্না করা হয় সেদিন। কোন কাজ হয় না' (পৃঃ ২৭)।

আবার 'বর্জ্যমানে দীর্ঘ মহম্মদ আসী আমায় মহাদেব সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলছিলেন, যখন-যখনই মনে পড়ে নতুন পদ্যগণের এক লোক ছিলেন। নূরুল কাদের একটা জোড়িসে দুই ক্রিশ্ন চিহ্ন ছিল, তার আর এক নাম ছিল মহাকাল, তার থেকে মহাকাল। সেখান থেকে কালের গতিতে তা মহাদেবে পরিণত হয়' (পৃঃ ৩২)।

একইভাবে এলাহাবাদের বিদ্যেশ্বরী প্রসাদ বিশ্বকর্মার কাছে সুন্যতে পান, 'রাবণ বিশ্বকর্মার ছিলেন এবং ভারতবর্ষের সমস্ত প্রতিমাত্র ত্রী বিশ্বকর্মার নির্মাণ করেছেন' (পৃঃ ৩০)। তারকাগণের গিয়ে ন্যূনত পান এখানে একজন অসুর বা দানব ছিলেন। তিনিই মন্দির নির্মাণ করেন ও শব্দ প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু নির্মাণের কাজ শেষ হলে বিষ্ণু বা ওদানকার রাজারা তাঁকে হত্যা করেন। (পৃঃ ৩৫)

মুম্বাইর শরীফের আবদুল মাটলে। তিনি মানিক শীরের গান করেন, তিনি লেখিকাকে বলেন—বিশ্বকর্মার তারার যারা আজমীর শরীফে এলেন। মক্কা থেকে গিরানশীর হজ করলেন, সেখান থেকে এসে বঙ্গদেশে। এখানে তাঁর সঙ্গে সত্যশীলের দেখা হলো। সত্যশীর তাঁকে গাছীবাবার কাছে নিয়ে গিয়ে এরপর সত্যশীলের নাম প্রচার করতে বললেন। বললেন, দেশে দেশের ঘুরে ঘুরে ওড়ানোর প্রচলন ঘটাতে। বিশ্বকর্মার সে সময় পাণ্ডালের মক্কা দেশে দেশের ঘুরে ঘুরে ওড়ানো দেখাতে শুরু করেন। কাদের তারকাদের, সবকথা মহাদেবে জানালেন, ইত্যাশী। এই সমস্ত গল্পে শীর, গাছী, শিব, বুদ্ধ, বিশ্বকর্মার সব এক হয়ে গিয়েছেন। (পৃঃ ২৯)

শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়ের লেখার এটাই মূল সুর। এখানে বিশ্বকর্মার সন্তানরা যুগ যুগ ধরে বেঁচে আছে হিন্দু-মুসলমানের অন্তরে তার লোককথা লোকগীতি ও নানা গল্পের মাধ্যমে। ধর্ম এখানে বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে সত্য। সে সৃষ্টির মূলে আছে অসুরের সন্তান বিশ্বকর্মার বংশধরেরা, দেবতারা ন।

বিশ্বকর্মার মূলত শিল্পী, তাঁর শিল্পকলা ছড়িয়ে আছে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে। যে সন্ধান তিনি শুরু করেছিলেন তাকে পরবর্তীকালের হারাতরাহী আরও সার্থকতার পথে নিয়ে যাবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন। এই বই-এর আরেকটি অলঙ্কার শ্রীমতী মুখোপাধ্যায় অঙ্কিত অসংখ্য ছবি যা শিল্পীমনা পাঠককে আনন্দ দেবে।

বিশ্বকর্মার সন্ধান — মীরা মুখোপাধ্যায়/পরিবেশক- চ্যাম্পু, কলকাতা- ৭২/৩০ টাকা

উপন্যাসের সমাজবীক্ষণ

শ্যামল রায়

গতানুগতিক পদ্ধতিতে উপন্যাসের আখ্যান, অলঙ্কার, চরিত্রসমূহ, বিচার-বিশ্লেষণের দিকে না গিয়ে পার্থক্যবিশিষ্ট বন্দ্যোপাধ্যায় সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের উপর জোর দিয়ে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে উপন্যাস সমালোচনায় আত্মনিয়ন্ত্রণ করে তাঁর রচনায়। গ্রন্থে খেচর দক্ষতার পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছেন। ব্যাচনাস দার্শনিক, সমাজবিজ্ঞানী, নৃতত্ত্ববিদ ও উপন্যাস-সমালোচকদের যুগান্তসূচক মন্তব্যের সমন রেখে তিনি যেভাবে উপন্যাস সমালোচনায় ব্যাপ্ত হয়েছেন তার ফলে একমিলিত মেঘের প্রকাশ সমাজবীক্ষার দিকটি পুষ্ট হয়ে উঠেছে, অন্যদিকে তেমনই তার রসগ্রাহিতার কথাও অস্বীকার করা যায় না।

'উপন্যাসের সমাজতত্ত্ব' গ্রন্থে তিনি সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র এই ত্রী প্রতী

উপন্যাসিকের উপন্যাসগুলি বিশ্লেষণ করে দেখাতে চেয়েছেন। সাধারণের অন্যান্য শাখার তুলনায় উপন্যাস অন্তর্ভুক্ত আধুনিক কালের সৃষ্টি। সমাজ ও ইতিহাস সম্পর্কে সুশিখরিত বোঝা থেকে মূলত উপন্যাসের সৃষ্টি। তাই সমাজ ও ইতিহাস থেকে উপন্যাসকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা সম্ভব নয়। উপন্যাসের বর্ণিত কাহিনীর সঙ্গে উপন্যাসিকের জীবনচরিত্র ও তাকে প্রকাশ করার জন্য উপযুক্ত রূপবস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়। এই জীবনচরিত্র ও রূপবস্তুর সঙ্গে উপন্যাসিকের সাক্ষাৎ সমাজজীবনের একটা নিযুক্ত সম্পর্ক লক্ষ করা যায়। উপন্যাসিক একটা বিশেষ শ্রেণীর প্রতিনিধি বলতে পারেন। তাই সামাজিক ভাষ্যগত বা ইতিহাসের উপান-ওড়নে উপন্যাসে উপন্যাসিকের শ্রেণী-চেতনায় আভাসিত হয়ে ওঠে। বাস্তব জগতের ঘটনাবলীকে অবলম্বন করে উপন্যাসিক তাকে তাৎপর্যপূর্ণ শিল্পরূপে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। পার্থক্যবিশিষ্ট মূল্যে করেন, মহৎ তাৎপর্যপূর্ণ উপন্যাসে একটি প্রতিনিধি করে থাকেন। তবে এই সভ্যগত উৎকর্ষের পাশাপাশি নানা ভিত্তি যাদের উপাদানও থাকে। উপন্যাস আলোচনায় এই কেন্দ্রীয় কথা থেকে এরপর পৃথক করাই সমাজতাত্ত্বিক আলোচকের প্রথম কাজ। পার্থক্যবিশিষ্ট জানেন যে, উপন্যাসের স্ট্রাকচারের মধ্যে সুব্যবস্থা ও অব্যবস্থা দুটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষ্যগত ভাষ্যবাদের সাহায্যে উপন্যাসিক সমাজতাত্ত্বিকতার সুযোগ গ্রহণ করলেও গ্রহণ বর্জন প্রতিরোধ মাধ্যম দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য তাকে যেখানে নীরব হতে দেখা যায় তার মধ্যে পাওয়া যায় অব্যবস্থার স্তরের সন্ধান। উপন্যাসের মধ্যে বর্ণিত বিষয়ের মতো বর্ণিত বা অকথিত বিষয়ও সন্ধান গ্রহণকৃত। উপন্যাস যেহেতু বর্ণনামূলক আয়ের মধ্যে মধ্যবিত্তের শিল্পকর্ম, তাই মধ্যবিত্ত শ্রেণী চেতনায় উপন্যাসের স্ট্রাকচার নির্মিত হয় বলে তার মধ্যে সুব্যবস্থা ও অব্যবস্থা দুটি স্তরেরই সন্ধান পাওয়া যায়। তাই উপন্যাসের সমালোচনা করতে গিয়ে সমালোচকের এসব বিষয়ে সচেতন থাকা প্রয়োজন বলে পার্থক্যবিশিষ্ট মূল্যে করেছেন এবং তাঁর সমালোচনা এই পথ ধরে এগিয়ে গিয়েছেন। গ্রন্থটির শুরুতে উপন্যাসের সমাজতাত্ত্বিক আলোচনার একটি সফিক্ত রূপরেখা প্রণয়নের পর উপন্যাসের দৃষ্টিকোণ : বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, চরৎচন্দ্র, গদ্যবাহিনী, শরৎচন্দ্রের ভাবদর্শন : বাবুদের মেয়ে, উপন্যাসের উপন্যাস : গৃহস্থ ইত্যাদি নানা অধ্যায়ে লেখক তার বক্তব্য বিষয়কে স্পষ্ট করে তোলার চেষ্টা করেছেন। আর্থ-সামাজিক পটভূমির উপর উপন্যাসের আখ্যানগতিকে দাঁড় করিয়ে তিনি উপন্যাসিকের দৃষ্টিকোণকে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন। ঘটনার উপন্যাসিক বর্ণনা, ভাষারীতি সবকিছুকে তিনি উপন্যাসের স্ট্রাকচারের মধ্যে এনে উপন্যাসিকের শক্তি ও সীমাবদ্ধতার দিকটি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

মান্য সমালোচক সন্নয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি সফিক্ত অথচ যুবদান ভুক্তি দিয়ে শুরু হয়েছে 'সমবেশ বসু : সমবেশ চিহ্ন'

গ্রন্থটি। আলোচ্য গ্রন্থের সৃষ্টিতে রয়েছে 'সমবেশবাসু' ও একজন পাঠক' শীর্ষক একটি প্রস্তাবনা অংশ। তারপর লেখক সমবেশ বসুর 'উত্তরদ', 'বি.টি. রোডের ঘরে', 'হিটলারের কাছাকাছি', 'সওদাগর', 'গঙ্গা', 'বিবর', 'টানাগোড়েন' উপন্যাসের বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। সমবেশ বসুর ছোটগল্প সম্পর্কেও একটি আলোচনা এই গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে। সমবেশ বসুর সাহিত্যজীবন ১৯৪৬ থেকে ১৯৮৮ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই সময়টিকে তিনি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আশা-আকাঙ্ক্ষা, নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ও ব্যর্থতার ইতিহাস বলে উল্লেখ করেছেন। দুর্ভিক্ষ, দাশ, শ্রেণিভেদ, দেশের স্বাধীনতা থেকে নানা বাস্তবীক আন্দোলনের মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মূল্যবোধহীনতা ও চরিত্রহীনতার প্রতিবাদ কীভাবে সমবেশ বসুর উপন্যাসে ধরা পড়েছে তা লেখক দেখাতে চেয়েছেন। প্রাসঙ্গিকভাবে তিনি সমবেশ বসুর উপন্যাসিক ব্যক্তিত্বের মধ্যেও যে খ-বিবাদের পরিচয় পাওয়া যায় তা উল্লেখ করেছেন। এক বৃহৎ সংবাদপত্র গোষ্ঠীর ছত্রছায়ায় থেকেও পাত অংশে স্বেচ্ছা সমবেশ বসুর উপন্যাসিক প্রতিভা যে একেবারে নিঃশব্দ হয়ে যাবারি তার প্রথম হিসাবে পার্থক্যবিশিষ্ট সমবেশ বসুর অসম্পূর্ণ উপন্যাস 'দেবি বি-এর' দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছেন। লোক-জীবনের প্রতি সমবেশ বসুর আগ্রহ, উপন্যাসে পুরান-প্রতিমার ব্যবহার, লোকভাষা ইত্যাদির ক্ষেত্রে সমবেশ বসুর অসামান্য দক্ষতার নির্দিশ হিসাবে তিনি 'সওদাগর', 'গঙ্গা', 'টানাগোড়েন' ইত্যাদি উপন্যাসের কথা মনে করিয়ে দেন। সমাজ-সচেতন, জীবন-সচেতন উপন্যাসিক সমবেশ বসুর ইতিহাসভিত্তিক দিকটি উপন্যাস, 'শ্রীমতী কায়', 'মহাকালের রথের ঘোড়া' ও 'সুন্দরী'-য় রাজনৈতিক চেতনার সঙ্গে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। আমাদের সামাজিক রাজনৈতিক ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায় সমবেশ বসুর উপন্যাসে কীভাবে ভাষ্যবাস্তব পেয়েছে তার পরিচয় পাওয়া যায় 'সমবেশ বসু : সমবেশ চিহ্ন' গ্রন্থটিতে।

'উপন্যাস রাজনৈতিক' গ্রন্থের শুরুতে লেখক জানিয়ে দিয়েছেন যে, রাজনীতির মূল আছে ক্ষমতা দখল আর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লড়াই। তা যখন ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থের বিরুদ্ধে তখন তা অন্তত ও মারাত্মক। কিন্তু যখন তা সাংঘাতিক বিপ্লব ও ভাষ্যবাস্তব মানুষের স্বার্থে ব্যর্থ হয় তখন তা শুভ। রাজনীতির প্রকৃতি হিসাবে পর লেখক উপন্যাসের প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন উপন্যাস শুধু ঘটনার বিবরণ নয়, তার মধ্যে ব্যক্তির বৃহত্তর প্রসঙ্গ বিশেষ বা নির্দিষ্ট রূপে ধরা পড়ে। প্রসঙ্গত তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, রাজনৈতিক উপন্যাসের কনসেপ্ট, দোকান-নিরপেক্ষ ভাষা থাকতে পারে না। কেননা, লেখক-লেখক শাস্ত্রী থেকে রাজনীতি শব্দটি ইউরোপীয় দেশগুলিতে যেভাবে ব্যবহৃত হয়েছে এশিয়া-আফ্রিকার পটভূমিতে সেই ধরণকে সম্পর্কিত মনে নেওয়া যায় না।

সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশিক শক্তির নির্মম শোষণে ভারতবর্ষ তথা বাংলার ট্রাঙ্কেটির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসগুলিকে নতুন ভাবে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। উনিশ শতকে আমাদের দেশের চিন্তাবিদেবরা রাজনীতি চেয়ে সামাজিক সম্বন্ধ নিয়ে বিশেষভাবে ভাবিত ছিলেন। তাঁই শাসন-কমতার হস্তান্তরে চেয়ে সামাজিক কল্যাণই তাঁদের কাছে প্রাধান্য পেয়েছিল। জেজনা উপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ-সংস্কৃতির প্রবাহন ধারার সঙ্গে মিশিয়ে তিনি বহিঃমন্ত্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের রাজনৈতিক বিচার-বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন। লেখক যখনই, 'রবীন্দ্রনাথের 'খেরেবাইয়ের' ও 'চারঅধ্যায়' বা শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'-কে রাজনৈতিক উপন্যাস বলা যায় না। উপন্যাসিক হিসাবে রবীন্দ্রনাথ 'খেরেবাইয়ের' ও 'চারঅধ্যায়'-কে রাজনৈতিক উপন্যাস বলে দাবী করেননি। উপন্যাস দুটির পটভূমিতে রাজনৈতিক আন্দোলন যুক্ত হওয়ায় উপন্যাসে রাজনীতির গন্ধ লেগেছে। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' উপন্যাসের উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণাভা যতাননি রাজনৈতিক ছাপ ফেলেছে বরং উপন্যাসটি ততখানি রাজনৈতিক নয় এবং রাজনৈতিক চেতনের দৃষ্টিতে যে উপন্যাসিক শরৎচন্দ্র নিজেকে সংশ্লিষ্টাঙ্ক ছিলেন তা সচেতন পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। গ্রন্থটিতে বহিঃমন্ত্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের তথাকথিত রাজনৈতিক উপন্যাসগুলির মধ্য থেকে লেখক সাধারণভাবে উপনিবেশিক, সাম্রাজ্যবাদী শাসনের পরিপ্রেক্ষিতে উপন্যাসিকদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংসারণিক দৃষ্টিকোণকে স্পষ্ট করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন।

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে জসমাজের নির্মাণ ও ভাঙনের চিত্র অধ্যয়নের মধ্যে পার্শ্বপ্রতিমাণ্ডা যেভাবে রাজনৈতিক উপন্যাসের সমাজকে প্রসারিত করে দিয়েছেন 'উপন্যাস রাজনৈতিক বিপ্লবিত্ব'দের দেশের আলোচনাও সেই পথ ধরে এগিয়ে গিয়েছে। উপনিবেশিক শাসনের প্রত্যাঘাত লাগিত অভিজাত শ্রেণীর জীবনান্ধার কৃতঘনভাৱে পাশাপাশি গ্রামীণ ক্রীষাণ্যায়ের সরলতা ও গ্রামীণ জীবনের মূল্যবোধগুলির উপর নাগরিক জীবনের নির্মম আঘাত কীভাবে গ্রামীণজীবনের অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দিয়েছে আলোচনাও প্রেমচাঁদ চন্দ্রসেনের বিশ্লেষণ করেছেন। গল্পের প্রথম অধ্যায়ে 'দুইবড়ী', 'বিশিদের সংসার', 'অনুর্ভব', 'অশনিমুক্তক' উপন্যাসের আলোচনা রয়েছে। 'পথের দাবী', 'আরাক' ও 'ইছান্দি'র জন্য লুপ্ত তিনটি অধ্যায় গ্রন্থে সংযুক্ত হয়েছে। আলোচনা এগিয়ে গিয়েছে লেখকের হক-বাঁধা রাষ্ট্রা হায়ে।

'দুইবড়ী' উপন্যাসে বিপ্লবিত্বগুণ উপনিবেশিক সামাজিক ব্যবস্থার পটভূমিতে আইনজীবির জগৎ কীভাবে গড়ে তুলেছেন তা আলোচনা গ্রন্থে দেখানো হয়েছে। বিশিদের সংসারে হাড়তুড় ভাঙার বিশদ চরিত্রে দেখে গ্রামীণ সমাজের প্রেক্ষাপটে সামাজিক

মূল্যবোধের দিকটি লেখকের দৃষ্টিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের সৃষ্ট ভূতিল্পের অভিযোজিত তীব্রতায় গ্রামীণ সমাজের শোচনীয়তার রূপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে 'অশনি সংকেত' উপন্যাসের আলোচনায়। 'পথের পাঁচালী' ও 'আরাক' উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে বিপ্লবিত্বগুণের গভীর অর্থব্যবস্পূর্ণ আনুগত্য ইতিহাসবীকার কথা বলা হয়েছে। 'পথের পাঁচালী'-কে পার্শ্বপ্রতিমাণ্ডা প্রকৃতিগ্রেসের উপন্যাস বলতে চাননি, একটি পরিবারের অস্তিত্ব রক্ষার কাহিনী তারা বড় বড় বলে মনে হয়েছে। কিন্তু উপন্যাসের আখ্যানসূত্র 'যত শেখের দিকে এগিয়েছে ততই প্রকৃতি এসেছে।' প্রকৃতি এই ক্রমবর্ধমান ভূমিকার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'সামগ্রিক উপেক্ষিত গাছ-ফুল-ফলের মতই এই সামগ্রিক মানুষের জীবন, তারা চূড়ান্ত ধরনের প্রক্রিয়ায়ও মরে না।' প্রকৃতি কোনও বিচ্ছিন্ন সত্তা নয়— মানুষের জীবনের সঙ্গে যে একসূত্রে গ্রন্থিত তা তিনি আমাদের বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন। পরিবেশগত ভাঙ্গামার ভাঙ্গা বিপ্লবিত্বগুণের একান্তই আগ্রহের সঙ্গে মানুষের আত্মজীবনের সমগ্র কীভাবে প্রকৃতির হয়ে আরম্ভের কাহিনী গড়ে উঠেছে তা উপন্যাসের আলোচনাসূত্রে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'ইছান্দি' উপন্যাসের আলোচনায় পার্শ্বপ্রতিমাণ্ডা ইতিহাসের গভীর স্তরের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। রাজনৈতিক উপন্যাসের আলোচনায় পার্শ্বপ্রতিমাণ্ডা বিশেষ কোনও রাজনৈতিক দর্শন বা রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রাধান্য দেননি, বরং অর্থ সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের আংশীয়ম বোধের নেপথ্যে যে রাজনীতি অঙ্গীকার তাকে তিনি আলোচনা করেছেন মেনে এনে সঙ্গে, সমাজ ও মানুষকে নতুনভাবে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন।

পার্শ্বপ্রতিমাণ্ডার বক্তব্য বিষয়ে অভিনবত্বের পরিচয় থাকলেও আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য অভিজিত প্রেমচাঁদ চিত্রায়িত্বের সাহায্য নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। যার ফলে তাঁর লেখক ও দৃষ্টিভঙ্গির অনেকাংশ অনুসরণসর্ব্বই হয়ে উঠেছে। 'পথের অর্থ ভঙ্গি', 'উপন্যাসের ট্রেস', 'বিল্যেবল ন্যায়ের' ইত্যাদি শব্দের প্রতি বেখবকের দ্বন্দ্বতা এত প্রবল যে তাঁর সব বইয়ে কণাগুলি বারবার ঘুরে ঘিরে আসে। বিভিন্ন সমাজতত্ত্ববিদ ও দার্শনিকের উদ্ধৃতিতে আলোচনা অত্যন্ত ভাৱাঙ্কণ হয়ে উঠেছে। পার্শ্বপ্রতিমাণ্ডার চিন্তা করার আলাচনা আছে, বিশ্লেষণের কৌশলও তাঁর অজানা নয়, কিন্তু অনাকে আঁকড়ে ধরতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে তিনি পদনির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন। তবে তাঁর লেখা বইগুলি যে পাঠকের নতুনভাবে ভাবতে সাহায্য করবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

উপন্যাসের সমাজতত্ত্ব — পার্শ্বপ্রতিমাণ্ডা বন্দ্যোপাধ্যায়/মৌসুমী প্রকাশনী/১০ টাকা
সম্পদেণ বসু : সময়ের চিহ্ন — পার্শ্বপ্রতিমাণ্ডা বন্দ্যোপাধ্যায় /

পার্শ্বপ্রতিমাণ্ডা/২০ টাকা

উপন্যাস রাজনৈতিক — পার্শ্বপ্রতিমাণ্ডা বন্দ্যোপাধ্যায়/রাজিকাল ইন্ডিয়ান/৪০ টাকা

উপন্যাস রাজনৈতিক বিপ্লবিত্বগুণ — পার্শ্বপ্রতিমাণ্ডা বন্দ্যোপাধ্যায়/রাজিকাল ইন্ডিয়ান/২৫ টাকা

আজকালের হেটগল্পের মেজাজমর্জি

শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায়

কবিভার পরেই বাংলা সাহিত্য যে ক্ষেত্রে তুলনাতীতভাবে মসল, বিস্তীর্ণকোণে প্রকৃতিভিত্তি, তা নাটক বা প্রবন্ধ নয়, এমনকি উপন্যাসও নয়— তা হেটগল্প। একটি শতাব্দীর গোয়ালিগুণে পৌঁছে যদি শেখের ঘরে তাই, ফণকালের জেনেও যদি ভাবি, বাংলা সাহিত্যের ভাঙার থেকে শাশ্বতকালের ভাঙার কাত্তিই রত্নসমৃদ্ধি আছে, তাহলে অতীত গর্বের সঙ্গে হেটগল্পের কথা দাবী করা যেতে পারে। বাংলা হেটগল্পের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক এখানেই যে তা চিরকাল অস্ত্রভাৱে বিচিত্রতাময়ী হওয়া সত্ত্বেও অবচিহ্নিতকালে নিজে 'ছল্ল' বজায় রেখেছে। রবীন্দ্রনাথ থেকে যে অভিজাতের দুরন্ত সূচনা, তা শরৎচন্দ্র-গ্রন্থাবলী পর্যন্ত অতিক্রম করে, অভিজাত-নৃসিংহ-প্রেমের, বনলল-নাগেশ-পদমিনী, সুবর্ণা-নরেন্দ্রকান্ত, জোতিরঙ্গ, বিমল-সুন্দর-রমাশ্রম পদমিনী-দীর্ঘমেয়-মতি অবধি তাত অধ্যায়, যত পর্নায়, যত স্তবের মধ্যে নিজে প্রবাহিত হয়ে এসেছে, তার ওপর এক বিবিস্তরী নিষ্ফল কলসে একটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সর্বশেষেই বাংলা হেটগল্পকারের কাহিনীর বিষয় ও ভঙ্গি 'স্বাধা' 'কনসেট' এবং 'ফর্ম'— এই দুইয়ের মধ্যে এক সামঞ্জস্য রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছেন। কাজটি নিঃসন্দেহে কঠিন, কিন্তু এই কঠিন কাজটি হয়ে তারা সাফল্যের সঙ্গে বাস্তবায়িত করেছেন, এটাও সন্দেহহীন।

এতলল পার্শ্ব বাংলা হেটগল্প যে সর্বশেষে গৃহীত হয়ে আসছিল, হয়ে আসছে আন্দোলন ও নবিতা, এর স্রোতে এটাই সবচেয়ে বড় কণা। খুব বেশিদিন আগের কথা নয়, যখন বাজার-চলতি নানী ব্যবসায়িক প্রক্রিকাগুলো পল্লভ পল্লভাৱিকীতে কথাসাহিত্যে বিভাগে শুধুই হেটগল্প ছাপানোর ভাৱা শেতে (এই সময়কার কথা বলছি তখনও বহুরে মরুমুখি চাষের মতো উপন্যাস লেখার হিতিক এটেনি), সাধারণ পাঠকের বুকেমুখে মৃত্যু একাকী লেখকের শোষণে গল্পের কথাও, বইশাড়ার প্রকাশকাল উৎসাহী এবং স্বস্ত্যগৃহভিত্তি উদ্যোগী ছিলেন গল্পসংকলন প্রকাশের ব্যাপারে। কিন্তু আজকের ছবি অনেকটাই আলাদা। একজন প্রকাশক আজ কোনও গল্পসংকলন প্রকাশ করার আগে

একাধিকবার অগ্রপঞ্চাৎ বিশ্লেষণ করেন (লেখক প্রখ্যাত হলেও), কোনও বাজার-চলতি ব্যবসায়িক পত্রিকা সম্পাদক কল্পনও করতে শানেন না শুধুই হেটগল্পের ওপর ভরসা করে পল্লভাৱিকী কোনও জাহাজটিকে অঙ্কল সাগরে ভাসানোর কথা। আর পাঠককূল? সাংপ্রতিককালের ক'টি গল্প তাঁরা পড়েন, এমনকি ক'জন গল্পকারের নাম জানেন— একজন গল্পের সূত্রের অনেকটাই জ্ঞোর গল্পায় দিতে পারেন না। এর কারণ যদি শুধুমাত্র উপন্যাসের প্রগ্রামী গল্পিক, গিনোনা-গিডি ইত্যাদি বিনোদনের আকর্ষণ বলে ঠাওরাই, তবে কিন্তু একটা বড় রকমের ভুল করা হবে। এর জন্য অনেকাংশেই দাবী আজকের হেটগল্পকারের মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি। বর্তমান কালের এক খাতানামা সমাদোচক যেভাবে স্ববাদপত্রের পাঠ্যে 'রিভিউ' করতে বসে অনাস্যসে বলে দেন, 'গোল গল্পের দিন মুরিয়েছে', সেই একইভাবে আজ বেশিরভাগ গল্পকারেরই লিখতে বসে মনে হয়, 'পাঠিকা-নিরীক্ষা'-র কথা। এবং তা করতে গিয়ে কাহিনী ও প্রয়োগকৌশলের মন্যভাবের মিলিত করার বদলে তাঁরা হয় সিরিসর্ষ হয়ে এটেনি, নাহোতা কাহিনীর 'পড়িয়ে ঢেকান' হয়ে, গিরিতের 'মানসবিক বিশ্লেষণের' নানী-নিরী-বিমুখ হয়ে এটেনি। সেই খাতানামা সমাদোচকের মতোই তাঁরা একথা ভুলে যান যে, 'গোল গল্প' লেখা সানা পুষ্টায় শুধু শেনসিগ বিস্ময় একটি নিম্বুত গোল আঁকার মতোই অতীত দুরাং হায়ে।

এক কথা বলার কারণ, কয়েকটি সাংপ্রতিক গল্পসংকলন পড়ার পর এসবই মনে হচ্ছিল। হতে এসেছিল ছিট ছিট হেটগল্পের বইটি। এর মধ্যে দু'টি বইয়ের লেখক আর মোটের ওপর বইয়ের পরিচিত, দু'টির লেখক স্বল্প-পরিচিত এবং বাকি দু'টির লেখক প্রায় অপ্রচিতিই বলা যায়। এর দ্বারা কোনও গ্রেতা-বিশ্লেষণ নয়, আলোচনা ছাঁচন গল্পকারের পাঠকদের পরিচিত কতটা, সোটা বলাই আমার উদ্দেশ্য। আমার আলোচনাও এই দ্বারাতেই এগোবে।

মোট বারোটি গল্পের বাস্তবায়ন ও শোভন সংকলন ভগীরথ মিশ্র-র 'কাকচিহ্নিত'। প্রায় প্রতিটি গল্পই গ্রামীণ পটভূমিকার, দেশজ সংলাপে পরিপূর্ণ (এবং ক্ষেত্রবিশেষে কণ্ঠকিত), আত্মকলি লোকোভার ও পালা-পার্বণ এবং সর্বোপরি শোষণ ও সংগ্রাম, প্রেম ও লালাস, কুসংসার ও প্রত্যাধা— সমস্ত সুবৃহৎ ছড়িয়ে আছে গল্পগুলি মধ্যে। কিন্তু এত সুবেরা সমাদোচক ও কাহিনীগুলির বিস্তার প্রামাণ্ড্য অথবা ও অপ্রসিদ্ধিত, পটভূমি ও কাহিনীভাগ এবং চরিত্রদের বিন্যাসভঙ্গি খেঁচাইনি। এর ফলে একটি গল্প পড়ার পর আর একটি গল্পে শৌঁষে ফলে পড়তে হয়। 'একই জিনিস আগেও পড়লাম না'—এর মধ্যে মনে হতে থাকে তখন। সেইসঙ্গে কোথাও কোথাও আছে কৃত্রিম সমাজসংস্কৃতি ('শেখের বাটা') বা চাপিয়ে-মেজা বিব্রান্যায়ার অকম প্রয়াস ('ফসলকাটার গান' এবং 'মায়ের জন্য')। তবু এটাই মধ্যে বিশ্লেষণের দ্বারা যে 'দাবণ', 'দুখোহারা',

'বিশ্বকল্প' এবং 'সুবন্দী'-র কথা। প্রথমটি অর্থাৎ 'স্বাধীন' শব্দটির পর আক্ষরিক অর্থেই স্তম্ভ হয়ে বসে থাকতে হয় এই ভেবে যে, মানুষের কল-প্রসূতি তাকে কতদূর জ্ঞানবর করে তুলতে পারে। আগাগোড়া বিজ্ঞান রসে পূর্ণ গল্পটি প্রথম থেকেই যে বীভৎসতার পরিবেশ গড়ে তোলে তা শেষ পর্যন্ত অক্ষর থাকে, এবং শুধু তাই নয়, ধর্মনিষ্ঠ এক হিন্দীভাষী শ্রোতা বইয়ে ছাড়ে। 'মুদ্রাঙ্কন' একটি সার্বক ছোটগল্প, যার চমক শাবার জন্য শেষদিকে পড়ে উঠেই যায়। 'সিংহাসন'-এ এই কথাটির বহিঃসীমিতভাবে প্রশংসিত যে, ক্ষেত্রবিশেষে অস্বাভাবিক সাহায্যদান করলে সাধারণপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ কিভাবে হয়ে ওঠে অমূল্য পরিবর্তিত এক মানুষ— বহুমাংশে অমানবিক এক সমস্যা। তবে অভিজ্ঞ করে দেয় 'সুবন্দী' গল্পটি। তুচ্ছ কারণে দুই পশ্চিম মধ্যে ঝগড়া শুরু হলে উভয়পক্ষ থেকেই আমন্ত্রণ জানানো হয়, এমন মহিলাদের যারা কলহ-বিশারদ বলে গণ্য। এরকমই একজন এলোকেসী। ঝগড়ায় সে চিত্রকাল অস্বাভাবিক। আজ বুঝে বসে গলায় দুরাগের ক্যানসার নিয়ে মৃত্যুশয্যাতে শুয়ে থাকা তার মনে পড়ে যায় ছেলেবেলায় দেখা পালাগান, কণ্ঠকণায়ের কথা। নিজেই অগোচরে সে শব্দে পর পা জড়িয়ে সুস্বাদু মনঃসংগে। হঠাৎ সন্ধি বিরতে সে অভিজ্ঞত হয়ে যায় নিজের দক্ষতা। মৃত্যুশয্যাচারী বৃদ্ধার বুকের ভেতর আজ হৃদয়াকার করে ওঠে যখন সে উপলব্ধি করে, এই অসামান্য গুণ বাসাতেও সে শুধুই কুবাকা বলে কাটাল সারাঞ্জীবন। তার অক্ষয় আক্ষেপ বহন করে এক অসামান্য ট্রাজেডির-ই ইঙ্গিত। শুই মেয়ে গাশ্বে বলতে হয়, সংকলিত গল্পগুলির মনঃসংগে সন্মিলন বজায় রাখতেই বসে (অর্থাৎ 'হোমোজিনিটি অব ম্যান্ডাড' বলতে যা বোঝায়) বইটি এক অনুমিত গল্পগ্রন্থ হয়ে ওঠে না।

স্বয়ংময় চরনটীর গল্পের বইগুলির মনঃ সাধারণত একটি চমককল্প। 'অষ্টমের মল হট্ট' কিংবা 'ডিভিও ভাবনান নকলদান'-র পর এরপর লেখকের 'কার্সি গল্পের উল্টো বাজা'। সুদৃষ্টিতেও সুদৃঢ় আত্ম-শোভিত বইটিতে স্থান পেয়েছে দেহান্তি গল্প। গল্পগুলি পড়তে শুরু করার আগে লেখকের একটি ঘোষণা চোখে পড়ে। 'এ সংকলনে আমার লেখা হাসির গল্পগুলি বৈজ্ঞানিক।' কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা গল্পও বৈজ্ঞানিক হাসির গল্প হয়ে উঠতে পারল না। এটা আমার অক্ষমতা। গল্পগুলি পড়ার পর মনে হয়, ঘোষণাগুলি দু'ভাগে গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রথমত, আক্ষরিক অর্থে— অর্থাৎ 'লিটারারি'। দ্বিতীয়ত, আলমর্করিক অর্থে— অর্থাৎ 'সিগারেটভি'। আক্ষরিক অর্থেই যদি ধরি, তাহলে বলতে হয়, সিগারেটই একটি গল্পও হাসির হয়ে উঠতে পারেনি। সর্বশেষ বস্তুবোধের প্রতি অতি-নিষ্ঠাবান থাকতে গিয়ে লেখক কাহিনী হাস্যরাস ফুট করেছেন। যে রসবোধের দৃষ্টিতে বৈজ্ঞানিক তা প্রকৃত পরমাণু অণুজীব ও তরলীকৃত। বাল্য সাহিত্যে চিত্রকল্প 'উট্ট' এবং 'হিউমার'-এর শোচনীয় অভাব। সেই সত্তে 'স্যাটারন'-এর 'স্যাটার' উচ্ছল ব্যতিক্রম ছাড়া রসসাহিত্য বলতে আমরা জানি টপল ডব্লিউসবর্ষ কৃত্রিম

বাস্তব-সচেতনতা। যেখানে হাসির আড়ালে অস্বাভাবিক তে চিত্রকল্প করেই না, বরং একটি পর্বোত্তম বিশেষ বিবর্তিত সম্ভার করে থাকে। সাম্প্রতিককালে কোনও কোনও প্রবন্ধিতারা 'রসসাহিত্যিক'—এর কল্যাণে তে গল্প প্রকাশিত। এরকমই কারণও কারণে বৃদ্ধার স্বাধীন অস্বাভাবিক অস্বাভাবিক করেই বসে মনে হয়। এবার লেখকের বিনীত ঘোষণার সেই আলমর্করিক অর্থ বহন করে গল্পটির বিচার করতে গিয়ে, তাহলে মনে হয়, তিনি আপাত-হাস্যবোধের আড়ালে ভিত্তি বাস্তবকেই তুলে ধরতে চেয়েছেন। এরপর টিকি আছে। কিন্তু প্রকৃত ক্ষেত্রে মাত্র কয়েকটি গল্প বাহ্যিক (বইয়ের নামগল্পটি, 'কার্সি গল্প' দেখেই) কিংবা 'বিবাস্যগণের মৃত্যুশয্যার' ব্যতিক্রমি নিছক ডব্লিউসবর্ষ, তরল ও ভাসাভাস হয়ে উঠেছে। 'স্যাটার' হওয়া দূরে থাক, পরিশীলিত রসবোধও অনেক জায়গায় অনুপ্রস্থিত, এমনকি কোথাও কোথাও ব্যঙ্গ-পরিহাস অতিক্রম করেই ফলে লেখার নান্দনিক সুর ফুট হয় ('দীন-ইলাহী', 'ককাকতা', 'শাবি পালা গৌণে খাম', 'মধ্যপ্রাচ্যের সংকট', 'নতুন রাসা', 'কবি', 'বন্ধু')। গল্পগুলির কল্পনা দক্ষতা আমাদের চমকতে করে কেবল, হৃদয়স্পর্শ করে না। ভবিষ্যতে আশা করি, স্বয়ংময় তাঁর 'মুদ্রাংকন'কারিগরি বিলাস বর্জন করে যথার্থ মননশীল ও হৃদয় রাসসাহিত্য উপহার দেবেন।

চারটি দীর্ঘ গল্পের সংকলন সৈকত লিখকের 'উল্টো রে পুজা জাগো যে পুজা'। প্রথমে পুরুষীনাথের দেহাভিজ্ঞা থেকে বর্ণনা করা যায়, গল্পগুলিও এই অলমর্করিক হতে পারে। চারটি গল্পই লোকজীবনের দায়িত্ব, দারিদ্র্য, আচার-অসুষ্ঠান ইত্যাদির সাদৃশ্যপূর্ণ বর্ণনা আছে। যারা এখানকার, অর্থাৎ পুরুষীনাথ এবং চতুর্দশশত প্রমাণকল্পের নিম্নবর্ণের মানুষের প্রাণাণ ছিঁচ পেতে চান তাঁদের কাছে বইটি এক উৎকৃষ্ট মনঃসংগে হয়ে পারে, এছাড়াও। কিন্তু সাহিত্যেমৌলীর আদৃত গ্রন্থ কখনই হয় না। বরং, চারটি গল্পই 'হিসা', বইয়ের মনঃ গল্পটি, 'অবিরে' এবং 'বায়র কল্যাণ' প্রমাণকল্পের নিদর্শন অভাব। এক অল্পতর রসবোধিতায় গল্পগুলি আচ্ছন্ন। তাই গোবিন্দ মুতি তার রস, দিশি গাশ্বে, সোলাঙ্গল ও তার পাকৈয়া শোষ্ঠী, হারান-রস-হাস্যের বদ, সাধারণ সর্বদর ও তার মড়াভু মোহ—কেউই উত্তীর্ণ হয় না সাহিত্যার্থ্যে। বইয়ের পৃষ্ঠা অবশিষ্ট জালা থেকে যায় কিছু বিস্তৃত তথ্যের পরিবেশক মাত্র।

মুদ্রিণ এ.ম.ম. তাঁর তেরোটি ছোটগল্প সমিচ্ছেন 'জাফকাটা' বইটিতে। এটি সমিচ্ছে প্রথম গল্পগ্রন্থ। বৈশিষ্ট্যগত গল্পই গ্রাম এবং গ্রাম-শহর সীমান্তে আবদ্ধ। গল্পগুলিতে জীবনের, বিশেষত গ্রামীণ মুসলমান জীবনের বিভিন্ন দিক, বিভিন্ন স্তরেতে ধারার প্রকাশ আছে টিকি, কিন্তু বর্ণনায় শিল্পভাবের মূল সফলভাবে উপলব্ধি হয়নি। এরই মধ্যে ঘোষণা লাভ্যতা দরীক করে 'পাতি', 'কোপ', 'একিক কল্যাণ' ও 'চৌল শিল্পী'। বস্তুময়, যেখানে লেখক কাহিনী-নির্ভর থাকতে চেয়েছেন, গল্পগুলি

সেখানেই মোটের ওপর উত্তীর্ণ। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনাবশ্যক বিবৃতিবিহীনভাবে ফলে সাহিত্যমান ফুর হয়।

'আনসারজিন্দনের গল্প'—এই বইটির ভূমিকায় জানতে পারি, সংকলিত ছাটি নাতিদীর্ঘ গল্পের একটিও আগে ছাপানো হয় নি। ভাবতে ভাল লাগে, এতদিন নিজেই অজ্ঞাতবাসে রেখে, এক নির্ভিক জীবনচারণা মাধ্যমে লেখক তাঁর সাহিত্যেতরার জন্ম দিয়েছেন এবং শুধু তাঁর মনেই ছিল, জাভাও বৈজ্ঞানিক তাকে। হতে পারে, সেই তেজসবান আরও মার্জান দরকার, দরকার আরও বেশি সংহতিও সংশ্লিষ্ট, তবু বলব, লেখকের দৃষ্টি মধ্য এ-ক সত্ততা আছে, যা ইদানীং বুঝে একটি বেশি চোখে পড়ে না— বিশেষত তাঁদের ক্ষেত্রে যারা সাধারণত গ্রামভিত্তিক গল্পলেকার অণুজীব রোমাঞ্চিকভাবে বৃদ্ধ হয়ে থাকেন। 'সুবান্দী' গল্পটিতে সৌদ মুনিয় হেফাজুদ্দিন জলদায় উদ্যোগের থেকে মৃত পুত্র সোনায়াদির লাশ এবং আর এক মুনিয় এছমকে নিয়ে সুবান্দীর দিকে নৌকায় যাত্রা করে। পথে এছমেরও মৃত্যু হয়। তাপস বন্যার জলে একা নৌকায় মুনিয় দিশেহারা হেফাজুদ্দিনের সংঘাত হয়ে ওঠে গল্পের উল্টোটা বিষয়—এক অস্বাভাবিক ওভারডি। 'সুবান্দী' গল্পে জাভার মেয়ে সুবান্দীর বিত্তীয়তার বিয়ে হবার পর ছোট ছেলেবেলা বাশের বাড়ি রেখে চলে গেয়ে হয় নতুন স্বামী হয়ে। কিন্তু সেখানে তাকে ডিমেতে জড়িয়ে থাকে মৃত প্রথম স্বামীর স্মৃতি, পুত্রের আত্মশ্রম আরও সুবান্দীর জীবন। এইসবের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসে আর এক সুবান্দী— নতুন পরিবেশ, নতুন পুরুষের সঙ্গে সহবাস করতে যে প্রবৃত্ত। সহজ-সুন্দর ভবিষ্যৎ দেখক তুলে ধরেন এক নতুন সূক্ষ্ম অনুভূতির স্তরসমূহ। 'নৈমিনের মন' গল্পে জাভার নিঃসংঘ্য স্বামীহারা অনেকায়ে নিয়ে গ্রামপ্রান্তেই নিজেদের অগোচরে যেতে ওঠে একটি বিশেষ রাসবোধিতা গাটি— তাঁকে ভাঙতে গিয়ে কামোদন জালা। কারণ আর কিছুই নয়, জলদায়ের মুক্তিভে বিবাহী এই রাসবোধিতা দল জালা, অজ্ঞানকে দাঁত করলে গ্রামের মানুষের সহনশূন্যিত্তি ভুক্তিয়ে ভোট পাওয়া যাবে। তাই এছনা-কে অনেক মনঃ বাক্য, অনেক মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাকে সন্মান রেখে পাঠিয়ে কল্যাণী তৎপর হয় নিজেদের স্বাধীনিকারী। অজ্ঞান তার একমাত্র শিশুপুত্র নৈমিন-কে বুকে জড়িয়ে পুতুলের মতো ঘোড়ের কথা অনুযায়ী কাজ করে চলে। এছনা গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছে সে ক্রমশ অপ্রিয় হতে থাকে। নির্বাচনের শেষে মাত্র একটি ভাঙে অজ্ঞান হেরে যায়। অতএব পাঠির কাছেও সে হয়ে যায় অজ্ঞান। তার জীবন যে ভিতরে সেই ভিতরেই থেকে যায়। সম্পূর্ণ নৈরাজ্যিক, কদমের দুইতে দেহা গল্পটি সাম্প্রতিক গ্রামীণ-রাসবোধিতা সীমা ছাড়িয়ে এক রসবোধিতা বহন করে।

বিধান স্বয়ংময়ের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'গাত মুরনোর কথা'। মোট গল্পটি গল্প হয় পেয়েছে এখানে। প্রতিটি গল্পই এক মূল্য ও কর্মসীমা অবশেষে প্রকাশিত। বেশিরভাগই নাগারিক শব্দটির আশ্রিত হলেও ভাবার কাব্যময়তা, তুচ্ছ ঘটনাক্রমে দৃশ্যমান করে তোলার

অপেক্ষা শৈলী সহজই মন ছুঁয়ে যায়। মনে হয়, এই ভাষা যেন আসললব্ধ নয়। লেখকের নিঃসংঘ্য-প্রবাসের মতোই স্বতঃস্ফূর্ত। কিন্তু সেই সঙ্গে পাশাপাশি একটি ভাষাও উঠি মানে। লেখকের ঐ প্রথম গল্পগ্রন্থ বলে তাঁর কলকৃতি আজ আমাদের কাছে অতিনয় মনে হচ্ছে। কিন্তু শব্দবোধিতার তাঁর অন্যান্য গল্পের কাহিনীভাগও যদি আমরা অতিক্রম করে গল্প, যদি লেখক দেওয়াই সৌন্দর্য এবং ভাষা কলকৃতি নির্ভর, তবে তা আমাদের মতোই এতদূর থাকবে তো? কিন্তু সেসব ভবিষ্যতে কথা। আপাতত মর্ডকুপ পেয়েছি, ততক্ষণই লাভ।

বাংলা ছোটগল্প তার কল্পনা দক্ষতার যৌবন শ্রেণিতে এসেছে অনেকদিন। সৈকি থেকে আজ সে পরিণত। নতুন করে যৌবন লাভ করতে যাওয়া কল্যাণী। এরপর সে মুখ ফোকার শক্তিমান, সন্ধিস্থাশীল, বৈচিত্র্যপূর্ণ কাহিনীভাগের দিকে এখানেই তার উৎকর্ষ এবং সাফল্য নিহিত।

বাংলা ছোটগল্প তার কল্পনা দক্ষতার যৌবন শ্রেণিতে এসেছে অনেকদিন। সৈকি থেকে আজ সে পরিণত। নতুন করে যৌবন লাভ করতে যাওয়া কল্যাণী। এরপর সে মুখ ফোকার শক্তিমান, সন্ধিস্থাশীল, বৈচিত্র্যপূর্ণ কাহিনীভাগের দিকে এখানেই তার উৎকর্ষ এবং সাফল্য নিহিত।

বাংলা ছোটগল্প তার কল্পনা দক্ষতার যৌবন শ্রেণিতে এসেছে অনেকদিন। সৈকি থেকে আজ সে পরিণত। নতুন করে যৌবন লাভ করতে যাওয়া কল্যাণী। এরপর সে মুখ ফোকার শক্তিমান, সন্ধিস্থাশীল, বৈচিত্র্যপূর্ণ কাহিনীভাগের দিকে এখানেই তার উৎকর্ষ এবং সাফল্য নিহিত।

বাংলা ছোটগল্প তার কল্পনা দক্ষতার যৌবন শ্রেণিতে এসেছে অনেকদিন। সৈকি থেকে আজ সে পরিণত। নতুন করে যৌবন লাভ করতে যাওয়া কল্যাণী। এরপর সে মুখ ফোকার শক্তিমান, সন্ধিস্থাশীল, বৈচিত্র্যপূর্ণ কাহিনীভাগের দিকে এখানেই তার উৎকর্ষ এবং সাফল্য নিহিত।

বাংলা ছোটগল্প তার কল্পনা দক্ষতার যৌবন শ্রেণিতে এসেছে অনেকদিন। সৈকি থেকে আজ সে পরিণত। নতুন করে যৌবন লাভ করতে যাওয়া কল্যাণী। এরপর সে মুখ ফোকার শক্তিমান, সন্ধিস্থাশীল, বৈচিত্র্যপূর্ণ কাহিনীভাগের দিকে এখানেই তার উৎকর্ষ এবং সাফল্য নিহিত।

বাংলা ছোটগল্প তার কল্পনা দক্ষতার যৌবন শ্রেণিতে এসেছে অনেকদিন। সৈকি থেকে আজ সে পরিণত। নতুন করে যৌবন লাভ করতে যাওয়া কল্যাণী। এরপর সে মুখ ফোকার শক্তিমান, সন্ধিস্থাশীল, বৈচিত্র্যপূর্ণ কাহিনীভাগের দিকে এখানেই তার উৎকর্ষ এবং সাফল্য নিহিত।

বাংলা ছোটগল্প তার কল্পনা দক্ষতার যৌবন শ্রেণিতে এসেছে অনেকদিন। সৈকি থেকে আজ সে পরিণত। নতুন করে যৌবন লাভ করতে যাওয়া কল্যাণী। এরপর সে মুখ ফোকার শক্তিমান, সন্ধিস্থাশীল, বৈচিত্র্যপূর্ণ কাহিনীভাগের দিকে এখানেই তার উৎকর্ষ এবং সাফল্য নিহিত।

বাংলা ছোটগল্প তার কল্পনা দক্ষতার যৌবন শ্রেণিতে এসেছে অনেকদিন। সৈকি থেকে আজ সে পরিণত। নতুন করে যৌবন লাভ করতে যাওয়া কল্যাণী। এরপর সে মুখ ফোকার শক্তিমান, সন্ধিস্থাশীল, বৈচিত্র্যপূর্ণ কাহিনীভাগের দিকে এখানেই তার উৎকর্ষ এবং সাফল্য নিহিত।

বাংলা ছোটগল্প তার কল্পনা দক্ষতার যৌবন শ্রেণিতে এসেছে অনেকদিন। সৈকি থেকে আজ সে পরিণত। নতুন করে যৌবন লাভ করতে যাওয়া কল্যাণী। এরপর সে মুখ ফোকার শক্তিমান, সন্ধিস্থাশীল, বৈচিত্র্যপূর্ণ কাহিনীভাগের দিকে এখানেই তার উৎকর্ষ এবং সাফল্য নিহিত।

বাংলা ছোটগল্প তার কল্পনা দক্ষতার যৌবন শ্রেণিতে এসেছে অনেকদিন। সৈকি থেকে আজ সে পরিণত। নতুন করে যৌবন লাভ করতে যাওয়া কল্যাণী। এরপর সে মুখ ফোকার শক্তিমান, সন্ধিস্থাশীল, বৈচিত্র্যপূর্ণ কাহিনীভাগের দিকে এখানেই তার উৎকর্ষ এবং সাফল্য নিহিত।

বাংলা ছোটগল্প তার কল্পনা দক্ষতার যৌবন শ্রেণিতে এসেছে অনেকদিন। সৈকি থেকে আজ সে পরিণত। নতুন করে যৌবন লাভ করতে যাওয়া কল্যাণী। এরপর সে মুখ ফোকার শক্তিমান, সন্ধিস্থাশীল, বৈচিত্র্যপূর্ণ কাহিনীভাগের দিকে এখানেই তার উৎকর্ষ এবং সাফল্য নিহিত।

বাংলা ছোটগল্প তার কল্পনা দক্ষতার যৌবন শ্রেণিতে এসেছে অনেকদিন। সৈকি থেকে আজ সে পরিণত। নতুন করে যৌবন লাভ করতে যাওয়া কল্যাণী। এরপর সে মুখ ফোকার শক্তিমান, সন্ধিস্থাশীল, বৈচিত্র্যপূর্ণ কাহিনীভাগের দিকে এখানেই তার উৎকর্ষ এবং সাফল্য নিহিত।

বাংলা ছোটগল্প তার কল্পনা দক্ষতার যৌবন শ্রেণিতে এসেছে অনেকদিন। সৈকি থেকে আজ সে পরিণত। নতুন করে যৌবন লাভ করতে যাওয়া কল্যাণী। এরপর সে মুখ ফোকার শক্তিমান, সন্ধিস্থাশীল, বৈচিত্র্যপূর্ণ কাহিনীভাগের দিকে এখানেই তার উৎকর্ষ এবং সাফল্য নিহিত।

বাংলা ছোটগল্প তার কল্পনা দক্ষতার যৌবন শ্রেণিতে এসেছে অনেকদিন। সৈকি থেকে আজ সে পরিণত। নতুন করে যৌবন লাভ করতে যাওয়া কল্যাণী। এরপর সে মুখ ফোকার শক্তিমান, সন্ধিস্থাশীল, বৈচিত্র্যপূর্ণ কাহিনীভাগের দিকে এখানেই তার উৎকর্ষ এবং সাফল্য নিহিত।

বাংলা ছোটগল্প তার কল্পনা দক্ষতার যৌবন শ্রেণিতে এসেছে অনেকদিন। সৈকি থেকে আজ সে পরিণত। নতুন করে যৌবন লাভ করতে যাওয়া কল্যাণী। এরপর সে মুখ ফোকার শক্তিমান, সন্ধিস্থাশীল, বৈচিত্র্যপূর্ণ কাহিনীভাগের দিকে এখানেই তার উৎকর্ষ এবং সাফল্য নিহিত।

বাংলা ছোটগল্প তার কল্পনা দক্ষতার যৌবন শ্রেণিতে এসেছে অনেকদিন। সৈকি থেকে আজ সে পরিণত। নতুন করে যৌবন লাভ করতে যাওয়া কল্যাণী। এরপর সে মুখ ফোকার শক্তিমান, সন্ধিস্থাশীল, বৈচিত্র্যপূর্ণ কাহিনীভাগের দিকে এখানেই তার উৎকর্ষ এবং সাফল্য নিহিত।

বাংলা ছোটগল্প তার কল্পনা দক্ষতার যৌবন শ্রেণিতে এসেছে অনেকদিন। সৈকি থেকে আজ সে পরিণত। নতুন করে যৌবন লাভ করতে যাওয়া কল্যাণী। এরপর সে মুখ ফোকার শক্তিমান, সন্ধিস্থাশীল, বৈচিত্র্যপূর্ণ কাহিনীভাগের দিকে এখানেই তার উৎকর্ষ এবং সাফল্য নিহিত।

বাংলা ছোটগল্প তার কল্পনা দক্ষতার যৌবন শ্রেণিতে এসেছে অনেকদিন। সৈকি থেকে আজ সে পরিণত। নতুন করে যৌবন লাভ করতে যাওয়া কল্যাণী। এরপর সে মুখ ফোকার শক্তিমান, সন্ধিস্থাশীল, বৈচিত্র্যপূর্ণ কাহিনীভাগের দিকে এখানেই তার উৎকর্ষ এবং সাফল্য নিহিত।

বাংলা ছোটগল্প তার কল্পনা দক্ষতার যৌবন শ্রেণিতে এসেছে অনেকদিন। সৈকি থেকে আজ সে পরিণত। নতুন করে যৌবন লাভ করতে যাওয়া কল্যাণী। এরপর সে মুখ ফোকার শক্তিমান, সন্ধিস্থাশীল, বৈচিত্র্যপূর্ণ কাহিনীভাগের দিকে এখানেই তার উৎকর্ষ এবং সাফল্য নিহিত।

বাংলা ছোটগল্প তার কল্পনা দক্ষতার যৌবন শ্রেণিতে এসেছে অনেকদিন। সৈকি থেকে আজ সে পরিণত। নতুন করে যৌবন লাভ করতে যাওয়া কল্যাণী। এরপর সে মুখ ফোকার শক্তিমান, সন্ধিস্থাশীল, বৈচিত্র্যপূর্ণ কাহিনীভাগের দিকে এখানেই তার উৎকর্ষ এবং সাফল্য নিহিত।

বাংলা ছোটগল্প তার কল্পনা দক্ষতার যৌবন শ্রেণিতে এসেছে অনেকদিন। সৈকি থেকে আজ সে পরিণত। নতুন করে যৌবন লাভ করতে যাওয়া কল্যাণী। এরপর সে মুখ ফোকার শক্তিমান, সন্ধিস্থাশীল, বৈচিত্র্যপূর্ণ কাহিনীভাগের দিকে এখানেই তার উৎকর্ষ এবং সাফল্য নিহিত।

বাংলা ছোটগল্প তার কল্পনা দক্ষতার যৌবন শ্রেণিতে এসেছে অনেকদিন। সৈকি থেকে আজ সে পরিণত। নতুন করে যৌবন লাভ করতে যাওয়া কল্যাণী। এরপর সে মুখ ফোকার শক্তিমান, সন্ধিস্থাশীল, বৈচিত্র্যপূর্ণ কাহিনীভাগের দিকে এখানেই তার উৎকর্ষ এবং সাফল্য নিহিত।

বাংলা ছোটগল্প তার কল্পনা দক্ষতার যৌবন শ্রেণিতে এসেছে অনেকদিন। সৈকি থেকে আজ সে পরিণত। নতুন করে যৌবন লাভ করতে যাওয়া কল্যাণী। এরপর সে মুখ ফোকার শক্তিমান, সন্ধিস্থাশীল, বৈচিত্র্যপূর্ণ কাহিনীভাগের দিকে এখানেই তার উৎকর্ষ এবং সাফল্য নিহিত।

বাংলা ছোটগল্প তার কল্পনা দক্ষতার যৌবন শ্রেণিতে এসেছে অনেকদিন। সৈকি থেকে আজ সে পরিণত। নতুন করে যৌবন লাভ করতে যাওয়া কল্যাণী। এরপর সে মুখ ফোকার শক্তিমান, সন্ধিস্থাশীল, বৈচিত্র্যপূর্ণ কাহিনীভাগের দিকে এখানেই তার উৎকর্ষ এবং সাফল্য নিহিত।

‘বিদ্যাসাগর — প্রসঙ্গ হুগলী জেলা’ একটি ভিন্ন ধরনের হয়। বিদ্যাসাগরের জীবন ও সাধনা নিয়ে এখানক কম বই লেখা হইল। এমনও বিবর্তন পণ্ডিত মহলে এই মহামনীষীর জীবনের ওপর নানা অস্মেন দিক থেকে আলোক স্পর্শগত এবং নিতানতুন তথ্য তুলে আনার কাজ হয়ে চলেছে। ব্রিটেন প্রবাসী বঙ্গসাম্রাজ্য নীতান্ত্র (স্ট্রীম) মণ্ডল বিদ্যাসাগরকে তাঁর নির্বচিত পাঠজন প্রভৃৎস্বকীয় বাঙালির মধ্যে হান না বিলেও বিদ্যাসাগরকে বা বাঙালির ভাষেও কিছু যায় আসে না— সে তিনি নিবন্ধ রচনায় বড় মুন্সিফানাই দেখান। আশাম্বর বিশ্ব বা বাঙালির চিত্রে বিদ্যাসাগরের হান প্রভৃৎস্বকীয় মতোই। তা না হলে তাঁর মৃত্যুর একশো বছর পূর্বেও একজন বাঙালি তাঁর সম্বন্ধে এমন একটি সরস কৌতুহলজনক বই লিখতে যাবেন কেন। বইটির বিষয়বস্তু নামটি থেকে অনুমান করা যায়। এখানে তাঁর জীবনের যে সকল ঘটনা, কর্মকাণ্ড ও কীর্তি ১৮৭২ সালের আগেকার হুগলী জেলায় ঘটেছিল, যথাসম্ভব কালানুক্রমিক বজায় রেখে সেগুলি বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। আজ আমরা সবাই জানি, ঈশ্বরচন্দ্র মৌলিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে জন্মেছিলেন। কিন্তু তাঁর জন্মকালে ওই গ্রামটি ছিল হুগলী জেলার অধিকাংশ সময় মূল কর্মক্ষেত্র ছিল কলকাতা। এখানেই জীবনের অধিকাংশ সময় কাটবে। কিন্তু হুগলী জেলার প্রতি তাঁর বিশেষ ভাল ছিল। এই জেলার তার কর্মক্ষেত্র বাসক। বিদ্যাসাগরের জীবনের সঙ্গে একান্তভাবে জড়িয়ে আছে অসমীশন হুগলী জেলার পাটটি গ্রাম, বনমালীপুর, বীরসিংহ, শাফুল, গোমটি ও কীরশাল। বিদ্যাসাগরের জীবনের মূল ঘটনাগুলি তথা শিক্ষাবিস্তার, সমাজ সংস্কারের কাহিনী বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রসঙ্গে হুগলী জেলার ভূমিকা লেখক তথ্য সমাবেশে উপস্থাপন করেছেন। একজন মনীষীর কর্মকাণ্ডকে একটি জেলার পরিধিতে আদান করে দেখানো মতো লেখকের কোনো আশঙ্কিত মনোভাব প্রকাশ পায়নি। সন্দেহকর কোনও উদ্দেশ্য তাঁর নেই কিন্তু জেলাবাসী সবার তিনি বর্ধ এবং উন্নয়ন আভুত করেছেন কারণ, জেলার সামগ্রিক প্রসার সমিতির পক্ষ থেকে তিনি এই বইটি লিখেছেন। লেখকের প্রশংসার পক্ষ সার্ক।

অন্তরঙ্গ আর্মি, বিতর্কিত বাঙালি রেনেসাঁস এবং রবি অন্তরঙ্গ— এই তিনাবলি প্রসঙ্গ নিয়ে মিত্র বসুমতীন্দ্রবাবুর ‘অন্তরঙ্গ আর্মি’ বইটি সফলত পদসিঁরে মানুষের সভ্যতা-সম্প্রদায় ইতিহাসে যাত্রা করে দেখার প্রয়াস। প্রথম প্রসঙ্গটিতে তিনি দ্বি-সত্যি সত্যি থেকে শুরু করে কালিঙ্গাস— পেরাক—দায়ে তথা ইতালির রেনেসাঁস বিশাল প্রেক্ষাপট থেকে মানুষের সভ্যতা পঙ্কট উদগোচর করতে চেয়েছেন। এই প্রক্টেয় তিনি রেনেসাঁস সবে মাত্রি লুখালের বিলম্বনের আন্দোলনের থেকেও সূত্র আহরণ করেছেন। প্রায় ও প্রতীচীর পূর্ববর্তীদে উত্তরাধিকার খেঁটে তিনি যুদ্ধে শেষে চেয়েছেন

আজকের মানুষকে। নমিতা দেবীর অনুসন্ধানের পরিসর বৃহৎ, সেই তুলনায় প্রবন্ধটি স্বল্প আয়তন। এমন ব্যাকক বিষয় আলোচনার জন্য আর্থিক স্থানের প্রয়োজন ছিল। এটা আরও বোঝা যায়, যখন তিনি যেখান জন্মে ও এলিয়েন্ডে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু নাম উচ্চারণ করেই তিনি সরে গিয়েছেন কুটির ইতিহাসে। জন্মে—এলিয়েন্ড—সার্ক—কামু কিংবা বেলেট—অধ্যাদেশ—রা মানুষের যে সন্ধান বেলেছিল প্রক্টে কালশিখরিতে—ওই প্রসঙ্গে সে যে বিষয়ে খানিক আলোচনা করার সুযোগ ঘটত তাহলে এই প্রবন্ধটিতে নতুন মাত্রা যোগ হত বলে আমার বিশ্বাস। তাহলে ক্রিস্টমসের সংকৃত, অভিব্যক্ত কালের কথাই যদি একটি পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হত, তবে তৎসঙ্গে এবং দস্তযেভক্তি ক্রিস্টমসের যে নতুন মানবিক মুখ তুলতে চেয়েছিলেন, ধর্মের যে নতুন সজ্জা আহরণ করেছিলেন সেই আলোচনা এল না কেন?

দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে রয়েছে বাংলায় নবজাগরণের তিন পুরুষকে—রামনাথন, ডিয়োজিও এবং বিদ্যাসাগর নিয়ে অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা। প্রবন্ধের নামকরণে মিত্রাবেনী কেন ‘বিতর্কিত’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন বোঝা গেল না কারণ, কী জন্য বিষয়টি বিতর্কিত কিংবা এখানকার কোনও বিতর্কিত সুযোগ রয়েছে কি না সে নিয়ে কোনো আলোচনা দেখানো না। অথচ সাম্প্রতিককালে তা প্রসঙ্গ উঠেছে, রেনেসাঁস প্রবন্ধ কনসুদ বিতৃত হয়েছিল? মুষ্টিমেয় একটি শিখিত ও বিব্রান তৈরির বাইরে কি সত্যিই নবজাগরণ ঘটেছিল? নবজাগরণের খেঁটে আশম্বর জনসাধারণের মধ্যে আলোচন তুলেছিল কি? নমিতাদেবী বিষয়-সুত্রকে যোগ্য মর্যাদা দিতে পারেননি। বাংলায় মুসলিম জীবন নবজাগরণের স্বরূপ কীরকম? এ নিয়ে বিশদ আলোচনার অবকাশ থাকলেও তিনি প্রসঙ্গটি ভাঙ্গা ভাঙ্গা ভাবে ছুঁয়ে পক্ষ কাটিয়ে গিয়েছেন, মনোনিবেশ করেননি।

সমাজের কয়েকজন মন্যমান্য পেশাজীবী মিলিত হয়ে একটি সংগঠন হয়ে তুলেছেন—মানব উন্নয়ন সমিতি। সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য, জ্ঞানের বিকল্পে সজ্জা সজ্জা, অজ্ঞতার বুদ্ধমাত্রকে রক্ষা করা। ঘটনাচক্রে দেখা যায়, সমিতির সভাপতিত্ব একমাত্র পূর্ব নীলেশই করন চার মাদকাসক্ত বনে গিয়েছে এবং মাদক কারাবিরতির সঙ্গে তার যোগাযোগ পণ্ডিত হয়েছেন—সবক তার বাবা-মার অজ্ঞাতে। সভ্যতা প্রকাশ হয়ে পড়ার পর বাবা-মা সহ সমিতির সকলেই উন্নয়ন। এমন কঠিন বিবাহটিকে যে দুঃস্থতা মোকাবিলা করে নীলেশকে স্বাভাবিক জীবনের পথে ঘোরানোর দরকার ছিল—কেউ তা মনে না। প্রথম হয়ে যায় যে, ওই দগ্ধমান্য ব্যক্তিবর্গের সমিতি আলো এক শৌখিন বাপার। একটি সহ উদ্দেশ্যের পক্ষা উড়িয়ে সমাজে নিজেদের নামাক প্রতীপ্তি বাড়ানোর চাল মাত্র। প্রকৃত সমস্যা মুখে পড়়ে তারা অসহায়, ছাত্রত্ব। সুনা নামের এক স্বাস্থ্য তত্ত্বী

ভার নেয় নীলেশকে রাহগ্রাস থেকে মুক্ত করার। সে নীলেশের মতো তেজস্বর উদয় পাঠ্য। নীলকট যোগাযোগের বহুপ্রয়াস নাটক সমগ্রভিত্তিক সমাজ আলোড়নকারী ঘটনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। উচ্চবিত্ত সমাজের এক মাদকাসক্ত তত্ত্বপের পাশাপাশি তিনি নিচুতলার জ্ঞান-বিকল্পতানের চরিত্র এনেছেন, সাধারণ কোনও বোকান চালানোর অন্তরালে যারা নানা জাতের মাদকস্রব্য যুগাবের হাতে শেষে দেয়। এই ধরনের যুগো বিকল্পতানের নিজেদের কলিকোজগার এবং জীবনসন্মতি নাটকের একটি দৃশ্য চমককার মুহূর্তে উঠেছে। বড়ভিত্তি বোজগার তথা সঙ্কলতার মুখ দেখার পোন্তে এরা অজ্ঞাত চক্কর কাছ থেকে সমাজের রক্তে রক্তে জ্ঞান শেষে দেওয়ার দায়িত্ব নেয়। নীলেশকে সুখ করে তোলার জন্য সুমনার চেষ্টা নাটকের একটা বড় ভূমি। নাটকে যখন বাকি চরিত্রগুলি একতরফিক তখন সুমনা বহুমাত্রিক আকর্ষণ নিয়ে নাটকে প্রাণবন্ত করেছে। বড়লোকের আত্মপ্রকাশের সে ধরিয়ে দিয়েছে।

নাটকের জন্মদিন এক খাতি-অর্থলোভী নাট্যকারের জীবনের একদিনের সংকটময় ঘটনাকে ঘিরে লেখা। আরও যশ আরও অর্থের তাড়নায় তিনি নিজের কন্যাকেই ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন কিন্তু আত্মহত্যা করে মেয়ে ঠিকি ঠিকি দেয়। ধরনের ধটনা ব্যস্তের ঘটে এবং এমন চরিত্র বিবরণ নয়—তবুও এই একাকটিক চড়া দাশের। ঘটনা সংস্থানের ও চরিত্র ত্রুণের শৈলীতে সুস্বচরিত্রের অবত চাচ্ছে পড়ে। রামনাথ বর্ধিত মর্যাদা প্রতীকার জন্য পঞ্চ মর্যাদাক্রমের দ্বারা বৈদিক শূদ্রজাত শূদ্রকের যিন-কাহিনী নিয়ে বইটির একান্ত বিদ্যাসংহার। কিন্তু নাট্যকার কোন মুহূর্তেও এটিকে কাব্যানুষ্ঠান বোধনো, বোঝা গেল না। এখানেও ব্যাঘ্রমী উচ্চকট সঙ্গলাগ বিময় হয়েছে। প্রতিবাদের ও ভ্রমনি পিকি চড়া না হলে কেন না? নীলকট যোগাযোগে চিন্তা ও কল্যাণে জোরালো কিন্তু কেবল চিন্তা-ভাবনার দরবার দিয়ে তা নাটকে দেখা যায় না। সল্যবের পাখিকতা ও সরসতা না থাকলে উচ্চভিত্তিকের গ্রহণীয় মনে হয় না। মনে হয়, বইটি প্রকাশের জন্য তাড়াহুড়া করেই নিয়ে তিনি তাঁর নাটকগুলোর প্রাথমিক লিখন পূর্ববিত্তের কাগজে সুযোগ পাননি। এ বইয়ের চারটি একাক নাটকই পূর্বলিখনের ফলে উন্নততর করে তোলার অবকাশ রয়েছে।

নাট্যাচার শিশিরকুমার ও বাংলা রঙ্গমঞ্চের বৃণ অধ্যায়
অজিত কুমার / সাহিত্যিক, কলকাতা-৯ / ৪৫ টাকা

ভাঙ্গা দেশভেদিক, জনকথা — আনুদের দর/ভাঙ্গা-সোভিয়েত সংস্কৃতি সমিতি, কলকাতা-১৩/২০ টাকা

বিদ্যাসাগর : প্রসঙ্গ — হুগলী জেলা — বঙ্গবন্ধুর সামন্ত/বঙ্গীয় সাংসদ প্রসার সমিতি, হুগলী জেলা কমিটি, ব্রহ্মবন্দ,

হুগলি/২৫ টাকা

অন্তরঙ্গ আর্মি—নমিতা বসুমতীন্দ্রবাবু/বিভাব প্রকাশনী, কলকাতা-১৭/১৫ টাকা

বলয়গ্রাস ও অন্যান্য নাটক—নীলকট যোগাযোগ/জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, কলি-৯/২০ টাকা

কবে কবিতায় পাঠক দেখবে আত্মমুখ?

হাসিন মল্লিক

জীবন বলতেই বলতে এমনতার জটিল আবর্ত প্রায়ের গ্রহি বাঁধা পড়েছে সেখানে সহজ নিঃশ্বাস নেওয়া কষ্টকর। সেখানে সুবাস্তা, সমুদ্রজীবনের মতো সহজসাধ্য নয়। আর নেই জোহাওয়ার খিফাত, বকুলের সুবাস। জীবনধারণের কালে মনুষ্য কুঁজো হয়ে গেছে। বড় মানুষ এখানে অন্যায়াসে ছোটমানুষ হয় আর ছোটমানুষ বড় হতে চাইলে তার জন্মে শোয়াল-শুকনের নবরাসাত্তে শুরু হয় বড় প্রথর রক্তক্ষরণ। এই বাজবিরল কবিতা শিলাহার। তাঁদের কাব্যভাষা জটিল হতে হতে গিয়েছে এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছেছে, এত ব্যক্তিগত হয়ে গেছে কবিতা যেখানে কবিতায় ভাষা আছে কিন্তু কাব্য নেই। বাংলা কবিতা জীবনের হাজার বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন এমন জায়গায় এসে গেছে সেখানে কবি যখন কবিতা লেখেন মনে হয় না তখন তাঁর পাণ্ডুলিপি পাঠ্যে কান্নার মুখ ফুটে ওঠে। তা হল ‘পান’ কবি জন্য? ‘পান’ তো একাকী গায়কের নয়। একথা বড় শূন্যে না তবু যখন কবিতা পড়ি মনে হয়, এ বড় সত্যি কথা। কেন আজ বাংলা কবিতা দেখলে পাঠক লিখ হাত দুই সরে যান? কবিতা ভেঙেছেন? কবিতার অভিমানে আর রোগ খাটি? কিন্তু বাস্তবের নিজস্ব সম্পদ, নিজস্ব অনুভবের লিখিত লগ কবিতা যখন পাঠকের দরবারে গ্রহণকৃত হয়ে আসে, তাকে যদি পাঠক আত্মমুখ দেখতে না পান তখনও কি তাকে সফলতা বন্দব?

নীলজ্ঞান চট্টোপাধ্যায় ‘ছোট জীবন বড় জীবন’ কাব্য পুস্তিকায় দুই মেলের জীবনকে ধরতে চেয়েছেন। সাধারণ নীলজ্ঞানের অন্যায়াসলঙ্কা। বরফ বলা যায়, তিনি চান সহজ-সহজ কবিতাও এক কবিতাও। জানিয়ে দেন, তিয়াজগটা উন্নয়ন লেখা বড়লোকের রাজারের ‘হািমি মেটাতে/বৈদিক উন্নয়ন/পাড়া থেকে/গোদনে তুলে নেন/তাঁর পরভূটি বিরা’। এইভাবে বড় জীবন ছোট। আর ‘ছোট লেখক/ছোট কাগজের শিল্পে/নিজেকে আধিক্য করে বার বার। এটাই কোহাশ মিলের ভিতরকার সবচেয়ে বড় সত্য—‘নিজেকে আধিক্য’। কিন্তু

চলচ্চিত্র', 'রাগালাটি', 'অনামি' প্রভৃতি ভাল কবিতা লিখেছেন। কবি লিখেছেন, 'বীট গাজরের পুষ্টিতে কাটে শীতকাল/ কেন না বীট মানে/ শব্দেই নামাবার আশে/ ভেসে যাবো শাদা বারান্দা।' কিংবা 'কাঁধা আশ্রম দিয়ে কে শেখালে বরফের ভাষা'।

তুলে বাস মুখ স্বপ্নান এবং কাশবন — রূপা দাশগুপ্ত/
কালকান্দি, কলকাতা- ৯/ যথাক্রমে ১৮ টাকা, ১৫ টাকা

কবিতা, অনেক অকবিতা, অনুবাদ কবিতা, কয়েকটি আলোচনা এসেছে 'অবতীর' এখানে 'ভজ্ঞানো দরজা ঠেলে/ ঘরে ঢেকে বিশপ্ন বাতাস'।

অবতীর — কমলেন্দু দাক্তিও/ সিংমা, কল-৯/ ২০ টাকা

'গান গানের হাতের ধারে গা এলিয়ে শুয়ে আছে রোদ', একে কবি 'অদ্ভুত বিপজ্জনক ধারা' বলেছেন। যা 'দেখতে থমকে দাঁড়িয়েছে মুহূর্ত'। এমন কবিতাকার পাশে 'শাখার সিঁদুরে আজ সন্ধ্যা হয়ে এলো/ ও সেনা বৌ, আমি তোমার শিল্পজ্ঞ'। সারেলা, গ্রামীণ অনুষঙ্গ কবিতাতে মুটে উঠেছে গজীর পর্যবেক্ষণের চিত্রকর 'দীঘলের জাল ফেলা দেখে নিয়ে প্রকৃত স্বপ্নে/ দু'ফোটা বৃষ্টিজল কলপাতা ছুঁয়ে করে পেল'। বাঃ!

মৌন যোগাযোগ — সুব্রতনারায়ণ রায়/ জলসিপি প্রকাশন,
করিমগঞ্জ, আসাম/ ১০ টাকা

'জাপানী সিলেবল বাংলায় রূপান্তর সহজলভ্য না' জেনেও হাইকু অনুবাদ কবিতা অনির্বণ রায় The Penguin Book of Japanese Verse পড়ে। ৫৩টি হাইকু আছে। তার একটি— 'সারাদিন কেবল বরষের ফিসফিসানি/ আকাশ ফেলে রেখে/ পৃথিবী উগাও'।

তিন লাইনের কাব্য — অনির্বণ রায়/ কল-৩১/ ১০ টাকা

দুই বাংলায় নামী-অনামী কবিতা দু'টি বইতে যথাক্রমে সূর্য সেন ও আয়েদকরকে কবিতায় শ্রদ্ধাঞ্জলি করেছেন। অল্প মিত্র, অন্নদাশঙ্কর, কৃষ্ণ ধর, সুনীল, শক্তি-সহ অনেক কবির কবিতা আছে। বই দু'টিতে মাঝে মাঝে প্রকাণ্ডের বর্ণনাজালা সম্পাদন করেছেন তিনজন সম্পাদক।

সূর্য প্রশ্নাম — কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় সংহতি সংসদ/
২০ টাকা

আবেগবরকে নিবেদিত — আশীর্বাদ প্রকাশন, কলকাতা-৮৯/

২৫ টাকা

পাতায় পাতায় দেবব্রত ঘোষের শক্তিশালী ক্ষেত্রে সমৃদ্ধ ছড়াগৎকলন 'গঙ্গার জল পদ্মার পানি'। ছন্দে, শব্দ প্রয়োগে সফল অনেক ছড়া কাব্যগুণে কবিতার মর্যাদা পেয়েছে। যদিও প্রবীণ ছড়াকারের প্রভাব এড়াতে পারেননি ছড়াকার। তবে তাঁর মূল মনটি ভালো লেগে। 'গঙ্গাতে যে জল থৈ থৈ/ পদ্মাতে সেই পানি'।

গঙ্গার জল পদ্মার পানি — শৈলেন্দ্র হালদার, আশীর্বাদ প্রকাশন,
কল-৮৯/ ১২ টাকা

পর্যালোচনা:

'সুমনের গান সুমনের ভাষা'

সুভাষ বাগচী

শ্রী সুমন চট্টোপাধ্যায় সৃষ্ট বাইশটি বাংলা আধুনিক গানের সৃষ্টি-মুহূর্তকে চিত্রিত করে সুমনের নিজস্ব কিছু কথা— এই নিয়েই বইটি, 'সুমনের গান সুমনের ভাষা'। গানের সুর বা কথা নিয়ে কিছু বলার জায়গা নয় এটা, যদি বলতেই হয় দু'কথা এই ভাষা নিয়েই। সেখানেও আবার পর্যালোচকের বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা এসে পড়ে। সৃষ্টিকে কনসিড করার প্রক্রিয়াটা খুবই ব্যস্তিত একটি ব্যাপার এবং সেটি বেশ জটিলও। এর বিচিত্র রমায়ণ এক-একজন শিল্পীর ক্ষেত্রে এক-এক রকম। আর এই রকমধেয়টি নির্ভর করে বিভিন্ন উপাদানের ওপর: শিল্পীর জন্মজাত প্রতিভা, মনোবৈজ্ঞানিক, ভাবার ধরন, রীতাকৌতল্য করার ক্ষমতা, বিষয় বাছার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ, জীবনের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি ইত্যাদি, অধিকন্তু (সিমেণ্টে সঙ্গীতের মতো শিল্প-মাধ্যমের ক্ষেত্রে), একটি সুসিদ্ধিত নির্দিষ্ট তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক শিক্ষা-প্রশাসনিক দীর্ঘ অনুসরণের ফলস্বরূপ অর্জিত শিল্পীর নিজস্ব শিল্প-মাধ্যমের ওপর দখল। এই সবকিছু জটিল পারম্যুসেলিন-কণ্ডিনেশনের ফলেই সৃষ্টি হয় একটি কবিতার বা গানের কথার যার সাটিক প্রতিক্রিয়ায় বিশ্লেষণ স্বায় শিল্পীর পক্ষেই করে ওঠা অনেক সময় সম্ভব হয় না, পর্যালোচক তো কোন ছাট। কীভাবে, কোন কনজাট বা বদনজাট জটিল প্রক্রিয়া থেকে সৃষ্টি হয় 'চুল তার কনজাটর অন্ধকার বিবিশার নিশা', 'শরমিন্দা হলে সুনি, ক্ষান্তিহীন সাজল চুপে/ মুখে সেবেল আদ্যাদ্য', 'কেউ কি জানে প্রাচীন/ ' 'সোলালি কবির'। আল মাহমুদ, 'দেউ কি জাগালে শালদন, বাহরুগ চারিধারে', 'অন্ধকার শালদন': শক্তি চট্টোপাধ্যায়। বা 'ভরসা থাকুক টেলিগ্রাফেরে তারে বাস ফিঙের

এম্বুসমালোচনা

দ্যাজে', 'ভরসা থাকুক': সুমন চট্টোপাধ্যায়) — শিল্পীর পক্ষেও বলা হয়ত মুশকিল। একে শিল্পী স্বয়ং যদি এর কোন ব্যাখ্যা দেন (বা সেওয়ার প্রয়াস করেন) তাহলে সেটা (এবং 'সেটা'ই) মানতেই হয়— মতভার বা বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে কারও সম্ভাব্য থাকবেও। তবে এটা চিন্তা যে, কোন একটি গৌণ কবিতার বা গানের কথাই মূল ভাব বা ভাবনার জন্মের মুহূর্তকে ধরা, ব্যাখ্যা করা যথেষ্টই সম্ভব। তবে সেক্ষেত্রেও শিল্পীর ভাষাকেই শেষ কথা বলে মনে নিতে হয়, যেহেতু, শিল্পকর্মে তাঁর সৃষ্টি এবং সৃষ্টির প্রাক-মুহূর্তকে অনুভবিত বিবৃতিটিও তাঁরই। পুরো ঘটনাই সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত এবং ভাবনার প্রতিক্রিয়াটিও শিল্পীর নিজস্ব। পর্যালোচকের সীমাবদ্ধতা ও অসহায়তাটা চিক এই কারণেই। শিল্পীর ভাষা যদি কোথাও আরোপিতও মনে হয় (খুব কী বা স্থূলভাব না হলে) তা বলা, আমার মতে অসমীচীন।

সুমনের গান আধুনিক গান; যথার্থই আধুনিক। এই আধুনিকতা মূলত গানের কথায়। সুমনের বিশেষণ এখানেই যে প্রথমে সুমের একটা কর্মামো তৈরি করে নিয়ে তার ওপর কথা উত্থাপন করেন না— সে ব্যাপারটা, রবীন্দ্রনাথের পর থেকে (কিন্তু ব্যতিক্রম ছাড়া) অব্যাহতি হয়ে এসেছে, হয়ে চলেছেও। ঘটনটি আক্ষরিক সভাভবে না ঘটলেও অর্থাৎ কোন ফর্মাইসি রীতিকার একটি গতানুগতিক গানের কথা প্রচলিত অধিকে (একটি স্থায়ী, দু'টি অস্থায়ী ও একটি সম্ভাব্য) লিখে দিলেনও সুমকারের নিজস্ব ভাবনাত্মক বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যথেষ্ট বিশেষণ এটাকে নিয়েই যে কীভাবে কথার নৌকায় সুমের শোকে গীতীয় পার করে সম্ভব হল সুমকার হিসাবে। যেহেতু সুমের কারবারের একমাত্র উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্য থাকে সুম নিয়েই, কথা (বা বর্ণী) হয় তাঁর কাছে একটি মোটামুটি বাহন মাত্র একটি পূর্বনির্ধারিত বা সম্পূর্ণ পূর্বক প্রক্রিয়ায় তৈরি সুরকে উত্তরে দেবার জায়। অতঃ, এই দু'টিতেই উক্ত হবার কথা। সুমন এই প্রচলিত রীতির বিপরীতে একটি বিষয় বা ভাব তাঁকে করে নিয়ে প্রথমে সেটা কথায় প্রকাশ করেন। তারপর তাঁকে সুর প্রয়োগ করেন— যটটা সম্ভব সম্ভব সুর। 'প্রকৃত' শব্দটা এখানে খুব ভেবেই বসানো, কারণ তাঁর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য একটা শ্রোতা যেন গানের কথাগুলো শোনে, অনুভবানোর চেষ্টা করেন, সুর যেন কথাকে ছাপিয়ে প্রগলভ হয়ে উঠে শ্রোতাকে জালিয়ে না নিয়ে যায় ইচ্ছায় সুমের অকূল পাথারে। সুম যেন যথার্থই কথার বাহন হয়। এককথা, সুমের গানের কথাই সুমের যারাকে, রূপকে নির্দেশ দেয়। তাই এই শিল্পীর অধিকাংশ কবিতাই সুমের একটা সারল্য লক্ষ করা যায়— যদিও কোথাও কোথাও আপাত-সারল্যের আবরণে বেশ জটিল। যাই হোক, আধুনিক বিষয়, ভাব ও ভাবার উপাদানে পুষ্ট সুমের প্রাসঙ্গিক গানের কথায় আধুনিকতা, কথা ও রীতিমততার অন্তর্ভুক্তন থাকা সত্ত্বেও তা আধুনিক কবিতা ও রবীন্দ্রনাথের রীতিকবিতা থেকে পৃথক একটি শিল্প যাকে

নির্দিষ্টভাবেই বলা যায় 'নগর লোক কবিতা'। অর্থাৎ আধুনিক কবিতা ও নগর লোকশীতির সংশ্লেষ ঘটছে সুমের গানের কথায়। প্রথমে সুমের গান নিয়ে কিছু বলা না হলেও এ কথাগুলো বলতে হল একটাই কারণে, তাঁর কথায় কবিতামর্যিতা যে আছে সেটা বলার জন্য।

এই বইটিতে বাইশটি এই ধরনের কবিতার মুহূর্ত ধরা আছে সুমের নিজস্ব ভাষায়। এই ধরনের ভাষায় প্রশংসিত যুগটি এড়ানো যায় না তা হল, 'আরোপণ'। আরোপণক দু'খিক থেকে খোঁচা যেতে পারে। প্রথমটা হল, লেখক জনাতই অস্বাভাবিকই কিছু আরোপিত ব্যাপার নিয়ে এসেছেন তাঁর ভাষায়। আর বিতীটাতা হল, পাঠকের নিজস্ব অভিজ্ঞতায় হয়ত মনে হচ্ছে, ভাষার অমুক অংশটা আরোপিত। যেহেতু 'আরোপণ' ছাড়া সাহিত্য হযনা তাই এধরনের লেখাতোও আমি সেটা মেনে নিতে প্রস্তুত। তাই কোথাও কোথাও আরোপিত মনে হলেও অভিযোগ নেই। শেষ ভাষের সমর্থনী লেখা 'কবিতার মুহূর্ত'-এর অংশবিশেষ সম্বন্ধে একই প্রঃ তুলে নেভাভে অভিযোগ বিলিয়ে নিয়েছি।

সুমন তাঁর ভাষায় সফল। নাগরিক লোক কবিতাগুলি সৃষ্টির প্রাক-মুহূর্তগুলিতে তাঁর ভাষায় যে সমস্ত কথা ভাষায় ঠেঁকেছেন তাঁর সার্বভৌত প্রশংসার্য। সহজীভা ভাষায় সুমের এই অন্তরঙ্গ প্রতিবেদন আমাদের জানিয়ে দেয়, শিল্পীর ব্যক্তি চরিত্রের কিছু চিক— যে সম্বন্ধে শ্রোতারের বেশ কৌতূহল ছিল। যে সুমন নিজের কথায় সুর নিয়ে সৃষ্টি করলেন এক অন্য গান, সেসব গান কোন সম্ভবতার ছাড়াই নিঃসৃত একটা গিন্ধেয়বিজার ও একটি চিক বোর্ড একত্রে সামলান নিরুত পেশাদারি দক্ষতায়, পরলক্ষ্যই হাতে তুলে দেন মস্তক শোয়ানো গিটার, আর তাতে ঘরেন 'দেখানোর ক্ল'—এর মতন যোগিয়ায় বাঁধা দুঃস্থ গান, একনাগড়ে গান দু-তিন ঘণ্টা, যে সুমন মস্তক দাঁড়িয়ে ঘামিগালাজ করেন আবার দু'হাতে মুখ থেকে কেঁদেও ফেলেন, যে শিল্পী (এ দেশে এই প্রথম) দু'তিন হাজার শ্রোতাকে দিয়ে নিজের সঙ্গে সম্বন্ধে কণ্ঠে গান ওগদান, যে সুমন চাইলেই কোনোরিয়ার স্রমিকদের নায়া আন্দোলনের সমর্থনী দায়— সেই সম্বন্ধ enigmatic iconoclast সঙ্গীতজ্ঞ সুমন চট্টোপাধ্যায় আসন্ন সৃষ্টির পূর্ণপরিপুষ্ট শুধুমাত্র একজন সঙ্গীতজ্ঞের অজ্ঞানেই নন, একজন শিকিত-সচেতন বুদ্ধিধারী, একজন কনসার্নড হিসাবে, একজন হৃদয়মান মানুষ হিসাবে কী ভাবেন, কীভাবে ভাবেন, কেন ভাবেন, কোথায় ভাবেন, কী ধরনের বিষয় ও ভাব নিয়ে ভাবেন— সবকিছুই এক মস্তজ্ঞানী বীরগণ, স্বভাবতই ব্যক্তি সুমনকে শ্রোতারের মনের কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। এটা দু'পক্ষেরই লাভ।

'উত্তরও তো জানা'— শীর্ষক গানটির ভাষায় (যে ডিলানের 'ব্রোহ্মি ইন দ্য উইল্ড' গান অবলম্বনে) সুমন আবারে জ্ঞানান, 'ছেলেবেলা থেকে শোনা-শেখা-গাওয়া বাস গানগুলোর সঙ্গে

আমার সম্পর্ক তার আগে থেকেই নানান প্রস্নে জর্জরিত। ...সে বড় যন্ত্রণা, আর্থিক চিন্তাভেড়নের সময়। ভেতরে ভেতরে ঝলে পড়ে মরি।—এমন সময় একদিন ডিলানের গান শুনলাম। শুনেই ‘মানে হুয়েলিঙ্ক—একটা গল্পের আভাস পাচ্ছি। কিন্তু পথটিকে তো আমার পদ হুয়ে উঠতে হবে। সেই থেকে বেঁচেয়ে গান বাঁধার জোড়াজোড় শুরু।’ এইভাবে ঘাঁস সঙ্গীতভেড়নের (যা আসলে একধরনের জীবনসংগ্রাম) আর্থিক বোঝান তার মূল্যবোধের সফল পরিচয়িত্ব বাল্যে আর্থিক গানের প্রেরণা যা, ‘তোমাকে চাই’, ‘দানব’, ‘এক মুহূর্ত’, ‘তিনি বুক হলে’, ‘এর মজা পূর্ণাঙ্গহীন নারায়ণী’র তুলনায় পারেন এতে আর আশ্চর্যের কি? এই গানেরই ভাষে উপরি পাওনা হিসাবে আমরা জানতে পারি, শিল্পীর অজানা অবচেতনে ক্রিস্টাশিল সেই রহস্যময় দীর্ঘ প্রক্রিয়াটির কথা ব্যর্থ পদ বেয়ে প্রায় চোদ্দ বছর ধরে ‘নিজের অক্ষমতার সন্ময়ে ভাসে সবেমাত্র জড়াই’-এর শেষে ১৯৮৭ সালে কালেন শহরে ভয়েস অব জার্মানির দপ্তরে মাঝরাতে বরষ তর্কময় বাস্তব সন্ময়ে মাথায় ‘উড়ে সেসে জুড়ে বসল : ‘প্রশ্নগুলো সহজ আর উত্তরও তো জানা।’ আর তারই সূচক বসন্তের তেরি হল পাঁচ মাত্রায় বাঁধা একটি নতুন বাল্যে আর্থিক গান—যেখানে ডিলান যেন থেকে নেই; এখানেই সুমনের প্রতিভা।

পরিবেশ-সচেতন নাসরিক সুমনকে আমরা পাই ‘জঙ্গলী গান’-শীর্ষক গানটিতে ভাষে; যেখানে মধ্যবিত্তীয় নিরাপদ দুপুরে দাঁড়িয়ে যা-হুতান না করে যা পাটি-প্রোডাক্টের আঁতড়াকতে শুভম্বা পালাপালির মাধ্যমে নাসরিক কর্তব্যাক্রম না সেয়ে ফুঁকি নিয়ে শবে নেমে এগে বাঘা দিয়ে বলতে পারেন, ‘আমাকে না মেরে মাটি বা গাছ কোটাই কাটা হবে না।’ আর তার কয়েকদিন পর এক কান্ডালে লিখে ফেলতে পারেন এইরকম অনুশ্রম চর্যটি লাইনের এক স্তবক:

নিজের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে
দুস্তর জঙ্গলী গাছ
চারপাশে তার শানায় কুড়ল
বোম্বদুস্তর ভবিষ্যৎ।

দ্রী’র অপভ্রংশের সূত্রে নাসিগেহেমের বিচ্ছিকিতে দাঁড়িয়ে কুব্জাক্ষরদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে সুমনের দুটি এড়াতে পারেন না অনতিদূরে গাছতলায় পাতা মসারেরে অনুশ্রম বৃত্তান্ত (“গানের তরায় ঝলছে উদ্দন”; এমনকি সেখানে নিশ্চিতও যুগ্মত একটি কুব্জের উপস্থিতিও প্রাসঙ্গিক হবে ওঠে। আবার দাঁটিগঙ্গা ফাঁড়ি মজা বাস্তব ও ট্রান্সিক জাম-কুয়ায় ঘোড় পার হয়ে হুতও এই শিল্পীর উল্লেখ অনুসন্ধিস্থ দুটি ছেঁকে তুলে নেয় সেইরকম বাস্তবের অঙ্গুলি মাঝারের দাঁড়িতে বসে স্কটি হাত নেড়ে চমকায়ন জানতেওয়ে “টা টা” করা শিশু-বালিকার ছবি (“দারের হাতে বসে বাচ্চাটা”)।

উদাহরণ আর না বাড়িয়ে শুধু এটাই বলা যায় যে, আলোচ্য

বইটি এক নিঃশব্দে শূন্য ফেলার পর আমরা এমন একজন স্বাস্থ্যসম্পূর্ণ সঙ্গীতভেড়মকে পাই যিনি একইসঙ্গে শিল্প ও সার্বিক জীবনের উৎসে উত্তীর্ণ; যিনি চোখ-কান-মন খোলা রেখে চলেন ও ভাবেন। যার মনম সর্বত্রগামী হবার ভ্রান্তে প্রয়াসী।

এইভাবে ‘সুমনের ভাষা’ আমাদের চেনায শিল্পীর ভিতরের এক অন্তর উন্মীষ অনুভবে, বেরককটি অন্তর সঙ্গীতশিল্পীর স্পেয়ে এর আগে এভাবে আমরা পাইনি। সৈনিক থেকে সুমন অননা ও দৃষ্টিভ্রমক।

পরিবেশে ছোট একটি প্রশ্ন—বইটির একেবারে প্রথম লাইনেই একটি তথ্যগত ভুল চোখে পড়ল। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে তিনি নিজের তৈরি ‘নাসরিক’ নামক একটি দলে গান গাইছেন (দ্রষ্টব্য ‘হুয়ে ওঠা গান’—লেখক, সুমন চট্টোপাধ্যায়, দারদীয় ‘আজকাল’।) ভয়েস অব আমেরিকা-য় চাকরির সূত্রে এখানেইউনের পথে তিনি রওনা হন ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮০। আমরা মনে হয় সম্ভবতা হবে আশির ডিসেম্বর। আশে কপি এটা সুমনের স্মৃতির বিশ্বাসঘাতকতা নয়, লগারাই ভুল।

সুমনের গান সুমনের ভাষা—সুমন চট্টোপাধ্যায়/ পরিবেশক-পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯/ ২৫ টাক

রম্যানি বীক্ষা মধুরাংশ

বারিদবরণ ঘোষ

ভারতবর্ষের নানা জাতির নানান বিশেষণ থাকতে পারে, কিন্তু ভ্রমণশিল্পীসু জ্ঞাত বলতে বাঙালিকেই বোধকরি বিশেষভাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। তার ভ্রমণ শিল্পীসে কেউ অনুসন্ধান করলে এভাবে নিয়ে এই ভ্রমণকারীদের কেউ অনুসন্ধান করেন ইতিহাসকে, কেউ জানতে চান প্রকৃতিবাহী মূল্যকে, কেউবা শুধু বড়ানোর চেনায়ে—দেখব এবার জগৎটাকে—ভাব নিয়ে দূরে বেড়ান। অধ্যাত্মশিল্পীসু তীব্রে নিয়ে সন্ধান করেন প্রাণের আয়ামের। আবার তাঁদেরই সঙ্গে একজন হতে যান প্রকৃতির অপর হার আর সৌন্দর্যের অপর করতো। উদ্দেশ্যে হতে পৃথক—কিন্তু প্রান্তিক ঘরে জমা পড়ে ভারতের প্রাণরসের অন্তর সন্তান। এও অনুসন্ধানের সূত্রেই বাল্যের বিশেষ গায় পঙ্কায়িত্ব, মধ্যপ্রদেশে মিলে যায় কেবলে। গড়ে ওঠে একটা জাতীয় সংহতি—এক জাতি এর প্রাণ একতা।

এত সং কথা আবার করে মনে হল, মধুরাম বসুর বই দুটি শূন্যতে গিয়ে। বাংলা ভাষায় সাহিত্য এখন বেশ পরিচিন। তৈয়্যাদেবকে ঘনি প্রথম বাঙালি শিরব্রাহ্মকে দিয়ে শিরোমণি বলা যায় তো, তৈয়্যাদাশ্রিতব্রাহ্মের অপরকো ভ্রমণকারিহীন স্বাদ বর্তমান। তবে সচেতনভাবে অপরকো প্রথম রচনা করেন সম্ভবত

বিজয়রাম সেন। তিনি অবশ্য নিজের বেড়ানোর কথা লিখতে চাননি। লিখেছিলেন, তাঁর প্রেমী কৃষ্ণচন্দ্র যোগেশ্বরের অপরকো। নিজের কথা লিখে যান ভ্রমণে যুগ্মাধ্য সাবলিগার। তারপর থেকেই ভ্রমণকারিহীন রচনা ট্রাডিশন আজও সমানে চলছে। এখন অবশ্য বিদেশে ভ্রমণ আকৃষ্ণার হুড়ে বলে বিদেশ-ভ্রমণ-সাহিত্য বাহাল্যে একটা বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। কেউ আবেশে শুধুভ্রমণ পশ্চিমবঙ্গকে কেন্দ্র করেই তাঁর অভিজ্ঞতার কথা লিখে প্রকাশিত। তবে ‘একটি ধানের শীলের উপরে একটি শিল্পীরবন্দু’র চোখে বাঙালিকে ভারতের পাশ্চাত্য-সঙ্গীত-সম্প্রদায় প্রাণি ধ্বংসাবশেষ-মন্দির-মসজিদ অজ্ঞেভবতে আহুতন বসন্ত চলছে তাই ভারতবর্গকে নিয়ে ভ্রমণকারিহীন সংখ্যাই এখন বেশি।

এই দেশীয় ভ্রমণ সাহিত্যেও ইংল্যান্ড একটা চরিত্রগত পরিবর্তন ঘটেছে। প্রবোধকরণ সানাদ, উদ্যোগ্য মুখোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকগণ যে দুটিভর নিয়ে ভ্রমণসাহিত্য রচনা করেছেন, তার পাশাপাশি গাইজ জাতীয় কিছু বইও এখন দেখা হচ্ছে। কেউ বা সাহিত্যে গাইজ জাতীয়—উভয় চরিত্রকে সমিতি করার চেষ্টা করেছেন। মধুরামবসুর বই দুটি পড়ে আমরা মনে হচ্ছে, লেখকের উদ্দেশ্য হল এই বইশ্রেণি শ্রেণীর গ্রন্থরচনা করা। সেনেরা তার বইতে ভ্রমণের আনন্দের পাশাপাশি দুঃস্ব, ব্যাঘাত, আনুশঙ্কিক ব্যয়, গমনব্যয়, দ্রষ্টব্য হাবেরে দক্ষাওয়ারি বর্ণনা, বাসগৃহ ইত্যাদিরও প্রাসঙ্গিক উল্লেখ রয়েছে। গাইজ জাতীয় বই ভ্রমণকেই মানুষকে সহায়তা করে সন্দেহ নেই, কিন্তু সং ক্রিষ্ট এও ভ্রমণ বললে যাচ্ছে যে ভ্রমণ এর নতুন সংস্করণ প্রকৃতি না হলে এর একটা কোন অংশ অকল্পেই হয়ে পড়ে। বলা বাহুল্য, মধুরামবসুর বইটি এই ত্রুটি অতিক্রম করতে পারেনি।

কিন্তু এই বলতে তো বইটির মূল্যকে ঘাইই কমলে চলবে না। এর একটা দৃষ্টি আনন্দের দিকও আছে। আর তাঁর ঘোরে এ দুটির আবেদন এখনও আমাদের কাছে ঝুঁজিযুগ্মাধ্য বেড়ানোর বিবরণ। এগুলি বইটিকে আছে ভারতের আটটি ভ্রমণকারী বেড়ানোর বিবরণ। এগুলি লেখকের কান্যাকুমারী, রায়বন্দর, প্রকৃতিভার, কালাতি, গোয়া, কোভাম, উদ্যোগ্য-কোভামইকাল এবং মহাশক্তিপুত্র। এরের মধ্যে লেখক নিজেরই জন্মভূমি, তার প্রিয়তম স্থানটি হলে কান্যাকুমারী। এর আশ্চর্য্যে তিনি পর পর প্রিয়তম স্থানটি এবং ১৯৮৭ এখানে বেড়াতে এসেছেন। পৃষ্ঠা দুইরকম ১৯৮৬ এবং ১৯৮৭ এখানে বেড়াতে এসেছেন। পৃষ্ঠা সংখ্যার বিচারেও এই ‘পঞ্চপাতি’ ধরা পড়ে গেছে। যেখানে অন্য প্রাসঙ্গিক হলে ছোট অধিকসংখ্যক পদেরো পৃষ্ঠার পরিচয় নিয়েছে, কান্যাকুমারী সেখানে চিহ্নভাষ্যি কেতে নিয়ে বর্ণিত হয়েছে চরিত্র পৃষ্ঠা করে। উল্লেখ্য করার বিষয়, লেখকের জীবন বইটিকে ভারতের অন্যান্য দানীয় নানা হাবেরে উল্লেখ থাকলেও একমাত্র কান্যাকুমারীর প্রাসঙ্গিকই পুনর্লজিত ঘটেছে। এ থেকেও লেখকের ভাল লগার ভালোয় কান্যাকুমারী যে শীর্ষে হয়েছে বোঝা যায়। বিবেকানন্দ স্মৃতিবিজড়িত ভারতের দক্ষিণ প্রান্তের এই শেষ

তীর্থের জন্য পণ্ডিতের আকাজক্ষাও অবশ্য কম নয়। জীবন বইটিকে বর্ণিত হয়েছে তৈয়্যাদাশ্রিত হাবের বিবরণ। এদের মধ্যে ‘নেপাল’ ও-এসে পড়ায় বর্ণিতভারত তৈয়্যাদিত এই বই প্রবেশ করেছে। আলো ভারতীয় পণ্ডিতের কাছে এই ‘বিদেশ’-ভ্রমণ সহজভাবে বলে এখানে মনে আসেবে যান, তেমনি বিদেশি মালগুর কোবার এই ফার্মুদিয়ে অনেককে আকর্ষণের মধ্যে এসে যায়। জীবন বইটিকে বর্ণিত বিবরণে একটি ভ্রমণকারী লিখেছেন। কারণ অনুসন্ধিস্থ পঠক হতে এখন থেকে তাঁর পছন্দসই হ্যাটারি কথা জেনে নেবার জন্য উদ্দেশ্যী হলেন। নেপাল, মহাকালমধ্য, মৌর্যভিষ্ণু, লুইসী-কুশীপুত্র, হলমহে মিশুপুত্র, মধুরাম, সোমনাথ-প্রভাস, দারদ্য, এগেবের, ওকোবের, পাচমটী, অমরকণ্টক, উজ্জয়িনী, রাজহন্য, কাম্বীর, ভালহৌসি-চনা, কুল-মানালি, কুম্ভান-হিমালয়, শ্রাবস্তী, অযোধ্যা, বৃন্দাবন, হরিদ্বার, নন্দকানন, সহস্রাবার, বায়দাহে, পোরবন্দ, তিরুটি-জানজাবু, মহীশূর, পশ্চিমতি, কান্যাকুমারী, রাজগির, নালদা, কালীঘোরা এবং মিরিক।

তালিকা থেকে পাঠক সহজেই লক্ষ করবেন পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে এখানে মিরিক এখানে আলোচিত এবং উদ্দেশ্য-সম্পৃক্ত অনুশ্রিত। এটা তো এ বইয়ের একটি বইতে পারেন না। তবে পাঠকেরও তো কিছু প্রত্যাপ্য থাকেই কেউ কেউ হতে এটিকে উজ্জয়িনী ‘নন্দকানন’ এর প্রথম পদে। কিন্তু এটি আসলে উত্তরপ্রদেশের ‘জালি অব ভ্রমণকারী’ বা হুলো-কি-ব্যাটীর বর্ণনাকর্ম মাত্র। তেমনি মধুরাম বিহারের গিরিটি-সমিতিতে কোনও স্থান নয়, এটি কোচবিহার শহর থেকে সাত মাইল দূরেই একটি গ্রাম।

বইটিকে বর্ণিত হবারদ্রি সম্পর্কে আলোচনার বিশেষ কিছু থাকতে পারে না। একটি তথ্য এখানে সর্বিষয়ের নিবেদনযোগ্য সে, লেখক নিজের যা চোখে দেখেছেন, তাই বর্ণনা করেছেন। যা পড়েন তা লেখেননি। তাতে হতে বর্ণিত হ্যাটারি বর্ণনায় দুর্বলতা আনেন। কিন্তু লেখক সং থাকতে হ্যাটারি বর্ণনায় বিবরণ বার করে বা তথ্যশক্তিক থেকে তিনি বিষয়টি ‘আনুভবনীয়’ করে নেবার জুয়াচুরি করেননি। এখানেই ট্রাডেল গাইজের প্রচলিত ধারণা সঙ্গে তাঁর বইয়ের চরিত্রধারণা একটা বিরতি পাঠক।

ভবুও কিছু বিবরণ অভিজ্ঞপ্রান্তিক থেকেই যায়। আলাদার বর্ণনা করেছেন লেখক অপর বারিদ মসজিদের বার বসেননি (তখন তো এর প্রথম পরিচয় ঘটেনি)। এটা অনুশ্রুত বল মনে হয়েছে আমার। এটা তো ঐতিহাসিক বিবৃতি। আবার বর্ণনার মধ্যে ভ্রমতা থাকার কারণে পণ্ডিতের পরিচয় মধ্যে দেখার যে অমান, সৌন্দর্যবর্ধনের যে সুবর্তি, প্রকৃতি যে বসনা—জা নেই আমার একটুও ভোগ করতে পারি না। যুগ্মারের বর্ণনায় গল্পরকম সেই প্রতীক ভাসানোর দৃশ্য, প্রতি সন্ধ্যায় ব্রহ্মকণ্ডের আরতি-গান আর শিল্পার্য প্রগ্রহমাভ্যাস যে আশ্রয় সহমতিত দর্শন উপলব্ধি করেন তা যেন অনেক জগদ্ব্যবহিত অনুশ্রিত।

তবুও এই বই দুটিতে প্রায়শই লেখক নানা স্থানের প্রাসবে রীতিনীত্য, জীবনানন্দ, কালিদাসকে যখন স্মরণ করছেন সেখানি অথবা গান্ধীজি, বিবেকানন্দদের স্মৃতি যথোনে লেখককে উল্লিখিত করেছেন—তখনই লেখকের মনের ব্যাপ্তি আমরা অনুভব করি। মনে মনে কৃতজ্ঞ থেকেছি লেখকের কাছে। এই কৃতজ্ঞতা যথোনে পাঠক অনুভব করবেন, সেখানেই শ্রীকৃষ্ণ বসু লেখনী সার্থকতা পাবে। ১৯৭২ থেকে ১৯৮৯-৭৩ মধ্যে দেখা অনেক পরিবর্তন আছে। ১৯৮৯-৯০ তো আরও বদলে যাওয়ার কথা। তবুও ইতিমধ্যে অবশেষে বদলে যায় না, কিশোরীজি জ্য অধ্যাপক হয়ে যা। টাঙ্গা-পদ্মাসার হিসাব বদলে যাবে কিন্তু আনন্দের উৎস চিরকালীন থাকবে যাবে।

আনন্দ আছে নিখিলে—মহুদান বসু/ পরিবেশক—পুস্তক বিপণি/ ২৫ টাকা

সব দীর্ঘ মোহর হয় আছে—মহুদান বসু/ পরিবেশক—পুস্তক বিপণি/ ২৫ টাকা

স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের ইতিবৃত্ত নির্বাহ বসু

সাম্প্রতিক কালে বিশ্বের নানা দেশে শিল্প-শ্রমিকদের বিষয় অর্থনীতিবিদ, সমাজবিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আমেরিকা দেশেও 'লবার স্ট্রাইক' ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রাক-স্বাধীনতা যুগের শ্রমিক আন্দোলন নিয়ে বড় গবেষণা দেখা যায়, স্বাধীনতা-পরবর্তীকালের সম্বন্ধে তেমন বিস্তারিত আলোচনা এখনও হয়নি। সেখান থেকে ১৯৭৬ সালে প্রাপ্ত পি এইচ ডি-র বিশিষ্টের উপর ভিত্তি করে লেখা ১৯৯২ সালে প্রকাশিত আলোচনা বইটিতে 'শায়েদানিয়ার' বলা যায় যা বঙ্গবীরের চরিত্রা মোটো।

প্রথম অধ্যায়ে সাধারণ অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করা হয়েছে। ঔপনিবেশিক অর্থনীতি, রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও দেশত্যাগজনির সমগ্রায় অল্প কয়লা লেখক তুলে ধরছেন। ঔপনিবেশিক অর্থনীতির (অর্থাৎ তৎকালীন অভিজাত ব্যাংকার পশ্চিমবঙ্গ) নানা পরদেস শিল্প সমৃদ্ধ ছিল, যদিও তার মালিকানা ছিল বিদেশি কোম্পানির হাতে। স্বাধীনতা-উত্তর কালের প্রসঙ্গে লেখক সারসরি সাহায্যে দেখাতে চেয়েছেন, জনসারিত দমন এবং সেই বর্ধমান জনসংখ্যার নারকরক্লিষ্ট জীবনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সর্বভারতীয় গুরু চাইতেও এগিয়ে ছিল (যাচিত্রক কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ দিল্লিতেও মহারাষ্ট্র)। কিন্তু লক্ষণীয় যে, মোট জনসংখ্যার তুলনায় স্বাধীনতা মনুসের হার কমিয়ে দেয় (১৯৬৬ থেকে '৭১ সালের মধ্যে শিল্পায়নের গতি ক্রম হয় এসেছে)। এরপর শ্রম-অর্থনীতির প্রসঙ্গে লেখক সারসরি কয়েকটি

বিষয়ের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। এক ফ্যাক্টরি ও কর্মসংস্থানের চিত্র—১৯৪৭-৬৭ সময়সীমায় মধ্যে সর্বভারতীয় হারের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের কারখানার সংখ্যা আশুপাতিত হার বেশি বেড়েছে কিন্তু তারান্না-শিল্প নিম্নত গণ শ্রমিকদের হাটো অনেক পরিমাণে কমিয়ে। অর্থাৎ নতুন কারখানাগুলি যেহেঁ যাতে যথোনে শ্রমিক নিয়োগের সুযোগ কম। এর জন্য বালার প্রধান শিল্প চট্টোপাধ্যায়ের অক্ষমতাকে দায়ী করা হয়েছে। তুলনায় বালার সূচকসমূহের অসুখ অনেক দূর ছিল। দুই, আইনপ্রণেদের কথা বলতে গিয়ে লেখক দেখিয়েছেন যে, প্রাক-স্বাধীনতা যুগ থেকেই বালারদেশে শিল্প-শ্রমিকদের মধ্যে বহিরাগত বাঙালি শ্রমিকের যে বিপুল সংখ্যা ছিল, স্বাধীনতার পরেও তা অব্যাহত, যদিও মোট হার কমিয়েছে। সম্ভবত নতুন ধরনের শিল্পে যারা শ্রমিক বেশি নিযুক্ত তাত। চট্টকাল বা লোহা কারখানার শ্রমিকের অবস্থা তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি। শ্রমিকদের মধ্যে 'গ্রাম-শহরের' এই টানটানতাপ বাকার হয়ে আবারোশিল্প-এর দরতা সমন্বয় থেকে গেছে। তাম্রাতা, শ্রমিকের সামাজিক, নৈতিক ও নৈতিক শাস্ত্রের উপর তার প্রভাব পড়েছে। অসুখ গ্রামের প্রভাব তেমন আকর্ষণীয় যে কারাগুলি লেখক উল্লেখ করেছেন তার সঙ্গে পুরোপুরি একমত হওয়া কঠিন। তিন, শ্রমিকের বেতন ও মজুরি বৃদ্ধি দিয়ে লেখককে তৈরি অল্প সারসরি ভিত্তি থেকে মোট যে কথাটা বেরিয়ে আসে তা হল, স্বাধীনতার পর সারা ভারতের মত পশ্চিমবঙ্গেও ওয়েয়ে হোর্ড, ইটাইনাল ইন্ডাস্ট্রির সাহায্যে সাধারণভাবে শ্রমিকদের আর্থিক পরিস্থিতি বারোত পাবে। কিন্তু মহাশ্রমিকের হ্রাস প্রকৃত মজুরি তে বাড়িয়েই, অনেক ক্ষেত্রে তা কমিয়ে। তাম্রাতা, প্রাক-স্বাধীনতা যুগ থেকেই রাঙা হার, রাঙার মত শিল্পের ক্ষতি, একই শিল্পের কারখানায় কারখানায় এমনকি একই কারখানার বিভিন্ন বিভাগের শ্রমিকদের মধ্যে যে বেতন বৈষম্য ছিল তা কেটেই যায়। হ্রাস কোনও শ্রমিক সামাজিকগণ করা যায়নি, তবে যোটা পুষ্ট তা হল বালার শ্রমিকের মজুরির হার শুধু মহারাষ্ট্র নয়, সর্বভারতীয় হারের চেয়ে কম ছিল।

এরপরে অধ্যায়ে লেখকের আলোচনা বিষয় পশ্চিমবঙ্গ কর্মবিরতি ১৯২১-৬৭। কর্মবিরতি বদলে লেখক শ্রমিকদের মনোভাব ও মালিকদের আউটি, হল অফ, স্ট্রোকসের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। অনেকক্ষেত্রেই দুটি দলপক্ষের পরিণতিক হয়ে দেখা দিয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা আবার তিনি শ্রমিক আন্দোলনের দৃষ্টান্ত একত্র রেখেছেন। আলোচনা ১৯২১ সাল থেকে শুরু হয়েছে অর্থাৎ প্রথম মহামুসোলের অর্থনীতি ও অর্থনৈতিক বালার প্রস্তুত রাজনৈতিক উত্তেজনার পরিমণ্ডলে প্রথম প্রথম ব্যাপক শ্রমিক আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বর্ণনা অতি সংক্ষিপ্ত। দুটি সারসরি তিন বঙ্গের ত্রিভুজিক মোট কর্মবিরতির দৃষ্টান্ত, তাত কত শ্রমিক মালিক হয়েছে, যোটা কত কর্মবিরতি দাঁড় হয়েছে, এবং কর্মবিরতি কত পাতলা বেতনদ্রবীভবন নিয়ে এসেছে তা দেখিয়েছেন। তুলনায় ১৯৪৭-৬৭ এর আলোচনা অতি বিস্তৃত। কাজেই প্রায় উড়েই পালো যে, ১৯৪৭ সালের আগে ও পরের সময়ে মধ্য আলোচনার পার্থক্যের

দ্বারা যখন অতি স্পষ্ট তখন একটি অধ্যায়ে শিরোনামের মধ্যে তা অন্তর্ভুক্ত করলেন কেন? আবার প্রায়ই সময়কাল যখন ১৯৪৭-৬৭ বলা হয়েছে তখন আলোচনা ১৯৪৭-৬৭ই শেষ হয়ে গেলে কেন? তাছাড়া লক্ষণীয় যে ১৯৪৭-এর আগেরও তিনি বালার ব্যপ্তি বৈশ্ব বদলে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তখন অবিলম্বে বর্ণনা ছিল।

যাই হোক, ১৯৪৭-৬৭'র পরিহিত বোঝাতে গিয়ে তিনি অল্পতুলনায় সারসরি তৈরি করেছেন। সেগুলিতে তুলে ধরা হয়েছে সর্বভারতীয় ও মহারাষ্ট্রের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের চিত্র—যেমন বাৎসরিক কর্মবিরতি সংখ্যা ও তুলনামূলক হার, জড়িত কর্মীর আনুপাতিক হার, মোট ফ্যাক্টরি শ্রমিকের তুলনায় কর্মবিরতি শ্রমিকের হার, শ্রমবিরতি স্ট্রেকের আনুপাতিক হার ও সর্বভারতীয় হারের শতাংশ, কর্মবিরতির মোদনের হার, কর্মবিরতিতে রাজ্যের বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে আনুপাতিক হার প্রভৃতি। এই বিপুল তথ্যসম্পন্ন থেকে যে মোটা বারসরি ছবিটা বেরিয়ে আসে অতি সংক্ষেপে বলতে গেলে তা হল এইরকম, স্বাধীনতার বয়স অর্থাৎ ১৯৪৭-এর তুলনায় পরবর্তী বছরগুলিতে (কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রম ব্যা দিলে) কর্মবিরতির সংখ্যা অনেকটুকু কমো যায় এবং আবার ১৯৬৫-৬৬ সাল থেকে এই সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়তে থাকে। কর্মবিরতি ভিত্তির তুলনায় মোট ৪৪২২টি কর্মবিরতি ঘটনা পশ্চিমবঙ্গে বেশি ছিল, বড় কারখানার চাইতে হোট ও মাফারি কারখানায় কর্মবিরতি বেশি হয় ও বেশি দীর্ঘস্থায়ী হয়।

তৃতীয় অধ্যায়ে লেখক মালিকপক্ষের ক্রিয়াকলাপের হলে উল্লেখ পরিহিত দেখিয়েছেন। এখানে আলোচনা শুরু হয়েছে স্বাধীনতা-উত্তর কাল থেকে, বঙ্গভঙ্গের ১৯৫০ সাল থেকে। তার আগে কোনও তথ্য কোন নেই, তার কারণ হল দৃষ্ট দেখানো হয়নি। মালিক যোহাতি লক-আউটের সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে মহারাষ্ট্রের তুলনায় অনেক বেশি। সর্বভারতীয় সংখ্যা সিংহভাগই হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে এবং এর মধ্যে ক্রিড়ন্ত মোট ৪৭৬৬টি সংখ্যা এবং নী শ্রমবিরতির সংখ্যাও এখানেই সর্বাধিক বেলে। স্ট্রোকস, ব্রিটেক্সট এবং লে-অফ-এর সংখ্যাও সর্বাধিক ক্রিড়ন্ত শ্রমিকের সংখ্যাও পশ্চিমবঙ্গে বেশি। শিল্পভিত্তিক দ্বিধায়ে দেখা যায়, ইটাইনালটি ও বিধি শিল্পই (অর্থাৎ সেসব কারখানা শিল্প ইটাইনালটি আবেক্ষক হোঁ ছিল) বেশি আস্ত্র শিল্পে লে-অফ-এর ক্ষেত্রে অসুখ চটকল ও ব্যাটারি সংখ্যাও বেশি। ১৯৪৭ সালের পর একেবারে ১৯৬৬-৬৭ সাল যখন শ্রমিক আন্দোলন তুলে উঠেছে, ত্রিক তখনই মালিকপক্ষ প্রত্যাহার করেছে। বঙ্গ হারিয়ে কলকারখানা। অসুখ এ ছেলেদে লেখক দেখিয়েছেন যে, শ্রমিক ব্যাটারির তুলনায় অর্থনৈতিক মন্য অসুখ বেশি কাল করেছে। শ্রমিকরা কিন্তু তা বুঝতে চাননি। আর জ্বলী আলোচনার যোটা লোমায় মালিকদের কারখানা বজায়ই সুখিা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে কর্মবিরতির কারণ ও ফলাফল আলোচনা করা হয়েছে। সর্বভাই শ্রমিক কর্মবিরতির সঞ্চে প্রদানত যে কারাগুলি কাল করে তা হল: বেতন, ভাতা ও পেনাস সঙ্কট দর্শিতা, যা,

ছাঁটাই-এর বিরুদ্ধে এবং কালের পরিবেশ ও শর্তাবলীর উদ্ভাস দর্শিত। লক্ষণীয় যে, মহারাষ্ট্র ও সার ভারতে যখন বেতন-ভাতা সঙ্কট দর্শিত দর্শিতের প্রধান এক কারণ; পশ্চিমবঙ্গে তা কমাই ছিল না। তবুও বোম্বের দর্শিত থেকে কর্মবিরতি সংখ্যা ও তুলনায় বেশি ছিল। আর ছাঁটাই-এর বিরুদ্ধে কর্মবিরতি সংখ্যা ও হার ছিল অনেক বেশি। ছুটি বা কয় কালের দর্শিত দর্শিত কর্মবিরতি সংখ্যা ছিল বঙ্গমান্য। কিন্তু 'অন্যদান' কারণে পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যা ছিল বিপুল। প্রকৃতপক্ষে মোট কর্মবিরতি ছাঁটাই প্রধান কারণ ছিল এইগুলি যেমন উচ্চতর কালের পরিবেশ, সারসরি, ইটাইনাল গরুরের আকার ইত্যাদি। কর্মবিরতি দর্শিত আলোচনা করতে গিয়ে লেখক যে পরিসংখ্যান তুলে রেখেছেন তা থেকে দেখা যায় যে পুরোপুরি সফল কর্মবিরতি হার সর্বভারতীয় ভিত্তি বা মহারাষ্ট্রের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে ৫০ এর দশকে অনেক কম। ৬০ এর দশকে এসে ছাঁটাই হোঁ বদলে যায় অর্থাৎ এখানেই সফল কর্মবিরতি হার বেশি হয়। আর আংশিক বারবারই সর্বভারতীয় হারের চেয়ে বেশি। তবে ৬০-এর দশকের আগে পশ্চিম সফল ও অংশবিশ্ব কর্মবিরতির সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে মোট কর্মবিরতি অর্ধেকের কম ছিল।

৫ম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে শ্রমবিরোধ নিম্পত্তির উপায়ের উপর। ১৯৪৭-৬৭ পর্যন্ত মোট ৪৪২২টি কর্মবিরতি ৬৬% নিম্পত্তি হয়েছে। নিম্পত্তির প্রধান উপায় ছিল এইরকম—সরকারি মাধ্যমত (৭০%), নিম্পত্তি, প্রত্যক্ষ বিচারিক আলোচনা (১০%), ২৭২২কো, গণতান্ত্রিক দৃষ্টান্ত (৬৬%), শ্রমিক ছাঁটাই (২৭%), আভ্যন্তরীণ (১৮) এবং অন্যান্য (১০০)। চটকল ও সূতকারের আলোচনা করে সারসরি তৈরি করে লেখক দেখিয়েছেন যে, এই একই প্রসঙ্গই দৃষ্ট শিল্পই কর্মবিরতি। এরপর লেখক সন্তোষের দেখিয়েছেন কর্মবিরতি বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা—যেগুলি আবার ছিল দর্শিত এক একটি রাজনৈতিক দলের শাখা যেমন এ আই টি ইউ সি (কমিউনিস্ট পার্টি), আই এন টি ইউ সি (শাসক কংগ্রেস দল), ইউ টি ইউ সি (কতকগুলি ছোট মাধ্যমিক দলের সমন্বয়ে গঠিত) এবং ছিল মধ্যবর্তী সো (সামাজিক দল)। মাধ্যমিক শ্রমিক বিরুদ্ধে দেখতে শ্রোঁ সঙ্গায়মে ও বিরুদ্ধের পরস্পর হিসাবে, অনাদিক কংগ্রেসের যোহাতি শ্রমিক নীতি ছিল আলো-আলোচনার ভিত্তিতে শ্রমিকদের দর্শিতাও শান্তিপূর্ণ নিম্পত্তি। তবে কর্মবিরতি মধ্যে সবচেয়ে বেশি অংশের দান দর্শি ছিল যে ইউনিয়নগুলি তারা কোনও কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত নয় বা কোনও দলের শাখা নয়। সম্ভবত রাজনৈতিক দর্শিতাও বাধ্যবাক্যতা তাদের সবচেয়ে কম ছিল। মহার ব্যাঘ্র হল যে, আই এন টি ইউ সি ইউনিয়নগুলি কর্মবিরতি ব্যাঘ্রের কমিউনিস্ট ইউনিয়নের চাইতে বড় শিল্পে ছিল না। তবে তাদের সঙ্গে কমিউনিস্টদের তফাৎ ছিল এই যে, কমিউনিস্ট পরিচালনায় কর্মবিরতির আকারও সেখানে যথোনে দীর্ঘস্থায়ী হত, আই এন টি ইউ সি দ্রুত নিম্পত্তি এবং আলোচনা দেখি প্রায়ই ছিল। এই অধ্যায়ে লেখক স্বল্প পরিসরে আর একটি বিষয়ের

প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তা হল, এইসব কর্মবিহীন ফলে টাকার অঙ্কে উপশান নষ্টের ও কর্মিকদের মজুরি নষ্টের পরিমাণ। অবশ্য, নিছক অর্থহীনতা কক্ষতন্ত্রের পুরো পরিচয় পাওয়া যায় না।

৬ষ্ঠ ও ৭ম অধ্যায়ে যথাক্রমে পশ্চিমবঙ্গের চট্টকল ও সূতাঙ্কন শ্রমিকদের কাহিনী সন্নিবেশিত আলাচিত্য হয়েছে। বাৎসরিক ভিত্তিতে প্রমোদনের সংখ্যা, সংকীর্ণ শ্রমিকের সংখ্যা, নষ্ট শ্রমবিহীনদের সংখ্যা, আচ্ছন্ন মোট শ্রমবিহীনদের তুলনায় তাদের আনুশাংকিক হার, কর্মঘণ্টার মেয়াদ; কারণগত জোঁকবিহীন, ফ্যাকল—এই সবকিছুই তাঁর আলোচনার এসেছে। যেগুলি পূর্ববর্তী অধ্যায়ে সাধারণভাবে তিনি আলোচনা করেছেন। তাঁর মূল সিদ্ধান্তগুলিই এখানে পুনরায় সমর্থিত হয়েছে। এখানে কিন্তু একটা কথা বলার আছে। সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রাপ্ত-স্থানীয়তা জোঁকের চট্টকল শ্রমিক কর্মীদের কথা বলতে গিয়ে খিতীয় মহামুদ্রের সময় কর্মবিহীনকে যে চিহ্ন লেখক দিয়েছেন, তা গাণিতিক ভাবে থেকে চিহ্ন হলও সমসাময়িক বাস্তবতার নিরিখে সঠিক নয়। মুদ্রার সময় বর্ধিত হারজনিত কারণে যেমন কোন কর্মী আন্দোলন করেন; কারণের অভাব, মিলগুলির মিলিটারি রিকুইজিশন প্রভৃতি কারণে উপশান বন্ধ রাখতে হয়। সেই সংখ্যাগুলিও কর্মবিহীনদের মধ্যে ঢুকে গেছে। তা না হলে, চিত্রটা লেখক বা রচয়িতা চেয়েছেন, অনুশ্রম ছিল না।

৮ম অধ্যায়ে লেখক সফলত দেখাতে চেয়েছেন, সেইসব শ্রমবিহীনদের কথা যেগুলির জন্য কর্মবিহীন হানি, তাছাড়াই সমসার নিরসন ঘটেছে। এই সংখ্যাও প্রতি বছরই ছিল বিপুল। কিন্তু ৬০-এর দশকের গোড়ায় এসে কর্মহীন হাজার বিধানে নিষ্পত্তির সংখ্যা ক্রমে কমতে থাকে। উভয়শ্রেণির দুটিভঙ্গিও অনমনীয় হতে থাকে।

নবম থেকে পঞ্চদশ অধ্যায় পর্যন্ত গ্রন্থটির খিতীয় পর্ব বলা যেতে পারে। যেখানে প্রথম পর্বে অর্থাৎ ২য় থেকে ৮ম অধ্যায় পর্যন্ত শ্রমবিহীনদের সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে, সেখানে খিতীয় অধ্যায়ের প্রধান আলোচ্য বিষয় হল, ট্রেড ইউনিয়ন, তাদের সংগঠন ও কার্যাবলী। প্রথম মহামুদ্রার পরই ভারতে সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সূত্রপাত ঘনিও ১৯২৬ সালের ট্রেড ইউনিয়ন অ্যাক্টের পরই তা আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পায়। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত যে হিসাব পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় যে, প্রতি বছরই রেজিস্ট্রেশন ট্রেড ইউনিয়নদের সংখ্যা বাড়ছে এবং প্রতি বছরই বেশি সংখ্যক শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়নের ছত্রস্তরে সংলগ্ন হচ্ছে। ঘনিও মোট প্রক্রিয়ার সংখ্যার তুলনায় সংগঠিত শ্রমিকের হার ১৯৪৮ সালে এসেও ১৫ শতাংশেরও কম ছিল এবং সর্বভারতীয় হারের চাইতে তা কিছু নিচে এবং বোম্বাইয়ের তুলনায় অনেক কম। স্থানীয়তার পর সর্বত্রই ট্রেড ইউনিয়নদের সংখ্যা বেড়েছে। কিন্তু ১৯৬৭ পর্যন্ত বাক্যায় সংযুক্তি যখন ২ ১/২ গুণ, তখন

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রায় ৫ গুণ ও মহারাষ্ট্রে প্রায় ৮ গুণ। তাছাড়া ইউনিয়ন শিল্প শ্রমিক সংখ্যার হারেও পশ্চিমবঙ্গে পড়িয়ে ছিল। ইউনিয়নগুলি বাৎসরিক রিটার্ন দাবিরের ব্যাপারেও ছিল খুব অনিচ্ছিত। কাজেই, তাদের সঠিক সমসাময়িক, নিমিত্ত কর্মপদ্ধতি বা আয়-ব্যয়ের হিসাব সংগ্রহ সঠিক তথ্য পাওয়া দুহুর।

১০ম অধ্যায়ে লেখক দেখানছেন যে, প্রতি বছর মত শত নতুন ট্রেড ইউনিয়নদের রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে, পাশাপাশি তার প্রায় অর্ধেক সংখ্যায় রেজিস্ট্রেশন বাড়ল হয়ে যাচ্ছে। যোগ-বিয়োগের মধ্য দিয়ে ইউনিয়নদের যে মোট সংখ্যাগুলি ঘটেছে, আনুমানিক ক্ষেত্রেই সেগুলি নতুন নতুন ক্ষেত্রে সংস্কারিত ইউনিয়ন নয়, হিউপুর্বে ইউনিয়ন আছে, সেইরকম জায়গায়ই পুরনো ইউনিয়ন গোষ্ঠীগত দলদলগত ভেদে ও একবিধ ইউনিয়ন ধরা নিয়েছে। ফলে জায়গায় শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করা তুলনামূলক ভাবে সুবিধাজনক বা সুকি কম কোন সেখানেই বেশি ইউনিয়ন গড়ে উঠেছে। পশ্চাৎপদ ক্ষেত্রে যেখানে শ্রমিক শ্রেণীর সবচেয়ে বেশি সেখানে সংগঠন ঘটাও দীর্ঘকালীন হয়। উপশানশীল (manufacturing) ক্ষেত্রে নয়, যেকোন সংরক্ষিত ইন্ডাস্ট্রিদের সংগঠনও ট্রেড ইউনিয়নদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে।

একাল অধ্যায়ে লেখক ট্রেড ইউনিয়নের গুণমূল শাখা ও কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নসমূহের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছেন। সেখা যাচ্ছে যে, প্রধান ৪টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নদের মধ্যে স্থানীয়তার পরবর্তী প্রথম পাঁচ বছরে গঠিত ট্রেড ইউনিয়নদের সিংহভাগই ছিল কনফ্রেসী আই এন টি ইউ সি প্রভৃতি। তার পরে কিন্তু এই বৈধ কনফ্রেসী কমে যেতে থাকে, যাকে শাসকগণের প্রতি শ্রমিকদের বোহেদর হিসাবে দেখে যেতে পারে। তবে মনে করা যায়, কনফ্রেসি বিদ্রোহী তিনিটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন মিলিয়েও শতকরা হিসাবে কনফ্রেসী ইউনিয়ন হিউপুর্বে খুব বেশি সংখ্যায় পেঁছতে পারেনি। খিতীয়ত আই এন টি ইউ সি ইউনিয়নদের পরেই হান ছিল 'No-Party' ইউনিয়নদের সংখ্যা। ১৯৬৬-৬৭-তে যখন পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তাল হয়ে উঠেছে, তখনও হস্তম সংখ্যক সর্বকক্ষিত কনফ্রেসি ইউনিয়নদের সংখ্যাই সঠিকই হুত।

দ্বাদশ অধ্যায়ে বিষয়বস্তু ট্রেড ইউনিয়ন ও তাদের কানসেলেশন। দশম অধ্যায়ে এই বিষয়ে একগর বা বলা হয়েছে যে, কনফ্রেসি ত্যাগ করছেন আরও বিস্তৃতভাবে সারলি মধ্যম। এই অধ্যায়ের আর একটি বস্তুত্বপূর্ণ অংশ হল, ট্রেড ইউনিয়নের শিষ্টাঙ্গতদের ভূমিকা। এর ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা থাকলেও জীবনে তা শ্রমিক আন্দোলন ও সংগঠনে বিত্বেও দুর্বলতা দিয়ে এসেছে, লেখক তা স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন। জয়েদশ ও চতুর্থ অধ্যায়ে আবার যথাক্রমে চট্টকল ও সূতাঙ্কনকে কেন্দ্র-স্থিতি হিসেবে ধরে লেখক এই হুই শিল্পের দুই ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন ও কানসেলেশনের বিস্তৃত চিত্র তুলে ধরছেন যা

তার পূর্ববর্তী অধ্যায়ের মূল প্রতিশাদ্য ধারণাকেই সমর্থন করে। তবে বেশদ নাশাননা সোয়ার অব লেবোরেস 'অবলোনি মুরের এক জাতীয়সংগঠন সংগঠন' (পৃ: ৩৪০) বলে উল্লেখ করা এক মারাত্মক ভুল।

একশরের অধ্যায়গুলিতে লেখক এমন বিষয়ের অবতারণা করেছেন যেগুলির উপর আলোচনা এতাবৎ বিশেষ চোখে পড়েনি। এর প্রতিশাদ্য হার স্বাধীনতার পর Industrial Disputes Act 1947 অনুযায়ী শ্রমবিহীন নিষ্পত্তির সেসব ব্যবস্থা হল, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে তার কার্যকরিতা বিশ্লেষণ, যেমন ওয়ার্কল কমিটি বা শ্রমিক-মালিক দ্বিপাক্ষিক আলোচনার নিয়মিত ব্যবস্থা (পঞ্চদশ অধ্যায়), সরকারি শ্রমবিহীনদের আপসমূলক নিষ্পত্তির ব্যবস্থা বা কনসিলিয়েশন (ষোড়শ অধ্যায়), এবং বাতাতমূলক নিষ্পত্তি বা আডজুডিকেশনের জন্য ট্রাইবুনাল (সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়) ইত্যাদি। ব্যাপক পরিসংখ্যানের সাহায্যে লেখক দেখানছেন যে, শ্রমিকদের মধ্যে শিক্ষার অভাব, সমাজে সামন্ততান্ত্রিক দুর্নীতি, রাজনৈতিক দল প্রভাবিত ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন প্রভৃতি কারণে ওয়ার্কল নিষ্পত্তি পুরীক পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে সন্তোষজনক হানি। কনসিলিয়েশন ও আডজুডিকেশনের মূলক অবস্থা তুলনায় বেশি পাওয়া গিয়েছিল। তবে অমলাভাত্তিক দীর্ঘসূত্রিতা, পরস্পরবিরোধী রাজনৈতিক গোষ্ঠী পরিস্থিতি প্রতিদ্বন্দ্বিতা, পরস্পরবিরোধী রাজনৈতিক গোষ্ঠী পরিস্থিতি প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইউনিয়নদের অন্তর্ভুক্ত অনেক ক্ষেত্রে সুফল ভোগের প্রতিক্রিয়ক হয়ে গঠন। পূর্ববর্তী অংশগুলি মতো এখানেও লেখক ট্রেট করে হিসাবে চট্টকল (উনিবিংশ অধ্যায়) এবং সূতাঙ্কনের (বিশ অধ্যায়) প্রসঙ্গ দেখানছেন।

সবচেয়ে উপসাহারে (একবিংশ অধ্যায়) লেখক পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে আলোচিত মূল প্রতিশাদ্যগুলি পুনরায় সংক্ষেপে তুলে ধরছেন। তার এর গবেষণার মূল লক্ষ্য যে, ১৯৪৭ সালের শ্রমবিহীনদের আইনের পরও প্রয়োগ পর্যালোচনা করা যে কথা এখানেই প্রথম বলা হল। এটি ভূমিকায় উল্লেখ করলে পাঠকের সূত্রাযা হত। পশ্চিমবঙ্গের সর্বভারতীয় এবং মহারাষ্ট্রের সংখ্যা তুলনায় দেখে তিনি তার সব সিদ্ধান্ত টেনেছেন। তিনি এই মূল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, শ্রমিক-মালিক বিরোধের নিষ্পত্তি শেষ পর্যন্ত নির্ভর করেছে রাজনৈতিক টানাশায়েদের উপর, পারস্পরিক দ্বিপাক্ষিক সংঘাত ও বোঝাপড়ার উপর নয়। তার ফলে পাশ্চাত্য শিল্পোন্নত দেশগুলির অর্থে সু শিল্পসম্পর্ক বাহ্যত হচ্ছে বা আরও স্পষ্ট ভাষায় গড়েই ওঠেনি। রাহিফ অধ্যায় বা পোস্ট স্ক্রিপ্ট যা ২৩ পারার। এর মধ্যে ১৯৬৮-৬৭ সালের

ঘটনাবর্তী পর্যালোচনা করেছেন। ফলত পুরো ব্যাপারটি অত্যন্ত প্রকৃষ্ট মনে হয়েছে এবং এই কারণে গ্রন্থটির শিরোনামে ১৯৪৭-৬৭ দ্বারা করা খুব শোভন ও যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না। এই শেষ কৃতি বছরে সমগ্রভাবেই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট বদলে গেছে। শিল্প ক্ষেত্রে সামান্যভাবে একটা অবলম্বন ও অবশিষ্টাংশের লক্ষণ স্পষ্ট হয়েছে। ১৯৪৭-৬৭ সালের যে দীর্ঘসূত্রী ট্রাইবুনাল তিনটি দিয়েছেন, তার মধ্যে এই অধ্যায়টি কিছুটা বেমানান। প্রকৃতপক্ষে উপসাহারের মধ্যেই এই বিবরণটি নিয়ে এলে এবং গ্রন্থটির সমসাময়িক ১৯৪৭-৬৭ রাশপেই শোভন হত। তাছাড়া '৬৭ সালটির তাৎপর্য' তাও পরিষ্কার নয়।

তাছাড়া বইটিতে বেশ কিছু মূদ্রণ প্রভাব ও সম্পাদন্য পরিপাট্যের অভাব লক্ষ করা গেল। যেমন প্রথম অধ্যায়ে শিরোনাম সূচিপট্রে দেওয়া আছে Background of the Study Board Economic Indicators। কিন্তু অন্তরের শিরোনামে পাচ্ছি Background of Study: A General Survey। চতুর্থ অধ্যায়েও সেইরকম ভ্রান্তি।

সব মিলিয়ে স্থানীয়তা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গের শ্রম সম্পর্কের উপর গবেষণায় অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থ একটি প্রামাণিক দিক-নির্দেশক কাজ করবে ওকথা নিঃসংশয় বলা যায়। প্রতিটি অধ্যায়ে প্রমাসাভাবে প্রস্তুত ওজস্ব সারলি গ্রন্থটির মর্যাদা বাড়িয়েছে তবে কোন কোন ক্ষেত্রে তার ভিত্তি পাঠক ক্রান্ত ও দীক্ষিত হয়ে পড়তে পারেন এবং বইটিতে নিছক গাণিতিক পরিসংখ্যানের বিষয় বসে মনে হতে পারে। কখনও কখনও সারলিগুলি কিছুটা অস্পষ্ট পরস্পরবিরোধী তথ্য সূচিত করে। যেমন ২৪ পৃষ্ঠার ১৫৭ সারলিতে জানুয়ারি মাসের সংখ্যাগুলি সঠিক কিনা তা বেশ সন্দেহজনক। এরকম উদাহরণ আরও বারোনে যেতে পারে। তাছাড়া লেখক তাঁর প্রাথমিক সূত্র হিসাবে ব্যাপকভাবে নির্ভর করেছেন শুধুমাত্র সরকারিভাবে প্রকাশিত রিপোর্ট হিয়ার হুক ও জনারিসের উপর। সংবাদপত্র, পুলিশ ও প্রশাসনের গোপন রিপোর্ট বা ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠকদের সূত্র ব্যবহার করেননি। কাজেই তাঁর ভ্রম কাঠামোর উপর পূর্ণাঙ্গ সামাজিক ও রাজনৈতিক চিত্র তৈরির দায়িত্ব রইল ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানীদের।

Industrial Relation and Trade Union in West Bengal (1947-87)— Bijoykrishna Mukhopadhyay
Hooghly, 1992/ Rs. 200.00

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের কবিত্ব

নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ—‘সোনার হরিণ’ প্রকাশিত হয় ১৩৬৪ বঙ্গাব্দে। প্রকাশনার দায়িত্বে ছিলেন ‘কৃত্তিবাস’ পত্রিকার সম্পাদক ও কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। ‘কৃত্তিবাস’ গোষ্ঠীর কবি হিসাবে, পঞ্চাশের দশকে যারা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় নিঃসন্দেহে অন্যতম। ‘কৃত্তিবাস’ পত্রিকার সঙ্গে তিনি নিজেই প্রথম থেকে ঘনিষ্ঠ দ্বারা বান্ধিত হয়ে যুক্ত রেখেছিলেন। প্রথম সংখ্যা ‘কৃত্তিবাস’ প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৬০ সালের প্রারম্ভ মাসে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আমাদের এক গদ্যে জানিয়েছেন, বিস্তৃত কবিতার প্রেমাসিক এবং তরুণতম কবিরের মুখপত্র হিসাবেই এর আশ্বাসপ্রকাশ।^১ সুনীলের মারফতই আমরা আরও জানতে পারি যে,—‘বিলতে-ফেরত শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় নিজে কীভাবে করে কৃত্তিবাস স্টেলে স্টেলে পৌঁছে দিয়েছেন।’^২

নীতিমতে সোভ্যার মাধ্যম সহকারেই ‘বিস্তৃত কবিতা’ রচনায় মনোযোগী হয়েছিলেন কৃত্তিবাস গোষ্ঠীর কবিরা। বলা যায়, কবিতার প্রকাশনাকাল বঙ্গদেশের অনুসরণে, যা কিছু কবিতা নয়, তার থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন কবিতাকে। হৃদয়বন্দনের সঙ্গে মেলাতে চেয়েছিলেন ‘ভাষার নির্ভর মৌখিকতা’। দালাল এই যুবক-কবিরের দল বিষয় ছিল রক্তমাংসের প্রেম, যৌবনের সংগঠনকে উদ্দীপন। এরা জীবনের প্রান্তিকের প্রান্তিকতা এবং বহুদিন গড়ানুগতকৃত প্রবলতার অধীকার করেছিলেন তাঁদের কবিতায়। ‘গভীর গভীরতম সচেতন স্বপ্নে আমি নৃত্য একটী বন্দুক/ পরিত্যক্ত করতে খুঁজে পড়েছিলাম/ কতো ক্রুর ভাঙোবাসার আকাঙ্ক্ষা করেছিলাম আমি/ যে সেরাবের ঘাট নীচে—চেয়েছিলাম আমি/ সেই সেরাবের...’ এরকম এক ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন শক্তি চট্টোপাধ্যায় একটি কবিতায়। আর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর হিঁস নগীর উদ্দেশে লিখেছিলেন—‘নৃত্যের যুদ্ধ থেকে বন্দুগুঁ চলে ফিরে আসি শরীরের কাছে/ কথা দিয়েছিলাম তুমি উমানীন সম্মত দেখাবে।’ সংক্ষেপে বলা যায় যে, কৃত্তিবাস-গোষ্ঠীর প্রধান কবিরের কবিতা ছিল যৌবনের অ-নিঃশেষ প্রাপ্তপ্রার্থণে জরপূর; এবং কখনও বা ঘন যৌবনবন্দনার ভাষাকল্প।

শরৎকুমারের কবিত্বটি বিষয়ে এই আলোচনায় এরকম এক ভূমিকা দিয়ে শুরু করতে হল এই কারণে যে, কৃত্তিবাস-গোষ্ঠীর

একজন প্রধান কবি হলেও, তাঁর কবিতার মূল চরিত্রলক্ষণ তাঁর সত্যীর্থের কবিতা থেকে ভিন্ন; প্রেমের সংগঠন নয়,— প্রেমহীনতার বিবাদই তাঁর কবিতাকে বিহ্বল করেছে বারবার। মানুষের জীবনে যৌবন এবং অনানন্ড ক্ষণস্থায়ী; দীর্ঘস্থায়ী শুধু যৌবন হারানোর বিষয় অনুভব এবং বসন্তগতের কিছু অন্তঃসারশূন্য অনুশাসনের বদীশিবিরে বাজিমামুনের আত্মবিলাপ—এরকম এক দুঃখবদী চেতনার শরতের কবিতা প্রথম থেকেই আক্রান্ত। ‘সোনার হরিণ’ কাব্যগ্রন্থের ‘অবাস্য মন’ কবিতায় শরতের আক্ষেপ এরকম:

রেমী! স্বপ্ন হিঁড়ছে হিংসে কীটে
কীট নিয়েছি যখন লয়ে রাস;
বুলবুলি ভরা গরির চ্যাবর ভিটে
হানা মল্ল পৌঁছেছি পাখের হুটে
আলোকিতকর বঁধিয়েছি কবিতাট,
তাঁই বলি, মন, হুয়া নাফো ভগ্ন।^৩

এবং একই গ্রন্থের ‘প্রেম’ কবিতায় শরৎ অভিমান বলেন—
‘এখানে বুদ্ধতা শুধু, হোয়ার আনন কোথা—প্রেম/ আজকে তোমাকে এই কলমে লুকিয়ে রাখলো’—।

শরৎকুমারের কবিতার এক সংক্ষিপ্ত কিন্তু মেধাবী আলোচনায় তরুণ কবি ও প্রাবন্ধিক অমিতভ গুপ্ত আমাদের জানিয়েছেন এই কবির ‘আদ্যি-রোমান্টিক অন্যান্যতার কথা’।^৪ অমিতভর বক্তব্য একটি বিশদভাবে উদ্ধৃত করছি—‘...বালাজামার বিশ শতকের প্রধান কবিরা সকলেই প্রতিভার বিজ্ঞান ঘটিয়েছেন রোমান্টিসিজমের বহু পুরাতন ইঙ্গিতটিকে দিয়ে। পঞ্চাশের দশকের পর থেকে আমাদের কবিরা ওতো রোমান্টিক জীবনচর্য ও অত্যন্ত কীর্তিনাম হয়ে উঠেছেন। এর মধ্যে, লেখায় অগ্রত, আন্দারনা বাগ্‌বন্দ, কাব্যসজ্জা ও অতি চতুর দেবার ভঙ্গিট আমাকে বারবার অন্যত্র বারের খবর দিয়েছে। মনে হয়েছে এই একজন আছে, হাত একমাত্রই—গিনি—লেখায় অগ্রত আদ্যি-রোমান্টিক।’^৫ সম্ভব নেই যে, এও আলোচনায়, অমিতভ গুপ্ত ‘রোমান্টিক’ কিংবা ‘আদ্যি-রোমান্টিক’ শব্দ দুটি সম্মিলন এবং চলতি অর্থে ব্যবহার করেছেন। কেননা, আমরা অনেকেরই জানি, শতাব্দী-প্রাণী এইসব শব্দের মজারটা ইতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত আছে। সাহিত্যের কোণেও আলোচনায় যখন

আলোচক এইসব পরিচিত শব্দগুলি ব্যবহার করেন, তখন তিনি শুধুমাত্র এক বিশেষ মানবিক প্রবণতার কথাই বোঝাতে চান না—‘মানুষের একটি মৌলিক, স্থায়ী ও অবিশেষ্য চিন্তাধারা’^৬ র কথাও বোঝাতে চান। যাই হোক, শরৎকুমারের কবিতাপাঠে আমাদেরও এরকম এক ধারণা হবে যে, তাঁর চোখ বারবারই নির্মোহ; কোনো রঙিন চমৎকার বৈশিষ্ট্যই ‘যৌবনের অসম্মত অসম্ম’ তাঁকে কোনদিনই শুধুমাত্র আত্মপীড়নের দিকে চালিত করেনি। বরং জীবনের সব বৈশিষ্ট্যগুলো তিনি সুদৃষ্টি, মেধা ও যুক্তির বিব্রন্ধেই বুঝে নিতে চান। স্বপ্নহীন, প্রেমের ভণ্ডি উন্মাদিক, চালাক এবং বোহেমিয়ান এক যুবক কলকাতার পথেঘাটে লক্ষ্যহীনভাবে ভ্রাম্যমাণ—শরৎকুমারের প্রথম পর্বের কবিতা পড়লে এরকম এক ধারণা হবে আমাদের। দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থের, ‘রাঁচো, ডেরেন এবং নিজবা’ (১৩৭০),—‘মৃত অবস্থায় রচিত’ (স্নাত ব্যাচের পর কলকাতা শাসন করে চারজন যুবক) এবং ‘উদ্দেশ্য পাতাল’ কবিতা দুটি এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। যুবক শরৎকুমার যেন কলকাতার হ্যামলেট, বিধাতন্ত্রিত এই ভাগ্যহীন যুবরাজের মতোই তাঁর নির্জন স্বপ্নতোক্তি—‘কী করি তোমায় হাই, পকেটে টুকুটুকু করে টাকা/ হাঁচা করে দু’খটা কোথায় লাগে এক টাকা চলিঙ্গ/ সুন্দরীর গান নিয়ে মুখী খেতে পাঁচ টাকা খেয়েছি, অন্য কোনো/ প্রেমদান নিষিদ্ধ এই কলকাতা শহরে।’ পাঠকের হাত মনে পড়ে যাবে টি এস এলিয়টের এক বহু-পাঠিত কবিতার পরিচিত সেই বংশটি—‘For I have known them all already, known them all—/ Have known the evenings, mornings, afternoons, I have measured out my life with coffee spoons.’—।^৭ এখানেও আমরা শুনি স্বপ্নহীন, স্বপ্নহীন, স্বপ্নহীন, বিচ্ছিন্নভাবেই নীড়িত আনন্দিক মানুষের বিলাপ। শরৎকুমারের ‘উদ্দেশ্য পাতাল’ কবিতার শেষ স্তবকটি এরকম—‘না হয়ে কোথায় যাবে, সম্মত পালিয়ে একা ফেলে/ কোনো সম্মত মহিলার সঙ্গে হেঁচ করে খেঁ খেঁ/ বন্ধুরা কোথায় আছে/ এখনি দূয়ার বন্ধ হুয়ে/ বন্ধুরা কোথায় আছে/ এখনি দূয়ার বন্ধ হুয়ে/ গলল হুয়ে চলে চাটগিওলা, পাতালের পথ চেনো তুমি?’ এলিয়টের ‘পেগোড’ কবিতার দ্বিতীয় সূত্রটি (A game of chess) রামকৃষ্ণ যেন ভুলেই গেছে ওঠে জীবনের উদ্দেশ্যহীনতায় হাবুডুপ যেতে—‘...What shall I do now? What shall I do? / I shall rush out as I am, and walk the street/ With my hair down, so. What shall we do tomorrow? / What shall we ever do?’^৮ আর ‘বন্ধুরা কোথায় আছে/ এখনি দূয়ার বন্ধ হুয়ে’—একাধিকবার উচ্চারণ এই চরণটি যেন এলিয়টের এই একই কবিতার একই বর্ণের এক নিশ্চিত চরণের প্রতিচ্ছবি—লন্ডনের এক পাব কিংবা বারের দ্বারকী

পানভোজনে মত্ত শব্দদের সত্য করে এঁটাতো—‘HURRY UP PLEASE IT'S TIME/ HURRY UP PLEASE IT'S TIME...’।

চিড়িয়াখানার ‘বাঁচায় বন্ধ পশুপাখা’-কে নিয়ে শরৎকুমার একটি কবিতা লিখেছিলেন। কবিতার নাম—‘এসো অনাদিকে যাই’। পশুরাজ বা সিংহ—দস্ত, ক্ষমতা, ঘাঁসা যৌবনের প্রতীক হিসাবে বরাবর উদ্ভিহাস, চিত্রকলা, সাহিত্য এবং রূপকথায় উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু এখানে কবি বর্ণিতের দৃষ্টান্তকেই প্রকাশ করেছেন। বাঁচায় কবী এই পশুরাজ—‘...বিষম অলস/ স্যান্ডিন হুই তুলছে, রক্তে হিম আঁকিমের ভোজে...’। অর্থাৎ এই কবিতাটিতেও শরৎকুমারের বিষয় যৌবনের স্তব প্রতি করা নয়, পরাধীন এবং দমিত যৌবনের অশমানে প্রভিই একধরনের সহমতিতা অনুভূত হয় এখানে। বদী সিংহের ‘সব আফগান’ এবং ‘পশুর গর্জন’ লক্ষ করে কবির আক্ষেপ হয় এই ভেবে যে—‘বন্ধকাল আগে ওর নবপ্রান্ত ঘেঁরে/ হিসা করে গেছে’। বুদ্ধদের বসুর ভাষায় বলা যায়, ‘বানানার কলমে কেনে মনে ক্ষুধিত যৌবন।’^৯ এক্ষেত্রেও আমাদের মনে পড়ে যাবে—রিলকের ‘The Panther’ কবিতাটি। পারিসের প্রারম্ভিক শিল্প-সভাস্থল নানা কৃৎ প্রবেশ বিব্রত রিলকে যখন ভুবনবিখ্যাত ভাস্কর রীনা-কে প্রশ্ন করেছিলেন যে, কীভাবে কবিতার বিষয়-বসায় ‘বৈচিত্র্য’ আনা যায়; তখন রীনা তাঁকে পরিত্রা দিয়েছিলেন—‘Why don't you just go and look at something— for example, at an animal in the Jardin des Planets, and keep on looking at it till you're able to make a poem of it?’^{১০} গুরুত্ব এই পরামর্শ মেনে নিয়ে রিলকের পারিসের চিড়িয়াখানা ভ্রমণ এবং এরপরেই রচিত হয় ‘The Panther’ কবিতা। যাঁচায় কবী চিত্রাব্যক্কে রিলকে বর্ণনা করেন এভাবে—
‘His gaze, going past those bars, has got so mistied/ With tiredness, it can take in nothing more...’।^{১১} রিলকের এই চাবকর চর্যাকৃতি শরৎকুমারকে ‘এসো অনাদিকে যাই’ কবিতা রচনায় অনুপ্রাণিত করেছিল; এরকম অনুমান খুব ভাঙা হবে না।

‘না নিম্নান’ (১৩৭৬) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ‘বদীশিবির’ কবিতা এই প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ। সামগ্রিকভাবে জীবনব্যাপকেই এখন ‘বদীশিবির’ মনে হচ্ছে শরৎকুমারের। নিজের ইচ্ছেগুলি এবং ইচ্ছাগুলি খোলাখুলিভাবে ব্যবহার করার ব্যাপারে মানুষ পরাধীন।—সামগ্রিক অনুশাসনের সারিভঙ্গ শিক, নৈতিকতার জালি নিষেধগুলি বাস্তবিক দমিয়ে রাখে। আর সে জ্ঞানই শরৎকুমারের আত্মদান—‘ছন্দে বৈষে রাখলে কবিতার যেনন কষ্ট হয়, আমার সমস্ত অন্তরায়/ সেই বরক কষ্ট পাচ্ছে।’ পরিহিত মানুষের মুক্তি চাই, আসক্তি থেকে/ অশ-প্রত্যঙ্গের মুক্তি চাই, উল্লাসগুলি ছুঁতে ফেলে ভ্রম্যহিত্যের মুক্তি চাই।’^{১২} অদ্যুত কোনও

উঁহু হুও বরং
হাত রাখি তোমার কাঁধে।
কেউ কারো কথা শুনে না।
শেষকালে যখন বড় হোল দুর্বল, বয়স হোল,
পরশপরের মুখ দেখলো 'নু'জনে
ঘাসের ওপর শুয়ে, নিশ্চিন্ত।
তখন ঠাণ্ডা মাটির স্পর্শে
ওদের অহংকার থেকে ভাব উঠেছে।

আর একটা কবিতায় শরৎকুমার পাঠকের সামনে তুলে ধরেন
কাক এবং জেড়াদের সরস কথোপকথন—

—কাক ও কী আছে স্টুটিটার মধ্যে?
—মানুষের বাচ্চা।
—কাক ও মানুষের এটোকাটা যান তো বাবা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে,
এটোতে অকস্মিক?

বোজাল যেতে যেতে বললো— এটো খাই ওদের, শাপ খাই
না।

শেষ চরণের এই বিকল্প-বিশ-মাধ্যমো তীর, বলাই বাহুল্য,
মহাবিশ্বের তালমতেই বিদ্ধ করে।

‘নতুন কবিতা’-র এই উত্তরণের পর, আমরা লক্ষ করব,
শরৎকুমারের কবিতা পরিমিত, সংক্ষিপ্ত এবং ধারালো হয়ে উঠেছে।
‘চিত্রকল্প’ কবিতা— পাউন্ডের এই মেঘাবী সজ্জা যদি আমরা
মনে নিই, তাহলে পাঠক আমার সঙ্গে নিশ্চয়ই একমত হবেন
যে, ‘অন্ধকার লেবুবন’ (১৯০১) কাব্যগ্রন্থের ‘খুলী’ কবিতায়
পাউন্ড-নিপীষ্ট সেই সজ্জারই সমর্থন মেলবে— ‘...একিক ওদিক
য়েদে দেখি— কক/কেউ নেই।/ শুণু উপুড় রাস্তার শিঁটের
ওপর— ফুলের কুসুমটা শালের মতো/ বোহ পড়ছে।’ এরপর
এক নিম্নোক্ত চিত্রকল্প পাঠক পাবেন এককল্প মুহূর্তের আশ্বাস!

প্রসঙ্গক্রমে, ‘আছি সংঘত প্রবৃত্ত’ (১৯০৬) কাব্যগ্রন্থের
‘স্লাইড’ কবিতাটিও উল্লেখ করতে চাই। এই কবিতায় বহুগুণের
কোন গুরুত্ব নেই। শুধু নার্যিক জীবনের টুকরো টুকরো ছবি
বা ‘স্লাইড’ আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেন কবি। এই
ধরনের কবিতায় শরৎকুমারের মুক্তিযাত্রা প্রজ্ঞাপিত। এই কবিতাটিও
পুণ্যোপনিষৎ উদ্ধৃত করছি এখানে—

হালতলার বারান্দায় পেন্ডি— পঙ্ক একটা লোক
দাণ্ডাও রিজের দিকে, ন-তলায় টেরিকটের শাট একা দুলছে
সাতলয়ায় শাট স্বামী-স্ত্রী, চায়ের কাপ,
কাঠের টেবু গুলদস্ত।

সঙ্গে হয়-হয়।

ছ-তলাটা খাঁচার মতো, বাঙালী মারপিট করছে
‘শাটলার চাকর পাশের ফ্ল্যাটের কিয়ের সঙ্গে

হেসে হেসে, চারতলায় এখনও দুলছে মেরুন শাড়ি
সঙ্গে হয়-হয়।
তিনতলার বারান্দাও মেরুন শাড়িতে ঢাকা
দোতলার দিল্লী স্লু বঁধে চুলে ঠাট
উড়িয়ে দিলেন হওয়ায়,
একতলায় ব্যাঙ্ক আঙ্ক বন্ধ।
অটতলার কথা বলা হল না,
ওই স্লাইটওয়া কোনো ছবি নেই
শুধু সঙ্গে হয়-হয়।

মদনমুহুরে, বহুদ-দশ-বাগো আগে, শরৎকুমার রবীন্দ্রসদনের
এক জাঁকজমকপূর্ণ কবিতা-পাঠের আসরে অন্য কিছু কবিতার
সঙ্গে এই কবিতাটি পাঠ করেছিলেন। বহীমান অরাদশম্বর থেকে
পঞ্চাশ ও ঘাটের অনেক বিখ্যাত কবি উপস্থিত ছিলেন সেই
আসরে। ‘স্লাইড’ কবিতাটি, সম্ভ্রতিও ভ্রমিতে তিনি পঞ্চাশ পর,
প্রায় আধমিনিট করতালি দিয়ে শ্রোতার অভিনিবেশ জানিয়েছিলেন
তাকে। ছবির পর ছবির পরিকল্পিত সমাবেশে শরৎকুমার নার্যিক
জীবনের অন্তঃসারন্যাত্মকেই মনে ইঙ্গিত করছেন—

‘আছি সংঘত প্রবৃত্ত’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ‘স্ট্রেস’ কবিতাগুলি
পুনরায় প্রমাণ করে যে, শরৎকুমার তার কবিতায় ঘটেছে চাইলেই
ভাঙতুম; নির্মাণ করে নিতে চাইলেই এমন এক আশ্রিক বা দিয়ে
ধরা যায় আধুনিক জীবনের জটিলতমায় সমগ্রতায়। এই
কবিতাগুলি গঠনো বা ফ্রি-ভার্সে রচিত। এই এক বিচিত্র ভাষা,
যা তাঁর একান্তই নিজস্ব। অমিত্রভে গুপ্ত তাঁর বিস্ময় প্রকাশ
করেননি এভাবে— ‘...এই যে মহাকাব্যোচিত বিঘ,
পাশেরভূতরা টানাশোড়নে সাহসী অথবা লক্ষ মানুষের এই-যে
কবিতা, ফ্রি-ভার্স ছাড়া একে আর ধারণে কেওয়া।’^{১০} আমার
মনে, বিচিত্র এই কবিতাগুলি রচনা বাগবো শরৎকুমার যথার্থ
Objective Correlative (বস্তুবিভার) খুঁজে পেয়েছেন। এগিলয়ট
জানিয়েছেন— ‘The only way of expressing emotion
in the form of art is by finding an ‘objective correlative’,
in other words, a set of objects, a situation, a
chain of events, which shall be the formula of that
particular emotion...’^{১১}। আধুনিক জীবনের নির্মম জটিলতায়
বিস্মত ও বিভ্রান্ত হতে হতে শরৎকুমারের মনে যে প্রতিজ্ঞা
কল্প নেয়— ‘তা প্রকাশ করার তাগিদে তাকে সৃষ্টি করে নিতে
হয় কবিতার রসামনে জারিত এক ধারালো দশা-আশ্রিক;
উপস্থাপিত করতে হয় এক বিমূর্ত চরিত্রকে (শরৎকুমার) যাকে
উদ্দেশ্য করে তিনি নিজেকে উদ্ঘোষ করেন, অশ্বমন এই
‘মূলোচাপা অপরাধের’ কামিনীগুলি বিধ করে নিজে ভাবমূলক
না— ‘হালকা গোলাপী আলোয় আঙুল তুলে আমাদের সঙ্গে
কথা বলো কেন।... বিব্রত করো কেন শব্দকম্পন, আমি
লজ্জায় কুঁকড়ে যাই।’ (স্ট্রেস ১)

...কে এই শব্দকম্পন? কবি এই চরিত্রটিকে কখনোই রিক
স্পষ্ট করেন না। মনে হয়, এই শব্দকম্পন হলেন কবির দ্বিতীয়
সত্তা;— যার সামনে দাঁড়ালে কবির মুখ থেকে ক্রোধের
গন্ধে,— জলপ্রোতের মতো নির্গত হয় নির্জন স্বীকারোক্তি। কিছু
কিছু অমংকারে ব্যর্থ উদ্ধৃত করছি—

(ক) বই কিনি, পড়ি না, শুধু পেছমার্ক দিয়ে রাখি কেন তুমি
জানতে চাও ও কতকাল আগে বেলতে খেলতে আমার ভাইয়ের
সামনের দাঁ— মনে হয় পেছন থেকে টেনেছিলাম। আমি ভুলতে
চাই।

(খ) আমি মহুং নই, সাহসী নই। আমি লেখাপড়া কিছু শিখিনি।

(গ) মেয়েদের বিশ্বাস করি না, কুকুর বিশ্বাস করি না।

(ঘ) পেছন ঘিরে বসে আছে মহিলা। আমি ওর স্পষ্ট কাঁধের
ওপর বই রেখে ‘রক্টা’ পড়ছি। ওর কুলের বাপটা আমার মুখের
খুব কাছে। আসলে ‘পুড়ছি না শব্দকম্পন, ভাবছি কী করে
ওর সবুজ ভারি স্তন পর্শে পাইছোনা যায়। তলয়া হাত রেখে
ওজন নেওয়া যায় বহুদূর।

নার্যিক জীবনের পেশোপারি চতুরতা এবং নৈতিক অধঃপতন
ব্যক্তিগতভাবে কোণঠাসা করে ফেলেছে। জীবনযাপন মানে তেনে
এক নোয়া হাসপাতালের নির্জন বিছানায় শুয়ে অসুস্থতার যন্ত্রণায়
ছটফট করে। ব্যক্তি মানুষের এই তীব্র যন্ত্রণাবোধ কবিতাগুলির
উপমা এবং চিত্রকল্পেও সূত্রমিত হয়েছে—

(১) নার্যেকল্লাহের ওপর মলমের মতো জোয়াফা পড়েছে।
ব্যানভেতলো বাবা শাল বাড়িটা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে।
(২) বাগেসে কারবিলকো গন্ধ। শব্দকম্পন, তুমি বেঁচে উঠেছো
তো।

(৩) মানুষ মারার কাজ আপাতত স্থগিত। গ্লাভ ব্যাঙ্ক ভেসে যাচ্ছে
রক্তে। দুর্বল সবল কারুর মনে শান্তি নেই।

(৪) আমরা চোখের সামনে ফাঁকা অপারেশন থিয়েটার, শাদা
টোবিন, তার ওপর একটা গোটা চন্দ্রমন্ডিকার উগ্র আনাটমি।
পাশ দিগন্তে কক, চারপাশের টান।...

দিখ ৭ বছর পর শরৎকুমারের ১ম কাব্যগ্রন্থ ‘সোনার শিল্পমূর্তি’
ওইই সজ্জা প্রকাশিত হয়েছে। শ্রৌতচরিত্র প্রান্তে পৌঁছে তিনি
জীবন সম্বন্ধে আরো নির্মম ও সিনিক হয়ে উঠেছেন। তার
সত্তাসম্বন্ধী দৃষ্টিতে ধরা পড়ে— সফলতার জন্য মানুষের হুমকী
সুঁহু-দোঁড়, আর যাবতীয় মূল্যবোধগুলির শোশানী পরাজয়।
‘অন্তত আঁধার এক অসিদ্ধিই পৃথিবীতে আজ’— লিখেছিলেন
জীবনানন্দ। আর বিশ শতাব্দীর গোমুখিতে পৌঁছে শরৎকুমারের
মনে হয়— ‘মানুষের ভিত বড়ো বিচিত্র জিনিস—/ মুড়তে
মুড়তে কেবল কবিতার কদা, হিসেব আর মনোমুগ্ধ/ সোলাসের
দিয়ে দেয় দু-একজনকে রহস্যে/ নিদানন্দ পূর্ণ...’
যুগশক্তি প্রতি অভিনিবেশ-মিশ্রিত প্রেমের তিনি উদারগ করেন—
‘তোমরা যারা যুগশক্তি— অস্ত্রাশ্র-দলী ভবিষ্যৎ/ বিদ্যা ত্যায়

করে যাও, যাও হে ভদ্রন করে গুড়ে/ আপাতত গুড় সত্তা,
গুড় ধর্ম, গুড়াকাঙ্ক্ষা ফাঁটি,—’। সমাজ জুড়ে এই নৈতিক
অধঃপতন যেন ইহর ত্রাণীদেরও সূত্রমিত করেছে। গৃহপালিত
শোয়া কুকুর কিংবা সোয়ালের টিকটিকি— শরৎকুমারই লক্ষ্য এক;
—বার্গাসিন্সির তাগিতে প্রবন্ধনার সাহায্য নেওয়া। ‘শোয়া
কুকুরটা’ কবিতায় এই কবি লেখেন— ‘শোয়া কুকুরটিকে লক্ষ
করো। দুপুরবেলা/ সামনের দুটো শায়ের ওপর শাকা পেশের
মতো/ মুখানো রেখে ও ভাবছে/ আজকের অভিনয়
বিশ্বাসযোগ্য হল তো?/ রাতিরের খাওয়াটা পাওয়া যাবে, আশা
করি।’ আর টিকটিকি কে-তিনি ভৎসনা করেন এইভাবে— ‘তুমি
মানুষের হেডটা টুকানো, তুমি ধর্মহাতি—/ নিজেকে কখনও
দুকেতে কেবল/ ছবির দিচ্ছন থেকে কাজ করো...’।

এই অন্ধগুপ্তে দাঁড়িয়ে শরৎকুমার হতশাশ্র উপলব্ধি করে
উত্তর-প্রজন্মকে দিয়ে বাবার মতো কোনকিছু তরন গ্রহণে
নেই;— আলো নেই, স্বপ্ন নেই, নৈতিক আদর্শের কোনও
ইমারত নেই। ‘...শুধু ছাপার অক্ষরে/ কসেটি কবিতা রইল।’
বিপত্তা মানুষের কল লেখা ওজনক মানুষের কথা।’। অনেককল্প
বিশ্রোহ, বিবেচনা, হতশাশ্র আর মোহমুক্তির শেষে, প্রায় ৩০
বছর ধরে কবিতা রচনার পর, শরৎকুমার পৌঁছে যান একরম
এক দর্শনে— ‘আমরা বিশ্বাস করতে চাই—/ যে হেতু মানুষ
কভাবত একক ও নিঃসঙ্গ/ হিংসুক ও প্রতিযোগিতায়, যেহেতু
মানুষ কভাবত বৈষম্যবান, তাকে সাম্য ও সম্ব্যবধান শোনাতে
হবে।’ এই এইই গ্রন্থের ‘১৪০০ সাল’ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ
ঠাকুরকে নিজের ‘প্রত্যাভিধান’ জানিয়েছেন শরৎকুমার। কবিতাটি
পড়ার পর আমাদের মনে হতে পারে, তাঁর কবিতার কাম্যনিক
রবীন্দ্রনাথের তুলি নিজেও মনে ভাবিত এই গ্রন্থে যে,
‘শান্তির পরের অদ্ভুত পাঠক’ তাকে মনে রাখবে কি না। আপাতকে
বলি, শরৎ, এই গ্রন্থের মীমাংসা কোনদিন হয় না, সে তো
আমার জীবন। কে বলতে পারে— সমস্র কবিতার সটিকে দেবে
দুশ, কাকেই বা টেনে নেবে কাকে। কিন্তু নিজেস্ব সৃষ্টি নিয়ে
এই অনিশ্চয়তার বোধ, এই অপূর্ণতার ক্ষোভে একজন শিল্পীকে
বাঁচিয়ে রাখে, তাকে পুনরুজ্জীবিত করে বাবরা। আশা নি যে
কখনই কোনও একটা বিমূর্তে বেধে যাবতীয়, তার জন্য
আপনাকে ধন্যবাদ। আপনায় কবিতার ভাষা ধার করেই আপনাকে
জানাই।

‘কালসিদ্ধি অন্ধকার হয়ে আসছে,
আশা নি পার হওয়ার চেষ্টা করছেন...
আমরা যেখানো পাইছি।’

সূত্র:
১. মুখবন্ধ/ সম্পাদকের কলমে/ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।
২. সম্পাদকীয়/ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়/ (কৃত্তিবাস) নবপ্রবন্ধ ১ম

সংখ্যা শারদীয় ১৩৮১।

৩. মাঝখানের দরজা/ বিজয়া মুখোপাধ্যায় ও শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের নির্বাচিত কবিতা সংকলন, বইমেলা ১৯৮১।

৪. ঐ

৫. শার্ল বোদল্যের ও আধুনিক কবিতা। বুদ্ধদেব বসু। প্রবন্ধ সংকলন।

৬. The Love Song of J. Alfred Prufrock/T.S. ELIOT/ Selected Poems.

৭. বন্দীর বন্দনা/ বুদ্ধদেব বসু

৮. Selected Poems/ RILKE/ Introduction by J.B. LEISHMAN.

৯. Tradition and the Individual Talent/ T.S. ELIOT (Essay).

১০. আলোচনা/ অমিতভ গুপ্ত/ মাঝখানের দরজা/ বইমেলা ১৯৮১।

১১. Hamlet/ T.S. Eliot (Essay).

শিক্ষা

অশোক মিত্র কমিশন রিপোর্ট এবং সরকারি ঘোষণা

মানস জোয়ারদার

১৯৭৭ সালের পর থেকে রাজ্যে সর্বস্তরের শিক্ষাচিত্র খতিয়ে দেখার উদ্দেশ্য নিয়ে ডঃ অশোক মিত্রের নেতৃত্বে যে শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছিল ১৯৯২ সালের অগস্ট মাসে তার রিপোর্ট পেশ হয়েছে। গত জুন মাসে বিধানসভায় যে রিপোর্ট সম্পর্কে সরকারের অভিমত জানানো হয়েছে। রিপোর্ট পেশ এবং সরকারি ভাষা প্রকাশ—এর মধ্যে দুবছর সময় অতিবাহিত। রিপোর্টের পক্ষে বিশেষ বৈশিষ্ট্য কিছু আলোচনা এ-সময়ের মধ্যে হয়েছে। সেই দিক থেকে সরকারি ভাষাটির গুরুত্ব অনেক। বিশেষ করে এই কারণে যে, এরও বছর দশেক আগে গঠিত ভরতোষ দত্ত শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদন সম্পর্কে সরকারের কোন প্রতিক্রিয়াই সাধারণ মানুষ জানতে পারেননি।

যেমনটি বলা হয়েছে, সর্বমোট ১১৮টি পরামর্শের মধ্যে সরকার ৭২টি গ্রহণ করেছে, ৩টি বর্জিত হয়েছে, ৩২টি আরও ভেবে দেখার কথা বলা হয়েছে। বাকি ১১টি সাধারণ মতমত। সেগুলো স্বরণে রাখা ছাড়া কিছু করার নেই সরকারের। কমিশনের যে সকল সুপারিশ গৃহীত হয়েছে তার মধ্যে আছে—প্রাথমিক স্তরে পরিকাঠামোগত উন্নতি সাধন এবং বিনামূলীয়া খাবার ও বছরের শুরুতেই নতুন শাটাবই সরবরাহ, সার্বিক সাক্ষরতা বিষয়ে অভিযান এবং এ কাজে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকের যুক্ত করা, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের শাটাসুটি পরিবর্তন, স্কুল ও কলেজে পরিদর্শনের কাজে গতি আনা এবং বছরে অন্তত দু'বার পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা, পঞ্চম শ্রেণী থেকে ইংরেজি শিক্ষা শুরু করা, পলিটেকনিক ও আই টি আই-গুলির উন্নতিসাধন, বর্তমান কলেজগুলির উন্নয়ন এবং আর নতুন কলেজ না খোলা, প্রতিটি স্কুল-কলেজে একজন করে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যোগ্য লাইব্রেরিয়ান নিযুক্ত করা ইত্যাদি। Work Education সম্পর্কে কমিশন—এটা পুরোপুরি তুলে দেওয়া যায় কিনা তা গভীরভাবে ভেবে দেখা উচিত। এ সুপারিশটি গৃহীত হয়েছে। একটি ডিগ্রি উদ্দেশ্য নিয়ে শুরু হলেও যেভাবে চলছে তাতে Work Education-এর পাঠক্রমটি এককথায় বিরক্তিকর। এটি তুলে দেখার দায়িত্ব কে বা কারা নেবে তা পরিষ্কার হল না। এ সম্পর্কে অধ্যাপক জ্যোতি উত্তাচার্যের মন্তব্যটি যথেষ্ট কড়া যেতে পারে—“ভবিষ্যতের বিবেচনা করার দায়িত্ব তো কমিশনেরই ছিল। ওঁরা আরও অন্য কার কাছে এই ‘বিবেচনা’ করার দায়িত্ব মিছে?”

যে সুপারিশগুলি গ্রহণ করা হয়নি তা হল—মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশনম্বর বাড়িয়ে শতকরা ৫০ ভাগ করা, আদালতে জমে থাকা অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তি নিয়ে মুখামতী ও হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির মধ্যে বৈঠক করা, রাজ্যের ৮০০ চতুষ্টায়ীর বার্ষিক দক্ষিণা ৬০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫ হাজার টাকা করা, মাধ্যমিকে মাতৃভাষার জন্য নির্দিষ্ট ২০০ নম্বর কমিয়ে ১৫০ করা এবং ৫০ নম্বর সংকুচিত অথবা আরবি-পারসির জন্য রাখা।

(২)

যে drop-out সমস্যার কারণে প্রাথমিক স্তরে পাশ-ফেল তুলে দেওয়া, কমিশন তার সমাধানচর্চা করে বলেছিল—এতে অবস্থার আরও অবনতি ঘটেছে। পড়ানোর ব্যাপারে শৈথিল্য বেড়ে গিয়েছে। শিক্ষকের অনেকেই রাজনৈতিক কর্মী, পঙ্কায়িত সদস্য, কৃষিকাজে নিযুক্ত, সুদের কারবারি। শিক্ষকতা বৃত্তিটি অল্প পয়সায় ভাড়া খাটানো হয়। ফলে পাড়ায় পাড়ায় গড়িয়ে ওঠে ‘বিদ্যা বিক্রির দোকান’—ইংরেজি মাধ্যম স্কুল। ফাঁকিবাজ প্রাথমিক শিক্ষকের সম্পর্কে বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভার প্রাক্তন আইনমন্ত্রী মনসুর হাবিবুল্লাহর মন্তব্য—“সরকারের কাছে থেকে হারামের পয়সা পেয়ে এরা গণমাধ্যম ব্যক্তি হিসাবেই বিরাগ করে। ‘প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনা আসলে শিক্ষা প্রসারের নামে বেকার উদ্ধার’। যা ঘটে চলেছে তা দেখেছেন অনেক মানুষই ভরতোষ দত্ত, জ্যোতি উত্তাচার্যদের সঙ্গে সহনত হলে যে, শিক্ষা প্রসারের প্রচেষ্টায় শুধু বেকার উদ্ধার নয়, ক্ষমতাসূচীকে নিজ নিজ রাজনৈতিক দলের বিতৃষ্ণা সংগঠনকর্মী সংগ্রহের ডাবনটাই যেন মুখ। Indian Statistical Institute থেকে ছাগলি জেলায় যে সমীক্ষা চালানো হয়েছিল তাতে দেখা গিয়েছে, চতুর্থ শ্রেণীর শেষে জ্ঞানগমির নিম্নতম যোগ্যতামানে পৌঁছতে পেরেছে মাত্র ২৪ শতাংশ ছাত্রছাত্রী। State Council for Educational Research and Training কৃত সমীক্ষার ফলাফল আরও ক্লেশ। মজার কথা এই—পাশফেল গ্রন্থা প্রবর্তনের বিষয়ে কমিশন যেমন শীঘ্র, সরকারও তেমনই নিকটবর্তী। বলা হয়েছে, প্রাথমিক শিক্ষার অন্তিম পর্যায়ে একটা পরীক্ষা গ্রহণ করবে নিজ নিজ স্কুল। আরও একটি বিষয়ে সরকার জামিন উইডেন্ডে যৌন। কমিশন তাদের প্রতিবেদনের মুখবন্ধে জানিয়েছিল, বামফ্রন্ট সরকারের প্রতিক্রিয়ার কথা—অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে সকলের জন্য

চতুরঙ্গের আগামী সংখ্যা থেকে প্রকাশিত হবে

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক বিনয় চৌধুরীর প্রবন্ধ

ঔপনিবেশিক পূর্ব-ভারতে আদিবাসী সমাজের উপর হিন্দু প্রভাবের চিত্র

ঔপনিবেশিক আমলে পূর্ব-ভারতে হিন্দু-আদিবাসী সাংস্কৃতিক সম্পর্কের একটি বিশেষ দিক আদিবাসী সমাজের উপর হিন্দু প্রভাবের বিস্তার। এই প্রভাবের চরিত্র এবং সামগ্রিক তাৎপর্য প্রসঙ্গে নানা ধারণা গড়ে উঠেছে। এই ধারণাগুলির কয়েকটির গ্রহণযোগ্যতাই হল অধ্যাপক চৌধুরীর ধারাবাহিক প্রবন্ধের বিষয়বস্তু।

আপশিলা করা হবে। সে বিষয়ে অতঃপর কী কী করা হয়েছে অবধা হয়নি, সে সম্পর্কে প্রতিবেদনটিতে অথবা সরকার নিষ্পত্তির কোথাও কোন আলোচনা নেই।

(৩)

কমিশনের প্রস্তাব— ফুলে বছরে অন্তত ২২০ দিন ফ্রাশ হবে। ফুলের মাথাই চিটটিসেরিয়াল হয়ে বন্দোবস্ত করতে হবে। কলেজে ছুটি কমানো, টানা ছুটি মতো পরীক্ষা গ্রহণ, অধ্যাপকদের 'অফ ডি' তুলে দেওয়া এবং এদিন কলেজে হাজির থেকে ছাড়নের সাহায্য করা— এসব পরামর্শ গ্রহণ করার কথা বলা হল এবং সরকারি যোগাযোগ বিশদ ব্যাখ্যা শুধু ছুটিতে পরীক্ষা নেবার বিষয়টি আছে। বাকিগুলো নয়। কর্তার সর্বস্তরের শিক্ষকদের জন্য প্রাইভেট কোর্সিং এর বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করার প্রচেষ্টা সরকারের সম্মতি আছে, কিন্তু আইন তৈরি করার বিষয়ে বলা হয়েছে— ভালো করে খতিয়ে দেখতে হবে। প্রাইভেট টিউশন, কোর্সিং সেন্টার— এসবের মধ্য দিয়ে শিক্ষাঙ্গণতে কালোবাজারি জাঁকিয়ে বসেছে। তা থেকে বেরিয়ে আসার প্রচেষ্টায় আন্তরিকতা পাওয়া চাই। কাওজে কথাবার্তায় কিছু হবার নয়। সরিয়া হাইস্কুলের জীব-বিজ্ঞানের শিক্ষক দেবশিখ চৌধুরী ফুলের মাথাই কোর্সিং চালাতে গিয়ে নানানবাব হয়েছেন। শিক্ষাব্যবসায়ীদের চাপে ফুল কর্তৃপক্ষের নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে কি কোর্সিং এর উপর। ঐহিক পরিণতনও বাদ যায়নি। কোন শিক্ষক সংগঠনই এগিয়ে আসেনি দেবশিখের সহায়তায়। দাবী প্রতিষ্ঠায় দেবশিখকে শেষ পর্যন্ত ন্যায়ালয়ের দরবার হতে হয়েছে।

আরও যেসব সুপারিশ খতিয়ে দেখার কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে আছে— বিশ্ববিদ্যালয়টিকে কাজে স্তরের পরীক্ষা নেওয়া থেকে অব্যাহতি দেওয়া, সমস্ত শিক্ষকদের জন্য আওরবিলম্বি প্রবর্তন, টুইলফোর্ড ইংরেজি মাধ্যম ফুল লেগার বিরুদ্ধে ব্যাখ্যামূলক রেকর্ডেশন, প্রাথমিক শিক্ষকদের অন্য কোন জীবিকার সমস্য় মুক্ত না থাকা ইত্যাদি। সমস্ত সরকারি কলেজ, সরকারি চাকরির পরীক্ষা, মোটাই লেগায়া ফুলগালা বাবুরের সুপারিশটি দৃষ্টিতে রয়েছে। কমিশন বলছে— ইংরেজি মাধ্যম ফুলের বিশাল চাহিদার একটা কারণ বাংলাভাষা ব্যবহারে দীর্ঘকালের বিরোধ অবস্থান। এ অবস্থান নিরসনে অতঃপর কী কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয় তা দেখতে সবাই আগ্রহ বোধ করবে।

যে সকল প্রকাশক বিনামূল্যের বই টাকা নিয়ে বিক্রি করে এবং অভিজ্ঞতারূপে বাধ্য করে বেশি দামে সহায়ক বই কিনতে শিক্ষার প্রস্তাব করেছে, তাদের শুভবুদ্ধির কাছে আবেদন জানানো, এ সব বাধ্যন কাজে বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করতে। পরামর্শটি দৃষ্টিতে রয়েছে। দৃষ্টিতে হয়েছে শিক্ষা-সেবা বাবানোর পরামর্শটিও। বলা হয়েছিল, গ্রামাঞ্চলে এ একতরুর বেশি জমির

মালিক কিংবা বছরে দশ হাজার টাকাও বেশি উপার্জন এমন সাইকেই সেস দিনে হতে মাসে দশ টাকা থেকে ১০০ টাকা। তবু ফুলের ডবলপেমেন্ট কি গ্রামাঞ্চলে ২০০ টাকা, শহরগুলোয় ৫০০ টাকা করার সুপারিশ, পরীক্ষার কি ব্যাংকো, ছাত্রকেজন হাতকস্ত ৫০, মাতাকস্তরে ৭৫ এবং ডাক্তারি ইঞ্জিনিয়ারিং-এ মাসে ২৫০ টাকা করার সুপারিশ সম্পর্কে আরও ভাবতে চায় সরকার। কিন্তু বিবেচনাযোগ্য অংশা পরীক্ষার কি ইন্টার্নিশন শেষ কয়েক গুণ বাড়ানো হয়েছে। শিক্ষা-সেবায় অচ্ছ, বার্ষিক দশ হাজারের সীমারেখা— এসবও সুনির্দিষ্ট মত হ্যা না।

যদি শ্রেণীর পরিবর্তে পঞ্চম শ্রেণী থেকে ইংরেজি শেখানোর পরামর্শটি দৃষ্টিতে এবং রূপান্তরিত হয়েছে। কমিশনের দু'জন সদস্য অংশা তৃতীয় শ্রেণী থেকে শুরু করার কথা বলেছিলেন। বিষয়টিকে ঘিরে বিতর্ক দীর্ঘদিনের। আটের দশকের গোড়া থেকেই, যখন প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরেজি তুলে দেওয়া হয়। আলোচনা, আন্দোলনের অনেকটাই হারত স্তিমিত হয়ে যেত যদি নতুন শক্তিতে ইংরেজি শেখানোর পরীক্ষাটা অর্থহীন হয়। তা হানি। সরকারি কাজকর্মে বাংলাভাষা ব্যবহারের কোন উদ্যোগ নেই। বাংলা মাধ্যম ফুলগুলিতে পঠন-পাঠনের মান নিয়োগী। যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে ইংরেজির গুরুত্ব বাড়ছে বই কমছে নয়। সব মিলিয়ে অভিজ্ঞতাকর্মের কাজে ইংরেজি মাধ্যম ফুলের বর্ধমান চাহিদা। সব থেকে বেশি ইংরেজি মাধ্যম ফুল এরাইজিয়ে। চাহিদা থেকেই জ্ঞান হয় ব্যবসাবৃত্তি। ছাত্র-ভেদে বিদ্যালয় অফের, শিক্ষক-ভেদে নামাঙ্ক। অভিজ্ঞতাধারী বিদ্যালয়, শুধু চলেছেন সুশীকার সম্মানে। এ ছুটো চলার সবটাই ঊনিশশতকি চিত্তা এবং বাস্তবসম্মতি বিরোধী মনোভাবের সম্ভাব্য এমন মনে করা যাবে। হুইলফোর্ড সিংয়েছেন— "মানসীয় লেখক শ্রীকান্তি বিদ্যাস ও তাঁর অনুশীলনের প্রকৃত প্রতিফল... হাজার হাজার বায়হুট মরফক বাহা শহরের বস্তিতে রিমিউজি কলেনীয়েত বা গ্রাম-গ্রামান্তরে সর্বস্বাস করেন টারাই প্রকৃত প্রতিফল, কারণ টারাই ইংরেজি ফুলকে সমর্থন কম্বন। ওল্লসন বিকাশের ধারাকে মনুয়েল মন বাদ দিয়ে টিউ-টিন ওল্লসনের কমিশন রিপোর্ট দ্বারা যদি নিয়ন্ত্রণ করা যৌত তাহলে সত্তর বছর সমাজকর্তরের মাথো থেকেও নগরো-কারাবাধ্য নিয়ে আজারাবিজান্নো এ অফোমিয়ার মধ্যে যুক্ত হত না আর তাজাকিসিয়ে মৌলবান জাঁকিয়ে বসত না। এই 'মানুয়ের মন' নিয়ে জবানা-চিন্তার, তাকে বোঝার, তাকে সাড়া জাগানোর কোন উদ্যোগই নজর পড়ে না। না কমিশনের প্রতিবেদনে, না সরকারি যোগাযোগ। দীর্ঘ বিবেচনায় সুযোগে ইংরেজি শিক্ষা নিয়ে যে নতুন নতুন দিক উঠে এসেছে তাহলে সরকারকে কেউ আগ্রহ দেখাল না, এটা আক্ষেপের কথা।

মাধ্যমিক ফুল শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রক্ট জেলায় School Service Board গঠনের উপদেশটি দৃষ্টিতে রয়েছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে কমিটি গঠনের কথা, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ

শিক্ষা

কমিটিতে বিশেষজ্ঞ-জনের সংখ্যাধিক্য, কলেজ সার্ভিস কমিশনের কাজ শুধু যোগ্য প্রার্থী বাছাই-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা, অধ্যাপক নিয়োগের কাজে নয়— এসব পরামর্শ খতিয়ে দেখার কথা বলা হয়েছে। সমগ্র বিষয়টি কালহরণ না করে খতিয়ে দেখাই উচিত। তবে প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সর্বস্তরে শিক্ষক নিয়োগে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি, দলবাজি এমনকি উৎকোচ গ্রহণও যত্নেবা স্বাভাবিক নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে তা থেকে নিয়োগের সাক্ষ্যটিই বড় কথা। কমিশন বলছে— শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি গোটা দেশকে পলু করতে দিতে পারে। শিক্ষক নিয়োগে তাই কেবলমাত্র দেখার বিষয়েই হওয়া উচিত। এ পরামর্শ অতঃপর কড়টা মানা করা হবে— প্রকৃতি তাকে ঘিরেই। হুইলফোর্ডহুজির মতে— "শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারটি উচিত জ্ঞানা আকার ধারণ করেছে। যোগ্যতা বিচার করে নিয়োগ অপেক্ষা প্রভাব কেন্দ্রিক নিয়োগে চালু হয়েছে।"

সব শিক্ষক ৬০ বছরে অবসর গ্রহণ করবেন, কমিশনের এই সুপারিশটি যে গ্রহণ করা হবে তা অবশ্য জানাই ছিল। আসলে কমিশন গঠনের আগে থেকেই এ বিষয়ে সরকারি উদ্যোগ চলছিল। সেসব দেখেচলুন এমনও মন্তব্য করা হয়েছে— "এরকম সন্দেহটো অমূলক নয় যাহাতো যে, কমিশন তাদের সুপারিশের মধ্য দিয়ে সরকারি ইচ্ছা রূপায়নের কাজটিকে সহজ করতে চেয়েছে যেখানে শরিক দলের মধ্যেই এ নিয়ে যথেষ্ট বিরূপতা ছিল।" একইসঙ্গে অবসরকালীন পাণ্ডন্যগতা মিটিয়ে দেবার বিষয়ে কমিশনের সুপারিশ কড়টা কার্যকর হবে, বাহাড-প্রমাণ ঊপসীনাও অবস্থানা কানিয়ে ওঠা বাকি কি না, সে প্রশ্ন থেকেই যায়। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের ক্ষেত্রে বিবর্তনীয় যে নিষ্ঠা, যে দায়িত্ববোধ কাজ করে এদের তার ছিটেফোঁটাও অনুপস্থিত। অবসরগতা যে সকল শিক্ষকদের নাকে দাঁড় দিবে ছোটোনা হচ্ছে, সে সংখ্যা দক্ষ ছাড়াই। এসব অভিজ্ঞতা থেকে এটাই মনে হয়, দীর্ঘদিনের চলতে থাকা প্রকাশনিকি ঐশ্বল্য, যা কি না স্বতীয় অপরোধের পর্যায়ে পড়ে, তার মুক্তি কোন প্রতিকার নেই।

কমিশন বলছে, শিক্ষাখাতে বরাদ্দ অর্থের বেশিটাই ব্যয় হয় ভোগা ও উচ্চশিক্ষায় বেতন বাবদ, ফুলের ক্ষেত্রে পলককা ১৫ ভাগ ভাগ শিক্ষানিক্ষয় ৩০ ভাগ। পড়ে থাকা সামান্য টাকায় শিক্ষার কোন উন্নতিই সম্ভব হয় না। সুপারিশ ছিল, বেতন বরাদ্দ এই ব্যয় যথাক্রমে ৭৫ ভাগ এবং ৫৫ ভাগ নামিয়ে আনতে হবে। সুপারিশটি দৃষ্টিতে রয়েছে। শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের রতমান সংখ্যা ও বেতন কমানো হবে না, এটা ঘরে নিজে এর অর্থ দাঁড়াইবে এই যে, ফুল-শিক্ষা খাতে বর্তমান ব্যববরাদ বাড়ানো হবে আরও অন্তত ২০০০০ ২৭ ভাগ আর উচ্চশিক্ষাখাতে ৪৫ ভাগ। অর্থবিজ্ঞানের মতানুসঙ্গায় এটা আদৌ সম্ভব কি না, সন্দেহটো সেখানে। হুইলফোর্ডহুজি জানিয়েছেন, "১২-১৩ লাখেটো... শিক্ষাখাতে নয়... মোট ব্যয়ের উনিশ শতাংশ আর উদারমূলক ব্যয় পাঁচ শতাংশ। এর চেয়ে বেশি টাকা বাড়ানো

সম্ভব নয়। সুতরাং, সার্বজনীন অবৈতনিক শিক্ষাব্যবহার দায় ছাড়তে আমরা বাধ্য।... তেমনি আমরা প্রাইভেট ফুল-কলেজ এমনকি জেডিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজও সেসকালের ব্যবহার করতে বাধ্য।" Capitation fee বিষয়টি এখনও এই রাষ্ট্রকে কষ্টে পায়নি বটে, শিক্ষা সেসকালিকর্মের প্রকৃতিটি যে দামটো এগিয়ে চলেছে তা বলায় অবশ্যক্য রাখে না।

ফার্মিয়ারের সব থেকেই বেশি শিক্ষার বিষয়ে কাক্তিকত উদ্যোগের যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। অতঃ মানবিক মর্মান্যবোধের উদয় ঘটিতে হুইলফোর্ডহুজি দীর্ঘকাল ধরেই মৌলিক অধিকার আত্মকরণে শিক্ষা নিতাশুই অপরহিয়ার। শিক্ষার অধিকার তাই মৌলিক অধিকার। সপ্তিম কোর্সের ও তার অভিমত। সকলের মধ্যে শিক্ষা বিতরণের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের। প্রাথমিক ভাবে কষ্টকর হলেও নিয়োগ সে দায় মাথা পেতে নিতে হয় কারণ শেষ বিচারে এতে লাভজনক হয় রাষ্ট্র। কিন্তু অমান্যদের বেগের সরকারি ব্যবস্থাপনায় ধারাবাহিকভাবে ঘটে চলেছে অবশ্য অপরহিয়ার। বহু নির্দেশ, এমনকি প্রতিজ্ঞাও, টিউ-টিন কমিটি কমিশন রিপোর্টের পরেও ১৯৭৫ সালে শুভেৎ যা কপাল চাপিয়ে অনুশোচনা— If investing in education is costly, not doing is costlier! অনুশোচনা নাকি শুভুই হয়নিই উল্লঙ্ঘিত। "UNDP'র একটি হিসাব— ১৯৬৬ সালে অত্র অসমানিক কতে ভারবায় করছে পাকিস্তানেও বহুগুণ অর্থ। ভারতের বৈশেষিক মুদ্রার শক্তকরা চম্পি ভাণ্ডারের বেশি ব্যয় এই বারদে। এ ঐক্রে বছরে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে মিলিয়ে মোট বরাদ্দ ছিল প্রতিভ্রা বারদের প্রায় এক শতাংশ মাত্র। কৃষণ অপরবাদ শিক্ষাখাতে সর্ববর্ষানী ঊনাব্বারের অবশ্যই একটি খণ্ডটি। অবশ্য-অবশ্যে এই রাষ্ট্রের পাকিস্তানেও যথেষ্ট প্রকট। সাতের অশেষকামসানায় অবসানের সাধ উদ্যোগকে ক্ষুরেতে কাটতেও একটা বলা যায়। শুধু প্রাথমিক নয়, মাধ্যমিক স্তরেও এই রাষ্ট্রের মানুসের আদ্য প্রথম পদম সেসকালের ইংরেজি মাধ্যম ফুল— এই মন্তব্য যেম দিক কমিশনের। কেন্দ্রীয় সরকারের নয়া শিক্ষানীতি একনা যে যে সমালোচনায় বিলুপ্ত করা হয়েছিল— শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা করা, নিয়ম আর উচ্চশিক্ষার জন্য সামান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা পলককা-সেচ্চানো— তার প্রায় সব উপাদান বর্তমান কাউন্সিলের প্রতিবেদনেই শুধুনয়, রাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থার সমমান প্রতিষ্ঠিত। তবে এ কমিশনের সৌভাগ্য এই যে, তাদের সুপারিশের সংক্ভাঙ্গয় সরকারের কাজ গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে। অসম্মত মিত্রকে ভরতবর্ষ দর্ভর মত দীর্ঘকাল হেঁচকে রেখেছেন যাহনি— "কর্মগোষ্ঠীকাক্তিকে, যা ফলস্বূ কাক্তি।"

সরকারের দৃষ্টিতে পরামর্শের কোনগুলি কড়টা কার্যকর হয়, রাষ্ট্রের শিক্ষাটিতে কী পরিমাণ অগ্রগতি ঘটে, কেবে দেখতে চানো বিষয়গুলি কড়টা ভাবা হয়, ডেবে চিন্ত করা হয়— এসব জ্ঞানতে মান্য গ্রাহ্যই। শিক্ষার উন্নতি ঘিয়ে রাজাবাসীর অনেক প্রত্যাশা। বিষয়টি খুবই জরুরি।

তথ্যসূত্র:

- (১) Report of the Education Commission (1992): Govt. of West Bengal.
- (২) Statement of the Chief Minister on the recommendations of the Education Commission constituted under the chairmanship of Dr. Ashok Mitra (June 7, 1994).
- (৩) Challenge of Education—MHRD (1985).
- (৪) Human Development Report 1990 (UNDP): Oxford University Press.
- (৫) জ্যোতি ভট্টাচার্য: 'মিত্র কমিশনের রিপোর্ট', দেশ, ১৯ জুন, ১৯৯০।
- (৬) ভবতোষ দত্ত: 'প্রাথমিক শিক্ষার অধিকার', চতুর্থ, অগস্ট ১৯৮৮।
- (৭) ভবতোষ দত্ত: 'যা ফলেমু', শিক্ষা ভাবনা (নান্দা)।
- (৮) মনসুর হবিবুল্লাহ: 'ডঃ অশোক মিত্র কমিশনের সুপারিশ প্রসঙ্গে কিছু কথা', চতুর্থ, ডিসেম্বর ১৯৯২।
- (৯) মনসুর হবিবুল্লাহ: 'আধুনিক জ্যোতি কামিনি' (অন্তরঙ্গ

- (১০) Shadow Boxing (Editorial): Frontier, June 4, 1994.
- (১১) প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষানীতির সমালোচনায় শিক্ষক সংগঠন সমূহ: গণশক্তি, অক্টোবর ১০, ১৯৮৫।
- (১২) Surja Sankar Ray: Letter to the Editor, The Statesman, Dec. 12, 1993.
- (১৩) মানস জ্যোয়ারদার: 'অশোক মিত্র শিক্ষা কমিশন প্রসঙ্গে', অনুষ্টিপ, গ্রীষ্মসংখ্যা, ১৯৯০।
- (১৪) মানস জ্যোয়ারদার: 'শিক্ষার বেসরকারিকরণ ও আধুনিক জ্যোতি কামিনি', পবিত্র, অক্টো, ১৯৯০।
- (১৫) মানস জ্যোয়ারদার: 'শিক্ষার বর্তমান কালোবাজার', আনন্দবাজার, ২২ মার্চ, ১৯৯৪।
- (১৬) মানস জ্যোয়ারদার: 'Mitra Commission Report—More by Cliche than Marxism', Frontier, May 29, 1993.
- (১৭) মানস জ্যোয়ারদার: 'Chancellors of vice', The Telegraph, June 27, 1994.

স্মরণে

শহীদ মাতা জাহানারা ইমাম এবং দুখানি আত্মজৈবনিক গ্রন্থ

আবদুর রউফ

কান্দার বাঘিতে জাহানারা ইমামের মৃত্যু ঘটেছে ১৯৯৪-এর ২৩ জুন। আমাদের এই শ্রুতিমূলক তথ্য ভারতবর্ষে জাহানারা ইমাম তখন পরিচিত নন। কিন্তু বাংলাদেশের অগণিত মানুষের চোখে তিনি শহীদ জননী, মরীচিকা লেখিকা এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আদর্শ নিবেদিতপ্রাণ বীরাদনা নেত্রী। মৃত্যুর পর তাঁর উদ্দেশ্যে নিবেদিত শ্রদ্ধাঞ্জলিতে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী লিখেছেন, “সব শহীদের জননী হয়ে রইলেন তিনি। মহিলারা এখন আমাদের রাজনীতিতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তারা উভয়েই মুক্তিযুদ্ধের মানুষ। কিন্তু জাহানারা ইমাম একেবারে আলাদা। তিনি ভোটার প্রার্থী নন। প্রত্যাশীও নন ক্ষমতার, কিন্তু নন কলহে। তার লড়াইটা ডায়ালেক্টের, সে হচ্ছে ক্রমবর্ধমান লড়াই। বাংলাদেশের সব ক্রমবর্ধমান, সকল যথার্থ মুক্তিযোদ্ধার।” (সংবাদ, ৩০ জুন '৯৪)

১৯২৯ সালের ২ মে জাহানারা ইমামের জন্ম মুর্শিদাবাদ জেলায়। তাঁর বাবা সৈয়দ আব্দুল আলী ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। পরিবার রক্ষণশীল হলেও বাবা ছিলেন আধুনিক মানুষ। জাহানারা রংপুরের কামাহাট্টেকল কলেজ থেকে পাশ করেন ইন্টারমিডিয়েটে। তারপর বাবার প্রেরণায় কলকাতায় আসেন লেডি ব্রোডলি কলেজে বি এ পড়ার জন্য। বি এ পাশের পরেই শিবপুর ইন্ডিনিয়ারিং কলেজ থেকে পাশ করা সিভিল ইন্ডিনিয়ার শরীফুল ইমামের সঙ্গে জাহানারার বিয়ে হয়। স্বামীও ছিলেন মননে এবং আচরণে পুরোপুরি আধুনিক মানুষ।

কর্মময় জীবনের শুরু শিক্ষিকা হিসাবে। প্রথমে ময়মনসিংহ শহরে বিদ্যামণী গার্লস স্কুলে। তারপর স্বামীর চাকরিস্থল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ঢাকায় মাত্র তেইশ বছর বয়সে সিদ্ধেশ্বরী গার্লস স্কুলে প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে যোগ দেন। ১৯৫১-৫২-র ক্রমিক জমা। এই দশকের শেষ দিকে জন্মগ্রহণ করে দ্বিতীয় পুত্র জামী। ছেলেরের ভলভারে মানুষ করে তোলার জন্য ১৯৬০ সালে তিনি চাকরি ছেড়ে দেন। ১৯৬৪-তে আর্মিরাজি যখন ফুলরাইট স্কলারশিপ নিয়ে। ঘিরে এসে ১৯৬৬ সালে অধ্যাপিকা হিসেবে যোগ দেন টিচার ট্রেনিং কলেজে। দু'বছরের মধ্যেই এই চাকরি ছেড়ে দেন।

শরণ পূর্ব বাংলার জাতীয় জীবনে ঘটে ৬৯-এর আত্মবিরোধী গণঅভ্যুত্থান। তারপরেই ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ। জাহানারা ইমাম মুক্তিযুদ্ধে হারান প্রিয়তম পুত্র ক্রমী এবং স্বামীকে। নিরাপত্তা শোকে

তার দেহ মন বিপ্লবিত হয়ে পড়ে। অথচ কত সুন্দর চেহারা ছিল তাঁর। কবি শামসুর রহমানের ভ্রাতায় অদেকলিখিত অর্চনায় সূচিত। সেনের মধ্যে দেখতে ছিলেন তিনি। এই শোকবাহি দিনগুলিতেই হরেকরকমের দুরারোগ্য বায়ি তাঁর শরীরে আসন গড়ে বসে। জিহবার ক্যানসার, গ্যাস্ট্রিক, ব্রংকাইটিস, আর্থরাইটিস ইত্যাদি যোগে জীবনবিলম্বী মরণ শুরু হয় তাঁর দেহে। কিন্তু এই ক্ষরণ নিয়েই ধারণ করেন তিনি লেখনী। লেখার প্রেরণা সম্পর্কে পরবর্তীকালে ‘ক্যানসারের সঙ্গে বসবাস’ গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, “এখন আমি বাঁচতে চাই। বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের জন্য আরো লিখে যেতে চাই। আমার বই পড়ে সেসব পাঠক আমার কাছে আসে তাদের বেশির ভাগের বয়স ১৫ থেকে ২৫-এর মধ্যে। তারা আমার কাছে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে কত কিছু জানতে চায়, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের কথা আরো বেশি করে জানতে চায়। তাদের ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ দেশানো নানা সমস্যার সমাধানও জানতে চায়। ...তাদের আগ্রহে স্বল্প স্বল্প মুখের বিকে তাকিয়ে আমি আরো বিচারা লিখে যাবার প্রেরণা পাই।”

এই নতুন প্রজন্মের মুখ চেয়েই ২০০০ সাল পর্যন্ত বাঁচতে চেয়েছিলেন জাহানারা ইমাম। কিন্তু করাল বাঘি তাঁর সেই সাধ পূর্ণ হতে দিল না। তাঁর মৃত্যুর মাত্র ১৬ দিন আগে কবি শামসুর রহমান লিখেছিলেন, “আমাদের এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন, পশ্চাৎপদ, বিশ্বশ্রুতপরাগ সমাজে জাহানারা ইমামের মত মানুষ বিরল। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত শোককে জাতির এক বিরাট অংশের শোকে রূপান্তরিত করেছেন। এদেশের মানুষের মন থেকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা যখন প্রায় অন্তরালে তখন তিনি আমাদের গড় করিয়ে দিলেন নতুন এক সূর্যোদয়ের মুখে।” (ভোতের কাগজ, ১০ জুন, ১৯৯৪)

এই ‘সূর্যোদয়’ বলতে ১৯৯২ সালে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষে গড়ে ওঠা নতুন জাগরণের কথাই বোঝানো হয়েছে। এই জাগরণ সম্ভব হয়েছিল দুরারোগ্য ক্যানসারের আক্রান্ত ৬৩ বছর বয়স্ক জাহানারা ইমামের অদম্য প্রেরণায়। এওনিম যে বেদনা অন্তরে স্বলছিল সেটাই যেন ফেটে পড়ল জননীর নেতৃত্বকর্তারী ভূমিকায়। আত্মদানের লক্ষ্য হল, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ব্যাপ্তবয়স এবং ছাতক দালালের বিচার। বাংলাদেশে শুরু হল দ্বিতীয়

মুক্তিযুদ্ধ। এই লড়াইয়ের পশ্চাৎপট বোঝাতে গিয়ে 'মূলধারায় চলছিল' শীর্ষক একটি অসমাপ্ত লেখায় জাহানারা ইমাম লিখেছেন, "একাত্তরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকালে গোলাম আজম ও জাভেদ ইলাহাবের পাকিস্তানিদের সমর্থন, গণহত্যার সহযোগিতা, লুটতরাজ, ধনসংগ্রহ, অসমসংযোগ, নির্যাতন-ধর্ষণের করা কখনো ভুলতে পারিনি। সব সময় যোগেই এইসব মুদ্রাপ্রাণীদের বিশেষ হয়ে। অতীতে অনেকের সঙ্গে এই প্রসঙ্গ কথা বলেছি, কাজ করার চেষ্টা করেছি, আন্দোলন করতে চেয়েছি। বাকসি, দালাল, রাজকার, আলদবর, আলমশানু, গোলাম আজম, জাভেদ-শিবিসঙ্গ এই সকল অপশক্তির বিরুদ্ধে আমরা অনেকটাই সোজার লিলাম। আমরা মধ্যে এই ঘৃণিত শত্রুদের বিরুদ্ধে ফোড ছিল, বাবা ছিল, মশুগা ছিল। এখনো আছে। অনেকে বন্ধুরা মানা ধরনের সংগঠন ও আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন সন্দেহকে নিয়ে। সেসব সমল হয়নি; বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে। দেশে সামরিক দুশৃঙ্গাল ছিল। মুক্তিযুদ্ধের শত্রুর শক্তিশালী বহুবিশি প্রসে ও বিতর্কে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। রাজনৈতিক দলগুলোতে সমল যেনা একটা ছিল অলীক ব্যয়। জেনারেল এরশাদের দুশৃঙ্গাল এবং তার বিরুদ্ধে যাবাবাহিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অনেক জট লুলছিল। এক ধরনের এক গড়ে উঠেছিল। আবার অনেক জামা-ভঙ্গার শিষ্টে শিষ্টে এক পা-দুপা করে সামনে আসছিল জাভেদ-শিবির থাকে কিছু — অনেকেই যোগেছে, অনেকের প্রসে। বৈরাচারী এরশাদের পতনের পর টেলিভিশনের পর্দা আবার বৈরাচারেই দেখানো। ধর্মীয় বৈরাচারী জামায়েত নেতা খাতক আব্বাস আলী খানের চেহারাও ভেসে উঠলো বাংলাদেশ জিয়া, সফ হাঙ্গানি, রাশেদ খান মেননের পাশাপাশি। বিভিন্ন সর্ব ঘটনা। সামান্য নির্বাচনে তারা আয়ারটি আসনে নির্বাচিত হলে। দেশের সাধারণ মানুষের মনোনে জামাত শিহিরের বিরুদ্ধে কোন বাকসি ছিল না। আমরা নতুন প্রজন্মের মানুষদের এই অপশক্তির বিরুদ্ধে প্রসেজ করতে চেষ্টা করতে পারিনি। এই অপরাধের দায়িত্ব থেকে আমরা মুক্ত ফেরা পাব না।"

এই বোম থেকেই রোগজীর্ণ শরীর নিয়েও শহীদ জান্না জাহানারা ইমাম নেতৃত্বের ভূমিকা দিয়ে আসেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মূলধারণদের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে। তার শোকাবর্তন ধর্ম থেকে বেরিয়ে আসে অত্যাচারী শক্তির। বাংলাদেশের প্রান্তে প্রান্তে ছুটে বেড়ান ছিল। তার উদ্দেশ্যে গঠিত খাতক দালাল নীলী কামীর আদর্শে গোলাম আজমের বিচারের দাবীতে সারা বাংলাদেশে তোলোপাট হয়ে যায়। ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে নিষ্ঠিত দিনে লক্ষ লক্ষ লোকের জমায়েতে গণআন্দোলত হয়ে। বিরোধে গোলাম আজমের ফাঁসির হুকুম হয়। এই গণপায় বকবৎ করার দায়িত্ব অর্পণ করে বাওলে জিয়ার সরকারের বিরুদ্ধে। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠা জিয়ারের তাৎপর্য বাংলাদেশ সরকার বুঝেও না বোঝার দান করে, আন্দোলনকারীরা আইনি মসলকতের দিকে মনো দেয়া প্রসেজ করে, অপের জামানার বৈরাচারীদের মতোই দমননীতি লাগাতে থাকে। এই দমন শীড়নের মোকাবিলা করতে করবেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা রূপান্তরিত হয় দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধের অধীকারে। কিন্তু এর পরিণতি দেখে বাওয়া জাহানারা ইমামের

পক্ষে সমল হল না। কানারার নামক করাল ব্যাবির সঙ্গে অপরিমীম মানসিক ক্ষমতা নিয়ে পাঞ্জা লড়তে লড়তে শেষ পর্যন্ত দেহ নাকন নরত ব্যাবির নৃণ অসহযোগিতার কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া তার উদায় ছিল না।

এই কানারারের সঙ্গে লড়তে লড়তেই তিনি লিখেছিলেন তাঁর অমর গ্রন্থ 'একাত্তরে নিমজ্জিত'। এটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের টোকাটো। এই বই সম্পর্কে 'সচিব সন্ন্যাসী' ডঃ সাহিদ আতিকুহা লিখেছেন, "লিঙ্গ প্রণামটি সম্পর্কে উদাসীন ব্যাঙ্গিলের জন্য জাহানারা ইমাম এক অমূল্য দিলিপ উপহার দিয়েছেন। মনোজ্ঞ বলে এ দিলিপের প্রতি উদাসীন থাকা সম্ভব হবে না কারো ক্ষেত্রেই।" ১৯৮৩-তে এই বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর এই অসামান্য জনপ্রিয়তাই এই উক্তিযুগ্মার্থতা প্রণাম করে। মাত এই কা বহুরে প্রকাশিত হয়েছে বইটির দশটি সংস্করণ। এই বই প্রকাশের পর সাহিত্যের জন্য বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার 'বাংলা একাডেমি' পুরস্কার পান জাহানারা ইমাম।

'একাত্তরে নিমজ্জিত' বই আকারে বের হওয়ার আগেই তিনি লিখেছিলেন, "আনারলী" নামে আর কখনো আবার লিখিব না। গ্রন্থ। জাহানারা ইমামের অন্তরঙ্গ ব্যক্তিত্বকে বোকার জন্য এই দুখানি গ্রন্থেই ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় এই দুখানি পর্য্যালোচনা একাদে প্রকাশ করা হল। মৎকর্তা পর্য্যালোচনাটি এসব ঘটনার সন্দেহকে আশ্রয় লেখা। কিছুটা ভিন্নগণের অনাড়ম্বর হাস্যও হয়েছে। অসন্তো অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠায় পরিমাণেই রাশে পর্য্যালোচনাটি 'চতুর্থের' শঠকগণের কৌতুক নিবৃত্তির জন্য এখানে উপস্থাপনা করা হল।

★ ★ ★

জাহানারা ইমামের আত্মজীবনিক দুখানি গ্রন্থের নাম 'আনারলী' এবং 'একাত্তরে নিমজ্জিত'। বইখ শতদলের প্রায় কত থেকেই বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তদের জীবনের কাম্পনীয় কত মূহ হইয়াছিল বিবেশ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে 'আনারলী' প্রতিফলিত জীবনচিত্র তার সাক্ষ্য বহন করে। জাহানারা ইমাম এমন এক পরিবারে জন্মেছিলেন যেখানে পর্দা সম্পর্কে সংস্কারের মেয়েদের মধ্যে তখনো কিছু ছিল তার প্রসঙ্গসম লেখিকার নানীর কথবা থেকে অনেকখানি অম্মান করা যায়। লেখিকা তখন ছুঁ নামের একটি ছোট্ট পাত্রী। বাড়ি আলমশানের পুরুষগুলো সাতার বেটে বেড়ানোয় তার মহান্ন। একদিন শিশুসকল কৌতুকসম্মে সন নীকে জিজ্ঞাসা করে বসে, 'নানী, আনারা পুরুষ সাতার কাটতে যান না কানে?'

নানী অবজ্ঞা কান কুঁতে জবাব দিলেন, 'বলিস কিগো? মীর বাড়ি বৌ-বিবরা বলে খিড়ি রোজারায় উঠার পা দেখানি কুনোদিন। খলোকে (মদ্যময়নে) ই বাড়ির বৌ-খিনের ম' দেখেই? পর্দা ছাড়া হওয়ায় চিরা চলে যাবো ভালো।'

সেই সময় মেয়েদের বাংলা লেখাপড়া শেখানোকেও মনে পড়ত না নারায়নানীর কাজ। তাদের শুধু কানো শরীফ রিডিং লড়তে শেখানো হত। জুজুর বামী আশুনিশ শিক্ষায় আলোচনাও, তাঁর নিজের ভীকে বসে বসেই আপন প্রচেষ্টায় বাংলা লেখাপড়া

শেখাতে উদ্যোগী হলে জুজুর পিতামহ কড়া ভাষায় এই ধরনের নায়দর্শনের কাজ বন্ধ করতে বলে কঠোর হুকুম জারী করেন। কিন্তু উনিশ শতকের শেষ দিক থেকেই চাকরি-বাকসির সঙ্গে শিখিত বাড়ি মুসলমানের জীবন বিনীতলী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যুগ পরিবর্তনের হাওয়া তাদের অন্তরমহলেও ঢুক পড়ছিল। পুনে জামানার প্রতিনিধিরায়ে অভিব্যক্তির হাজার ক্রান্তি সত্ত্বেও মেয়েরা বামো-হুসেপী লেখাপড়া শিখেই শুরু করেছিলেন। এমনকি তাঁদের মাতৃভাষা সাহিত্যচর্চায়ও আর ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। লেখিকার 'আনারলী'—এর বর্ণনায় এই চিত্রটি ধীরে ধীরে স্পষ্ট হচ্ছে যার।

বিশ শতকের শুরুতে গ্রামীণ মুসলমানদের পারিবারিক-সামাজিক জীবনের যে চিত্র বিশেষ করে মহিলাদের পর্দানীলী বন্ধজীবনের যে ছবি তাঁর বর্ণনায় চিত্রিত হয়েছে তার সঙ্গে ভুলনায আজকের পরিবর্তনের চেহারাটা বুঝে নিতে বিশেষ সুবিধা হয়। তবে বেশিমানেরে গ্রামীণ মধ্যবিত্ত মুসলমান সমাজে পরিবর্তন যুগ যে শিথি হয়েছে এমন মনে করার কোন কারণ নেই। জাহানারা ইমাম তাঁর শিশু বয়সের স্মৃতিচারণে সাময়িকভাবে খান-বাগানপুট বন্ধ জীবনের যে আনন্দময় বিকার কথা আমাদের শুনিয়েছেন তার বিশেষ কিছু ছিঁ আর অবশিষ্ট এই। এই দিক থেকে পরিবর্তনটা বরং বেশ ভালভাবেই দেখাচ্ছে। বিয়ে-সাদি উপলক্ষে পাড়া-পড়ানীয়ে মেয়ে সমষ্টিত আনন্দে মগ্ন শড়ে যুগে, এমনকি পড়া মুসলমানজীবিত অন্তরমহলেও রাগের পর রাগ জগে গীতাদান। সহযোগিতা নৃত্যগায়ক আসার বসত।

বৌলবদের শুনিতা জাহানারা ইমাম বামোদের একজন এই আনন্দময় দিবসপুত্র কিছুই আর প্রায় অবশিষ্ট নেই। বাল্যা অর্নেকটি বাল্যের অনন্বিত এবং সুগেহ হওয়ায় এরা জন্য কিছু পরিমাণে দানী। গ্রামে গ্রামে উজ্জ্বলবৌনা মেয়েদের কাছে বিয়ে তে এখন প্রায় তাৎক্ষের পর্যায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে মুসলমান-বাহুদের যে অঞ্চলের কা খেলিকা আমাদের শুনিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ অত্যাচার মুসলমানদের মধ্যে এই অঞ্চলটিতেই সর্বাধিক।

জাহানারা ইমামের শিশু বয়সের স্মৃতিচারণায় পশ্চিমবঙ্গ মুসলমানদের জীবনের যে ইতিহাসকে নিকটপ্রাণ আনন্দে দেখে ধরা শড়ে তার কতখানি আজও অবশিষ্ট আছে সেটা অনুসন্ধানের দায়। একদিন ছুঁ নামের যে মেয়েটি পুনে ম'হাত খেলো, বামায় শিষ্টে মনে ছিল যিগা নকল বেগম ম'হাত খেলো, নাকে নোপক, হাতে তেমনি মুড়ি, কোমের প্রহরায়, পায়ে ম'হাত খেলো পরে তার তপে তৎকালীন গ্রামীণ মধ্যমায় পরিবেশে মহান্নমে খেলে বেতলে সেই-ই যে ক্রমে উচ্চশিক্ষিতা আবার কতিপয়সাল, বাংলাভাষায় একজন বিদ্যাশীল লেখিকা, জাভিদ জাভেদতারের পৃষ্ঠপোষক এবং সর্বোপরি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হওয়ার সুযোগা জ্ঞানী হয়ে উঠে পাগলেন, এর মধ্য আশ্চর্যভেদ কোন ভিন্ন নেই। অর্থাৎ জুজুর সঙ্গে জাহানারা ইমামকে চিত্র লেখানো যায় না। এমনকি লেখিকা বিবেচন এই দুই জীবনের তুলনা করতে গিয়ে বিম্মিত হয়ে বসেন, "১৯৮০ সালে ঢাকায় মনে মনে জীবনের প্রথম শতকের দিকে দৃষ্টি ফোরা

তখন যেন বিশ্বাসই হতে চায় না, সেই সময়ে সেই আমি আর আজকের এই আমি একই ব্যক্তি। দেশ, কাল, পরিবেশ, মানসিকতা সবই এত বেশি আমারমত ছিল মনে হয় সেটা অন্য এক জগতে অন্য এক জীবন।" আশ্চর্য্যচিত্রে তাই মনে হয় বড়, তবুও এই দুই জীবন যে বিভিন্ন কোন আখ্যান না, জুজুর জীবন থেকে রূপ রস গন্ধ আহরণ করেই যে জাহানারার জীবন সক্ষম হয়েছে তা একটু তথ্যের দেখলে ব্যক্তিবৃত্তির বিশেষ কোন অন্তরীণ হওয়ায় কথা নয়। ঐতিহ্যমুখ্য দ্যারালবক্তার মতোই মাঝে মাঝে বেবে থাকে। একটি সুমুদ্রাশীল পল্লবপরা পর্বতী মূলে ধান-বাগানায় সঙ্গে সঙ্গে-মহাতত করতে করতে তার সন্তান পুরোপুরি অন্য রূপ দান্য করে। অম্মান আর পুরনো শরৎপরায়ে আলাদা করে চিহ্নিত করা সম্ভব হয় না। কিন্তু নতুন যে সংস্কৃতি এল তার মধ্যেই নিহিত থাকে পুরাতনের মালমশলা। কিন্তু এই নতুন বর্ণগায় হয়েছে পুরাতনী মালমশলা এর মধ্যে নিহুতভাবে বিশেষ গেছে বলে। এই মালমশলা কেমন করে তাঁর তামতাই, মাতা, পিতা, পিতৃবৃন্দ ইত্যাদির মাধ্যমে বাহিত হয়ে তাঁর চারিদে বাদ হয়ে মিশে গেলে 'আনারলী'র বর্ণনায় তা বেশ-শুণ্তি মেসায় চিত্রিত। যারও লেখিকার বারদ উপলব্ধি করেন। তিনি নিকট স্মৃতিচারণই করতে চেয়েছেন একা এক করত গিয়ে নিজেই বিবিত্ত হয়ে ভাবতে বসেছেন, 'সেই আমি আর এই আমি কেমন করে সন্তান হল?' বাবা বাল্যে, অনুগ্রহ ভাবনাভাজত এই বিষয় তাঁর প্রজন্মের এমনকি তাঁর শাবের শিগের প্রজন্মের গ্রামীণ জীবন থেকে উঠে আসা অনেকেরই মনে আজও চমক সৃষ্টি করে।

পর্বতী জীবনে জাহানারা ইমাম বামো সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট লেখিকা এবং শিক্ষাবিদ। দীর্ঘ সময় তিনি ছুঁ, কবজ্ঞ ও বিনীতবাল্যের শিখকভাষায় কাজ করেছেন এবং বড় দেশও ঘুরেছেন। তাঁর বড় পরিচয় বিবৃত রয়েছে সামাজিক প্রতি তাঁর অধীকারের ক্ষেত্রে। বিশেষ করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের তেভাক সমুদায় রাগের ক্ষেত্রে তাঁর অপসীলি কবাক্তি তথ্য হিসাবে তাঁকে স্বতন্ত্র মণ্ডনা দিয়েছে। প্রত্যন্তপক্ষে বামোদের মুক্তিযুদ্ধ জাহানারা ইমামের জীবনে এনোহি এক কথ্যনিদারক চালেক। 'একাত্তরে নিমজ্জিত' হল এই চালেকের স্মৃতিচারণ। যে বাড়ির মেয়েদের বাংলা শিখানো মনে হত তার নামজারনীর কাজ, সেই বাড়ি মেয়ে জাহানারা। পিতার তৎপরতায় বামোভাষা ও সাহিত্যে শুধু শিক্ষালব্ধিই করেনি, এই বামোকে ভালোবাসে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের পটভূমিকায় হয়ে উঠেছিলেন পুরোপুরি বাঙালি জাতীয়তাবাদী। এই জাতীয়তাবাদী আবেগের নিয়ন্ত্রণে তাঁর জীবনসারী, যামী ও বড় শরীফ ইমামের মুক্তিযুদ্ধের পুণ্যে মধ্যও তাঁরা সজ্ঞারিত করেছিলেন এই একই আবেশে। জোড় শুধু কথীর যার কুড়ি, স্না আই এম সি পাস করেছেন। কনিষ্ঠ পুত্র নীলীর বয়স সাতের দিকে, দম্ম শ্রেণীতে পড়ে। শরীফ ইমাম শোমায় শিখিদিয়ার। ইমাম পরিবার যোম্যোটি সত্যসিদ্ধান্ত ও সুখী। কিংবা বাঙালি ও বাঙালিকণের প্রতি দমনবাহারের দায়িত্ব তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের এইরকম অসহায় হাজার হাজার শ্রমী পরিবারের সঙ্গে তাঁদের জীবনেরও ঘনিষ্ঠে এল চূড়ান্ত সর্বনাশ। সেই সময়কার পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী উর্দুভাষীরা বলে এই

বাঙালিয়ানা ছিল একেবারেই না-পসন্দ। এ ছিল তাদের কাছে হিন্দুমান্য প্রতিম। তাই পাকিস্তান শেরে গোড়া থেকেই শুরু হয় একে প্রতিহত করার নানান অপপ্রয়াস। কিন্তু মাতৃভাষার প্রতি আস্থে উদ্ভূত বাঙালি মুসলমান এইসব অপপ্রয়াসকে বার্ষিক মতে ছিল ক্ষমণীয়কর। ক্রমে ক্রমে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর শোষণ বৃদ্ধি। অত্যাচারের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে এসব মাতৃভাষানৈমিত্ত্য হয়ে ওঠেন জাতীয় স্বাভাবিকতা। তারা পাকিস্তানী শাসকদের নাগপাশ থেকে বাংলাদেশ ও বাঙালির মুক্তিমান্যর অধির হয়ে ওঠেন।

১৯৭১-এর ১ মার্চ পাকিস্তানের তৎকালীন সামরিক প্রশাসক জেনারেল ইয়াহিয়া নির্বাহিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করলে শুরু হয়ে যায় মাতৃভাষাপ্রেমী বাঙালিদের মুক্তিগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায়। জাহানারা ইমামের মিলিপি ১৯৭১-এর ১১ মার্চ থেকে বহু অস্বাভাবিক মুক্তি বিন ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিস্তৃত। মাম্বখানের এই সমস্ত সময়টা জাহানারা ইমাম তাঁর স্বামী-পুত্র-পরিবার নিয়ে ঢাকাতোই অবস্থান করেছেন। ফলে বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানী সামরিক সরকারের বর্বর অত্যাচার বলতে গেলে ঢাকের সামনেই সংঘটিত হতে দেখেছেন। তাঁর বিশ বছরের দামাদ হলে স্বামী এই বর্বরতায় মোকাবিলায় মুক্তিগ্রামের যোগ দিতে চাইলে মাতৃকন্ময়ের সমস্ত মামামত্যা তত্ত্ব করে তিনি স্বামীকে অনুমতি দিয়েছেন, বলেছেন, "...দিলাম তাকে দিতে আমরা চানো করাবলী করে। যা তুমি চুকেই যা।"। লেখিকার বর্ণনাতোই আমরা পাই সৈনিক এমনি করে হৃদয় উপড়ে দিয়েছিল আরও অসংখ্য জায়া এবং জননী। ঢাকায় বসে লেখিকা নিজেও বরং স্বামী-পুত্র ইমাম পুরোভাগে মুক্তিগ্রামের সহায়তা করতে থাকেন। এইসবের পরিণতিতে শেষ পর্যন্ত যদিও এক কালরাজি। লেখিকার দুই পুত্র, স্বামী, আরও অনেক আত্মীয়স্বজন সাহায্য-বাহক-চরমের সাহায্যে চিহ্নিত করে পাকিস্তানী সামরিক ইয়াহিয়া হয়ে নিয়ে গেল। সেনা ব্যাংকে স্বীকৃতিপত্র আদায়ের অস্থির এদের ওপর চালানো হয় অত্যাচারের সিন্দোলের। স্বামীকে আর কোনদিনই ফিরে পাওয়া গেল না। স্বামী ইমাম আর স্বামী মিরে এল অত্যাচারের বিপ্লব দেহ-মন। জাহানারা ইমামেরে খোঁজ-বর নেওয়ার সূত্রে অমরগাও জামতে পারি, সৈনিক বাংলাদেশের আরও অসংখ্য জায়া ও জননীকে মুচুমুখী হতে হয়েছিল এই একই মর্মান্তক ভাগ্য বিপর্যয়।

স্বামীনের খেরিলা দল পাক সামরিক বাহিনীর পাশ্চাত্য আঘাতে পর্যন্ত হলেও ঢাকায় খেরিলা আক্রমণ থেমে যায়নি। এই প্রসঙ্গেই এসে যায় ভারত সীমান্তে আগরতলার নিকটস্থ মেলোর নামের সেকটর ট্রাক কথা, যে সেক্টরের অসিহাবানী নিয়ে নেতা ছিলেন খাদেম মোশাররফ। খেরিলা আক্রমণের স্বপ্নের নাথক, অনেকখানি প্রতিদ্বন্দ্বীকরণের মধ্যে। স্বপ্নেরের স্বপ্ননিষ্ঠাই ছিল মোশাররফের স্বপ্ন।

স্বামী তো আশ্রয় চিরদিনের মতো হারিয়ে গিয়েছিল এবার শরীয় ইমামও গেলেন। তাঁকে দিক সরাসরি খুন করা হয়নি, তবে যা করা হয়েছে তা খুনেরই নামান্তর। প্রথমত সৈন্যব্যারাকে ধরে নিয়ে গিয়ে তাঁর মতো প্রথম আব্বাসমান্নাবোধসম্পন্ন ব্যক্তিত্বশালী মানুষকে যখন চাবকানো হয়েছিল, বুটপা পায়ে বেতলাকানো হয়েছিল, তখন দেহের থেকেও মনে তিনি যে চোট পেয়েছিলেন সেটাই ছিল সবচেয়ে মারাত্মক। সর্বোপরি ছিল শিরপুর স্বামীকে হারানোর বৈদন্য। আরও অনেক আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুকে হারানোর বৈদন্যও কম ছিল না। আর তাঁর মতো মানবিক মূল্যবোধে দৃঢ় আত্মশীল মানুষের চোখের সামনে ঘিরে পর দিন ঘটে চলেছিল অকিঞ্চিৎকর বরজর পারকলীলা। সব রকম বৈদন্যই তিনি বহন করেছেন নীরবে। বাইরে তার বিশেষ কোন প্রকাশ ছিল না। ফলে কোনদিন অনিবার্যভাবেই তিনি হারোয়গাজ্ঞিত হবেন। সময়মত বন্ধুহানীয়া ভক্তের এলেন। তাঁকে হাসপাতালেও ভর্তি করা হল। কিন্তু শহরে তখন পাকবাহিনী ব্র্যাক-আউট চালাচ্ছে হাসপাতালেরও বিনুত্রে মের্নি সূচক করে। ফলে কৃত্রিম উপায়ে রূপসম্পন্ন চালু রাখার যেমনি চলে না। শরীয় ইমাম মারা গেলেন। জাহানারা ইমাম পুত্র হারানোর বৈদন্য তাঁর অশান্ত হৃদয়ের হাফাকারকো নানাতোই আদায়ের জ্ঞানান দিয়েছেন। কিন্তু স্বামী হারানোর বৈদন্য তিনি যেন একেবারেই বাকহারা হয়ে যেন। এ এই সীরতায় সন্ময় মানুষের কাছে মর্মবিলী।

শরীয় ইমামের মৃত্যুর মাত্র চারদিন পরেই এক কাকিতক স্বাধীনতা। কিন্তু এত শতহস্ত্র মানুষের স্মরণ প্রোত, অসংখ্য জায়া ও জননীর স্মরণের চূড়ান্ত অবমাননা। শরীয় ইমামের স্বজনহারাণো স্বপ্নের হাফাকারের অস্বাভাব্য দেখে এই স্বাধীনতা এল— সে মিলিপি পড়তে পড়তে জাহানারা ইমামের মতোই মুক্তি আন্দোলন হাঙ্গতে গিয়ে আজও আমাদের সীক রুদ্ধ হয়ে যায়।

শতবার্ষিকী আলোচনায় বিভূতিভূষণ — আকাদেমির সেমিনার

যা কিছু বড় মাপের তাকে ঠিকমতো দেখতে গেলে বেশ খানিকটা বারম্বার প্রয়োজন। মানুষের বসন্তও সে কথায় ঘটে। কোথায় তার মতো একটি ব্রহ্ম, একটি আঁলি অত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিরীক্ষণ না করে একটু তফাতে দাঁড়াও, তবে তার দিগন্ত, তার চরিত্রের, তার প্রতিভার সঠিক পরিচয়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিড়ি খেতেন, আয়-ময়লা জামাকাপড় পরতেন, খেতে ভালবাসতেন, নিজের লেখার প্রাঙ্গণ শুনলে খুশি হতেন, ঠিক কথা। কিন্তু তাকে কী এসে গেল?

Weave a circle round him thrice,
And close your eyes with holy dread,
For he on honey-dew hath fed,
And drunk the milk of Paradise.

বিভূতিভূষণের বিড়ি আর বেশবাস থেকে আমরা অনেকটা দূরে এসে পড়েছি, কিন্তু এখনও আমাদের, শুনতে হয়, তিনি সরল গ্রাম্য মানুষ ছিলেন, সরল গ্রাম্য কাহিনী এবং গাছপালা, বন-বাদাড়ের কথাই ভাল লিখতে পারতেন, আসলে লিখতে তেমন জ্ঞানভেদ না, যা মনে আসত তাই লিখতেন, ইত্যাদি। তবু তাঁর আসল হোয়ার আভাস একটু একটু করে হুটে উঠতে আরম্ভ করেছে আমাদের সাহিত্যের অধ্যাপক ও সমালোচকদের চোখে। গত ১২-১৪ সেপ্টেম্বর সাহিত্য আকাদেমি কলকাতায় তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে যে ভিনদিনের সেমিনারের আয়োজন করেছিল তা থেকে এই আশ্চর্যচরিত্র লাভ করা গেল।

সেমিনারে পঠিত একটি নিবন্ধ সৃজিত চৌধুরী "বিভূতিভূষণের গুণগ্রাহীদের মধ্যে প্রতিনিধিত্বহীন" — অগণ্য অধ্যাপক ও সমালোচক প্রথমবার বিপরীত যে উক্তিটি উদ্ধৃত করেছেন, তাঁর (প্রথমবারের নয়, বিভূতিভূষণের) যে কোনও নগণ্য শঠকের বাক্যেরা হতে পারে। তিনি বলেছেন, "আমরা কোন মনে নিইনা, 'পদ্মালী বালার' ও 'অক্ষর সংবাদ', 'শেখের পাঁচালী'-র অনিবার্য অংশ নয়... তাই এই আদি ও অন্তঃস্থ... হেঁটে ফেলে 'শেখের পাঁচালী'-র রসহীন হয়, এমন মনে হয় না।' অর্থাৎ হিম্মির ঠাকুরকি বা, শাশুরেখ ঘাটে হিরিরের কক্কতা বদ। মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, রসবাদনের ক্ষমতার বেশ বড় একটি অংশ আদ্য না হয়ে গেলে বোধহয় সাহিত্যের অধ্যাপক হওয়া যায় না।

"বঙ্গীয় আধুনিকতার যৈঠক ও বিভূতি-সাহিত্যের মূল্যমান" শীর্ষক নিবন্ধটিতে সৃজিত চৌধুরী দেখিয়েছেন, নিজস্বের ধারণা

ও বিশ্বাস অনুযায়ী, নিজস্বের সংস্কারের বশবর্তী হয়ে, বিভূতিভূষণের বিচার করতে গিয়ে যেমন ঐতিহ্যবাহী ততেনি আবার 'আধুনিক-পন্থী' সমালোচকরা কী গণ্ডির বাসিন্দা ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে মূঢ়তার স্বর্ণের দিকে এগিয়ে গেছেন।

সেমিনারে আলোচিত নানা প্রসঙ্গ, নানা উপলক্ষ বিভূতিভূষণের সমগ্রজীবের দেখার চোঁচা লক্ষ করা গেল। আবার কখনও কখনও তাঁকে কোনও এক বিন্দুতে স্পর্শ করে, ট্যানজেন্টের মতো, আলোচনাটিকে অনালিচক হওয়াও হয়ে যেতেও পেরেছি। কেউ কেউ নিজের কিছু ধারণা, নিজের কিছু ভ্রূত অভাবিক উৎসাহে তাঁর গুণ অরোপ করার ফলে, তাঁর লেখার যে বিশেষ চরিত্র, বিশেষ স্বাদ, তাঁর দৃষ্টি, তাঁর উপলব্ধি, মনে হয় যেন একবারো পড়ে গেল, মনে হয় যেন, তাঁর উপন্যাসটিই তাঁর হাফজাত হয়ে গেল।

প্রারম্ভিক ভাষণে শিশিরকুমার দাস সুন্যেটাই বললেন, বর্তমানের একটি মারাত্মক সমস্যা কথায় মনে দেখে সে বিষয়ে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলে 'আরগ্যাং' উপন্যাসটি তিনি আলোচনা করতে চান। সমস্যাটি হল, জাতীয় সংগঠিত। তাঁর মূল বক্তব্য হল যে যিমতের কোনও অবকাশই নেই, অন্য ভাষায় বলি, অন্য জনগোষ্ঠীকে নিয়ে এমন উপন্যাস বাংলা ভাষায় এর আগে আর কেউ লেখেননি, এবং সেই 'বিজাতীয়'দের সঙ্গে বাঙালি নায়কের একাত্মতাবের বিকাশ অংশই 'আরগ্যাং'-এর একটি কেন্দ্রীয় বস্তু। কিন্তু সেটা এমনভাবে এসেছে, একটা ঐতিহ্যের স্মরণের মধ্যে এমনভাবে মুটে উঠেছে যে আলদা করে তাঁর ওপরে অত জোর দিয়ে উপন্যাসটির চরিত্রের সঠিক উপলব্ধি থেকে আমরা খানিকটা দূরে সরে পড়ে। তেমনই আবার, সেমিনারের দ্বিতীয় দিনের অপরারের অধিবেশনে শিলাভিত্তি সেনে ভূরি-পরিমাণ (এবং অনাবশ্যক) ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণ সহজেই বিভূতিভূষণের কেবল দারিঙ্গের যে গুরুত্বপূর্ণক বিরূপ সংকলিত করেছেন, তেমনও, দারিঙ্গের যে বিভিন্ন স্বাদ নিয়ে তাঁর ভাষায় উপলব্ধি, তাঁর মূল্য সম্পূর্ণ চাপা পড়ে যায়। আসলে, বেশি বোঝাতে নেই, বেশি খোঁজা করতে নেই, অতি-ভেত্রে-গাশ করতে নেই। না হলে সমালোচকের হাত ধরে কোথায় যে গিয়ে উঠক কে বলতে পারে?

সেমিনারের প্রথম দিনের প্রথম এবং দ্বিতীয় অধিবেশনে বিভূতিভূষণকে সর্বজনপ্রিয় প্রেক্ষাপটে স্থাপনের চেষ্টা করা হয়। কোরালার বাসুদেবের নাথার ভারতীয় কাহিনী রচনার সমালোচনামূলক

কথা উল্লেখ করে বলেন, “শবের পাঁচালী” কবিতার ঢঙে রচিত। “ভারতীয় উপন্যাস”-এর নিজস্ব রীতির কথা সেমিনারের বারের বারের উঠে পড়ে এবং তা নিয়ে বানিকটা বিতর্কেরও সৃষ্টি হয় সেমিনারের প্রথম এবং দ্বিতীয় দিন। দ্বিতীয় অধিবেশনের সভাপতি অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায় “ভারতীয় উপন্যাস” বলে আলাদা কোনও স্বর অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। বস্তুত এখন পর্যন্ত তেমন কোনও আলাদা ক্ষেত্রের উপন্যাস সামনে এসে দাঁড়াতে দেখা যায়নি, এবং বোকা মুশকিল, “শবের পাঁচালী”-ই বা কী হিসেবে কবিতার সমগোত্রীয়। গ্রাম্য জীবনের কাহিনী, অতএব গ্রাম্য রীতিতে রচিত, এ সিদ্ধান্ত অশঙ্ক্য।

দ্বিতীয় দিনের সকালের অধিবেশনে তিন প্রধান লেখক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সহজ সাবলীল ভঙ্গিতে এবং কখনও কখনও শ্রুতি-চারণের মাধ্যমে, বিভূতিভূষণের সাহিত্য-কীর্তি সম্পর্কে নিজের নিজের কিংবা এবং উপলব্ধি ব্যক্ত করেন। বিষয় নিশ্চিহ্ন হয়, “বিভূতিভূষণ এবং বাংলা গল্প-উপন্যাস আধুনিকতা”। মুস্তাফা সিরাজ বলেন, বিভূতিভূষণ এতই আধুনিক যে এখনও তাঁকে নতুন মনে হয়। তাছাড়া তিনি বলেন, বিভূতিভূষণ মানুষের বিশ্বকে যেভাবে প্রকাশ করেছেন, তা আর কেউ করেননি। তাঁর লেখায় বিশ্বব্যবহারের কথাটা আরও অনেকের মুখে ঘুরে ঘুরে এসেছে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর স্টাইলের কথা বিশেষ করে বলেন। বলেন, ভাষার চাকচিক্য হল নিকট স্টাইল, সহজ সরল ভাষাই সবচেয়ে কর্তন। তিনি জীবনানন্দের তুলনা এনে বলেন, তিনি এখনও অম্লিন, তাঁর সমসাময়িক কবির ভাষার চ্যুত, চাকচিক্য ভুলে গাই। তিনিও বলেন, যা চিরকালীন, সেটাইই আধুনিক।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় কী কী উপাদানে বিভূতিভূষণের চিন্তাভাবনা গড়ে উঠেছিল, তার একটা হবিশ দিয়ে বলেন, “তাঁর মস্তিষ্কেতেনা তিনি অনুভব করতেন বাড়ি, মাটি, গাছপালা, আকাশ, বাতাস, জল দিয়ে গড়া যে পৃথিবীর ভাবনা মানুষের মাথায় আছে, তাঁর ভেতরে মানবপ্রবাহ যুগ যুগ ধরে এভাবেই আসছে, চলেও যাচ্ছে, আরও আসবে। এই ভাবনাই গত ৬০-৬৫ বছরের কথাসাহিত্যের প্রধান আধুনিকতা।” বিভূতিভূষণের বিশ্বব্যবহারের কথা তিনি অনেকটা বিশ্বাসের সঙ্গেই বলেন, “চিরাগতই স্বভাবসিদ্ধের ভেতরেও তিনি বিশ্বব্যবহার করতে পারতেন। এই অপর বিশ্বব্যবহারের সমর্থ্য থেকে এমন এক জায়গায় নিয়ে গেছে যা সমস্ত তাঁর আয়ের বা শবের শিল্পীর বেলায় এতটা ঘটেনি... এই বিশ্বব্যবহার কখনই তাঁকে শূন্যে হতে দেখানি, বরং তিনি সময়ের আগে আগে চলেছেন।”

দ্বিতীয় দিনের দ্বিতীয় অধিবেশনে রশ্মী সেন যে নিবন্ধটি পড়েন, “আধুনিকের প্রান্তে বিভূতিভূষণ”, তাতে বিভূতিভূষণের বিভিন্ন উপন্যাস নারী চরিত্রে ভূমিকা, তারা কতদূর আধুনিকতার

পথে এগোতে পেরেছে, কতটা পারেনি, এইসব নিয়ে বিস্তার আলোচনা করেছেন। “বিশিষ্টের সংসার”-এ বিভূতিভূষণ ও মালিনীকে নিয়ে আলোচনার প্রসঙ্গে বিভূতিভূষণের ব্যক্তিগত জীবনে সূত্রভা নারী মহিলায় সঙ্গে তাঁর বহুবাহুর কথা যেভাবে এনেছেন, তাতে মনে হয় না, মালিনীকে কিংবা বিশিষ্টকে কংসা তাদের সীমাবদ্ধ জীবনকে বৃদ্ধবার বিশেষ সুবিধা হবে। নিবন্ধটার যে কপি সাহিত্য আকাদেমি থেকে শেষোচ্চি, তা এতই অস্পষ্ট যে এর বেশি কিছু নিবন্ধটির সম্পর্কে বলা সম্ভব নয়।

একই কারণে সেমিনারের দ্বিতীয় দিনে বাংলাদেশের হাসান আজিজুল হক পঠিত এবং বোরহানউদ্দিন খান প্রেরিত নিবন্ধ দুটি নিয়েও আলোচনা করা সম্ভব হল না। আকাদেমি যদি তাঁদের যন্ত্রপাতির সংস্কার না করেন, এজাতীয় সেমিনারে পঠিত নিবন্ধটির পাঠযোগ্য কপি প্রস্তুত করতে না পারেন, ভবিষ্যতেও যারা আমার মতো সেমিনারের উপস্থিত থেকেও চটপট নোট নিয়ে অপরগ, তাঁরা মুশকিল পড়বেন, যদি তাঁদের সেমিনারের বিরগ জিন্মতে হয়। তবু হাসান আজিজুল হকের নিবন্ধ, “বিভূতিভূষণের সাহিত্য : সৃষ্টির ব্যাকৃতি ও প্রভাব”-এর যতটুকু পাঠোদ্ধার করা গেল, তাতে দেখছি তিনি সাহিত্যিকসমাজ থেকে বিভূতিভূষণের বিচ্ছিন্নতা, অন্যদের ওপর তাঁর প্রভাবের স্বল্পতা, ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করে বলেছেন, “আমার ধারণা, বিভূতিভূষণের মতো এমন স্ব-ভাবে আমাদের ভাষার আর কেউই সাহিত্য সৃষ্টি করেননি।” বিশেষ জোর দিয়ে তিনি বিভূতিভূষণের সাহিত্যে এলোমেলো পঠনের কথা বলেছেন, তা নাকি আপন-আপনি থেকে ওঠা গানের মত। সেমিনারের অন্য বক্তার অনেকে অংশ বিশেষভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, বিভূতিভূষণ অত্যন্ত সচেতন শিল্পী ছিলেন, “বাছাই নির্বাচন, কাটছাঁট তিনি অভ্যস্ত ছিলেন না” এ-কথা অত্যন্ত ভুল। তাঁর পাণ্ডুলিপিতে তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে।

হায়াৎ মামুদ তাঁর নিবন্ধের যে কণ্ঠশি অনুগ্রহ করে আমাদের বিশেষণে, সেটিও অসম্পূর্ণ। তবু সেটুকু শ্রুড়েই আমার আবার মনে হল, সম্ভবত এটিকে সেমিনারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিবন্ধ বলা যায়। গভীর প্রসঙ্গভূতির পরিচয় দিয়েছেন তিনি বিভূতিভূষণের সাহিত্যের কালজলী আবেদনের আলোচনায়, “কী দেখবার ইচ্ছে তাঁর? মানুষ ও প্রকৃতির সম্মিলনে এক বিশাল বিশ্বপ্রাণের অস্তিত্ব। এবং তাঁর সৃজন কল্পনার উদ্দেশ্যই হল সেই বিশ্বপ্রাণের অস্তিত্বের অনুভবে পাঠকের বোধের ভিতরে সঞ্চারিত করে দেওয়া, তা যদি না হত— তাহলে তাঁর রচনায় সংশয় ও প্রশ্ন ব্যাক্ত, নানান ধরনের ক্ষোভ ও যন্ত্রণা, ক্রোধ ও প্রতিবাদ উচ্চারিত হত।”

এমন একটি চিন্তা-সমৃদ্ধ সেমিনার উপহার দেওয়ার জন্য সাহিত্য আকাদেমিকে ধন্যবাদ।

ভবানী-প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

With Best Compliments From :

SHAKTIGARH TEXTILE & INDUSTRIES LIMITED

Manufacturers of
High Quality Yarn of Cotton, Viscose, Acrylic
and Blended Polyester/Viscose of various
vounts/descriptions in Dyed and Grey.

Regd. office & H.O.

4, GOVERNMENT PLACE NORTH
CALCUTTA - 700 001

Gram : "SHAXTILE"

Dial : 248 2002

248 9066

248 7735

Telex : 021 4666 STIL IN

Fax : (91) (33) 2480836

Mills

P.O. BARSUL
Rly. Stn. SHAKTIGARH
District. BURDWAN

(West Bengal)

Dial : Shaktigarh : 86353/86323

Burdwan : 4038